বনফুলের ছোটগল্পে প্রতিফলিত সমাজবাস্তবতার স্বরূপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে
এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

401581

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
401581

নীলভানা লিপি

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৌমিত্র শেখর
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন: ৮৬২৪৬৬৬ (বা)
৯৬৬১৯০০-৫৯/৪২০২ (অ)

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মিসেস নীলভানা লিপি আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে এম. ফিল. ডিগ্রি লাভ করার জন্য 'সনফুলের ছোটগল্পে প্রতিফলিত সমাজবাস্তবতার স্বরূপ' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনা করেছে। আমার জানা মতে, এই অভিসন্দর্ভের কোন পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় অথবা সামান্য অংশ অন্য কোথাও ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নি বা প্রকাশ করার জন্য জমা দেয়া হয় নি।

২৯/৩/০৫

(ড. সৌমিত্র শেখর)

Dhaka University Institutional Repository

সূ চি প ত্র

প্রথম অধ্যায় : প্রস্তাবনা / ৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা ছোটগল্প বিকাশের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা / ৭
প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলা ছোটগল্প : প্রারম্ভ থেকে 'কল্লোল' -পূর্বসময় পর্যন্ত / ১৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কল্লোল যুগ / ২৭

401581

তৃতীয় অধ্যায় : বনফুলের ছোটগল্প ও অন্যান্য সাহিত্য : আখ্যান ও আলেখ্য / ৪০

চতুর্থ অধ্যায় : সমাজবাস্তবতার তাত্ত্বিক ধারণা : সাহিত্যে তার প্রতিফলন / ৫৬

পঞ্চম অধ্যায় : সমাজবাস্তবতার আলোকে বনফুলের ছোটগল্প-বিশ্লেষণ / ৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার / ১৩৯

পরিশিষ্ট : এক / ১৪১

পরিশিষ্ট : দুই / ১৪২

পরিশিষ্ট : তিন / ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
প্রস্তাবনা

সাহিত্য হলো জীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যের কনিষ্ঠতম শাখা ছোটগল্পে আছে জীবনের খণ্ডচিত্র। ছোটগল্পের এই খণ্ডচিত্রে ধরা পড়ে বাস্তবজীবনের বহুবিচিত্র দিক। "জগতের সবকিছুই ছোটগল্পের 'বিষয়'। আর সব কিছুরই ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারার পক্ষে একমাত্র অপরিহার্য উপাদান হল স্রষ্টার তীব্র ইচ্ছার একক শক্তি প্রেরণা। জীবনের ধারাস্রোতে পলে পলে ছোটগল্পের উপাদান ভেসে চলছে, স্রষ্টাকে তাঁর চৈতন্যের আ-মূলে ধরে তুলতে হবে এদের যে-কোনো একটিকে। শিল্পীর চেতনা ও অবধারণার আলোকফলকেই বহমান জীবনধারা মুহূর্তের জন্য ছোটগল্পের রূপ ধারণ করে।"[১] এ কারণেই একজন সার্থক ছোটগাল্পিককে তাঁর সমকালীন জীবনপ্রবাহ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে বিচার ও পর্যবেক্ষণ শক্তির মাধ্যমে কল্পনার রং তুলিতে ছোটগল্প রচনা করতে হয়।

আসলে গভীরতর জীবনবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সমাজ সচেতনতা, ইতিহাস জ্ঞান এবং সমকালীন সৃজনশীলতার সার্থক সমষ্টির সংস্পর্শেই যথার্থ শিল্পীমানসের সার্থক প্রকাশ। এ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে সাহিত্যকর্মের মাঝেই শিল্পিসত্তা বাস্তবজীবনের বিচিত্র দিকে প্রতিফলিত রূপকে চিত্রিত করতে পারে। আর ছোটগল্পের মাঝে প্রত্যক্ষ করা যায় জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রের সমাহার। একজন সার্থক শিল্পিমানসের সাথে জীবনপ্রবাহ ও সমকালীন সৃজনশীল সমাজ প্রক্রিয়া নিবিড়তর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ; যার প্রতিফলন ঘটে সার্থক শিল্পীর সার্থক সৃষ্টিকর্মে।

শিল্পরসবেত্তাদের মতে শিল্প-স্রষ্টার প্রধান প্রবণতা তাঁর সহজাত সৃষ্টিধর্মের লালনই শুধু নয়, এর চেয়েও অতিরিক্ত আরো কিছু আছে। তা হলো দক্ষতার কুশল বিন্যাস। শিল্পীর সৃষ্টিতে তাঁর সময় ও সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়। শিল্পী সমাজেরই একজন, সমাজের বাইরের কেউ নন। শিল্পীর সাথে যেমন সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তেমনি সমাজের সাথে শিল্পের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং সমাজের বাইরে শিল্প মূল্যহীন। এ প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায়, "সকল ছোটগল্পই নিজ কালের জীবন বৈচিত্র্যকে অন্তর্গত সত্তায় ধারণ করে তার প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্যের পরিচয় দেয়। ছোটগল্প তাই স্পষ্টত ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত। ঐক্যভাব-অন্তর্গত জীবনশিল্প। বিপুল রাষ্ট্রীয়-সামাজিক সংঘাত কিংবা ব্যক্তি জীবনের অতৃপ্তিজনিত যন্ত্রণা তথা আধুনিকতম জীবন ভাবনার ফসল এই ছোটগল্পকে জীবনের বিশ্বরূপ দর্শনের খণ্ডদর্পণও বলা যায়। প্রতীতির সমগ্রতা বা ঐক্যসাধন, একক জীবনখণ্ড অবলম্বনে ভাবের একমুখিতা ও সকল উৎকণ্ঠাকে ধারণকারী একটি চরমক্ষণ বা শীর্ষ মুহূর্তের অবতারণা, স্বল্পতম ব্যাপ্তির মধ্যে বৃহত্তম সত্যের প্রতিবিম্বন প্রভৃতি ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য উপাদান।"[২] অতএব, একথা বলা যায়, ছোটগল্প এবং ছোটগাল্পিক অঙ্গাঙ্গিভাবে সমাজের সাথে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ।

শিল্পী এবং শিল্প কোন কিছুই সমাজ বিবর্জিত নয়। শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মের মাঝেই সমাজের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেন। "শিল্পের মূল্যায়ন পঞ্চইন্দ্রিয় বহির্ভূত কোন উদ্বায়ু বস্তু নয়। এ কারণে শিল্পী তাঁর চেতন-অবচেতনভাবেই সমাজমনস্ক হয়ে পড়েন। শিল্পের মধ্যে শিল্পী নিজের সঙ্গে অনিবার্যভাবে প্রকাশ করেন তাঁর পরিপার্শ্বকেও। কেননা ভাষা, বিশ্বাস, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদি তাঁর নিজের হলেও সমাজের সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।"[৩] তবে সময়ের ব্যবধানে সমাজের এবং সমাজ মানুষের পরিবর্তন ঘটে। তখন দেখা যায় একযুগের সাহিত্যকর্মের চাহিদা অন্যযুগে মূল্যায়নের পরিবর্তন হয়। তবে ওই সাহিত্যকর্ম থেকে সে যুগের সমাজচিত্র, আচার-আচরণ ও চালচিত্র সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। সুতরাং সমাজ সচেতন 'শিল্পীকে প্রত্যেক ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গে অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যা, সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক শক্তির সঙ্গে তুলনা করে বিচার'[৪] অনস্বীকার্য। এ কারণেই শিল্পিমানস বলতে সামগ্রিক জীবনদর্শনকেই বুঝা যায়।

একজন সার্থক সমাজ সচেতন শিল্পীর রচনা পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ করা যায় 'যে সাহিত্য মানুষকে, ঘটনাকে, জীবনজিজ্ঞাসাকে সমাজ বিবর্তন ও সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছে, তাই হল প্রকৃত সাহিত্য।'[৫] অনেক সময় 'সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা, কখনো এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মনোভাব–সেই সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্ব, বাস্তববোধ ও জীবনমুখী আকর্ষণের সমন্বয় সাধনের ফলে কোন লেখকের রচনাশৈলী তথা শিল্পভঙ্গির আন্তর কাঠামো গড়ে ওঠে।'[৬] তাই ছোটগল্পে প্রতিফলিত জীবন ও সমাজবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচনের শর্ত হিসেবে শিল্পিমানসের প্রকৃত পরিচয় জানা একান্ত আবশ্যক।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯),বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে যিনি বনফুল নামে সমধিক পরিচিত, তাঁর ছোটগল্পে প্রতিফলিত সমাজবাস্তবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমেই বলতে হয়, বনফুল সমাজবাস্তবতার ক্ষেত্রে ছকবাঁধা প্রচলিত নিয়ম মেনে চলেন নি। তাঁর জানা ছিল যে মানুষকে নিয়েই সমাজ, তাই নানারকম মানুষের ছবি আঁকা মানেই সমাজকে তুলে ধরা। বাংলা ছোটগল্পে বনফুল এক বিশেষ ধারার ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। বনফুলের গল্প রচনার পরিকল্পনায় মৌলিকতা এবং আখ্যানবস্তুর সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি আছে। তিনি তীক্ষ্ণ মননশীলতার মধ্যে দিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত দিক থেকে এক বিশেষ ধরনের বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হয়েছেন। বনফুল তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক রচনা করলেও ছোটগল্প রচনা করে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। বনফুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বনফুলের গল্প' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে। সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে বনফুল মোট ২টি গল্পগ্রন্থের মধ্যে সর্বমোট ৫৭৮টি গল্প রচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন চিকিৎসক। পেশাগত অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিজীবনের নানাবিধ অর্জন এবং সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সুচিন্তিত সমন্বয় বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রতিফলিত। আঙ্গিকগত এক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো ছিলই। কিন্তু এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন ছোটগল্পে নানা ধরনের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে। বিষয়বস্তুগতভাবে বনফুলের গল্পকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়–

(১) দৈনন্দিন জীবনের আনাচে-কানাচে ধূলিমালিণ্যের তুচ্ছতায় আবৃত বাস্তবজীবন নির্ভরতা।

(২) ব্যক্তির আত্মসম্বরণে বিজ্ঞানীজনোচিত লেখকের সন্তর্পণ প্রয়াস; যেখানে ব্যক্তিক মানসিকতার প্রাধান্য।

(৩) কৌতুকরসে উদ্বেলতায় অনন্ত কৌতূহল সৃষ্টি।

– এই বিভক্তির পরও বলা চলে, লেখকের প্রায় সব ছোটগল্পেই সামাজিক বাস্তবতার ব্যাপারটি কমবেশি প্রকাশিত।

বর্তমান গবেষণাসন্দর্ভের মূল বিষয় যদিও বনফুলের ছোটগল্পে প্রতিফলিত সমাজবাস্তবতার স্বরূপ, তথাপি গবেষণা কাজের সুবিধার্থে বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এখানে।

বাংলা ছোটগল্পের বিকাশের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দুটি ধারায় বিভক্ত করে বাংলা ছোটগল্পের সূচনাপর্ব থেকে 'কল্লোল' পূর্ব সময় পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর কল্লোল যুগের সাহিত্যিক এবং কল্লোল সমসাময়িককালে কল্লোল বলয় থেকে স্বতন্ত্র সাহিত্যিকদের নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ আছে। বনফুলের ছোটগল্পের বিষয় বিন্যাস আলোচনায় বনফুলের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বনফুলের গল্প' থেকে শুরু করে প্রতিটি গল্পগ্রন্থ আলোচিত হয়েছে। সমাজবাস্তবতার তাত্ত্বিক ধারণা এখানে ছোটগল্পে সমাজবাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর বনফুলের গল্পগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সমাজের বাস্তবচিত্র গল্পে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কি বা কেমন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়েছে। আলোচনায় বনফুলের গল্প রচনাকালীন সমাজবাস্তবতাও এই গবেষণাসন্দর্ভে প্রকাশ ঘটেছে।

সমাজবাস্তবতার কোন বাঁধা ছক নেই। সমাজভাবনারও নেই কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা। বনফুলের রচনায় তাই সমাজের শ্রেণিবিভক্তি, শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যবদ্ধতা কিংবা তাদের প্রতিরোধ স্পৃহা অথবা শ্রেণিসংগ্রাম এসব খুঁজে পাওয়া যাবে না। বনফুল তাঁর লেখায় সমাজের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন বিরাট ক্যানভাসে তেল রঙের বিচিত্র সমাহারে নয় বরং নিপুণ শিল্পীর একরৈখিক স্কেচে।

তথ্যনির্দেশ :

১। শ্রীভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ. ২৩

২। সৈয়দ আজিজুল হক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ (ঢাকা, ১৯৯৮), পৃ. ১

৩। সৌমিত্র শেখর : গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ (কলকাতা, ১৯৯৫), পৃ. ১৩

৪। বিনয় ঘোষ : শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ (কলকাতা, ১৯৮০), পৃ. ৪৩

৫। এ. কে. নাজমুল করিম : সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞান; এ. কে. নাজমুল করিম স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদক– মুহম্মদ আফসার উদ্দীন, ঢাকা, ১৯৮৪), পৃ. ৩১

৬। সৌমিত্র শেখর : পূর্বোক্ত; পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প বিকাশের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ছোটগল্প সাহিত্যের আধুনিকতম সৃষ্টি। কথাসাহিত্য বা উপন্যাসের হাত ধরে ছোটগল্পের দেখা পাওয়া যায় আধুনিক যুগে শিল্পবিপ্লবের পরে। উপন্যাসের আবির্ভাবের পরে ছোটগল্পের আবির্ভাব। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ছোটগল্পের সার্থক পথচলা শুরু। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> "ছোটগল্প (শর্ট স্টোরি) একটি আধুনিক সাহিত্য রূপ বা 'ফর্ম' রূপে দেখা দিয়েছে মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দে। ঘটনার বিবৃতি মাত্র নয়, নীতি শিক্ষা নয়, রূপক রচনা নয়, বৃত্তান্ত নয়; ছোটগল্প 'এক স্বতন্ত্র সাহিত্য সৃষ্টি।"[১]

'ছোটগল্পের ইতিহাসগত সূচনা হল উত্তর আমেরিকায়। ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'রিপভ্যান উইঙ্কল,' এডগার অ্যালান পো-র 'ম্যানুসক্রিপ্ট ফাউন্ড ইন এ বটল', আর নাথানিয়েল হথর্ন-এর 'সিলেশ্চিয়াস ওমনিবাস'-এ।'[২] এরপরেই ইউরোপীয়, আমেরিকান, ফরাসি ও রুশ সাহিত্যে ব্যাপক ছোটগল্প রচিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের অনুসরণে বাংলা সাহিত্যেও ছোটগল্প এসেছে সমসাময়িক সময়েই। আর ছোটগল্প নির্মাণোপযোগী বাংলা গদ্য সৃষ্টি হয়েছিল আগে থেকেই উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকেই যথার্থভাবে বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু। আর সে যাত্রার অগ্রপথিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বলা হয়, "শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প রচয়িতাদের অন্যতম।" ছোটগল্পের আবির্ভাব বিলম্বে হলেও বহু শিল্পীর মিলিত সাধনায় বাংলা ছোটগল্প আজ সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। তবে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের (১৮৬১-১৯০৪) হাতেই ঘটে বাংলা ছোটগল্পের অঙ্কুরোদগম। ইতঃপূর্বে, ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের মাধ্যমেই বাঙালি পাঠক প্রথম পেয়েছিল সীমিত গল্পরসের আস্বাদ। তবে গল্পরসের আস্বাদ থাকলেও, গল্প বলতে যা বোঝায়, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'-তে তা ঐতিহাসিক কারণেই দুর্লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) 'ইন্দিরা

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৭২), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), রাধারানী (১৮৭৫) প্রভৃতি রচনার কথাও কোন কোন সমালোচক উল্লেখ করেছেন।'[৩] বঙ্কিমের রচনাগুলো হচ্ছে 'নভেলা' শ্রেণির সৃষ্টি কর্ম বা ছোটগল্পধর্মী কয়েকটি রচনা মাত্র।

১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' [বঙ্গদর্শন, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা] গল্প দিয়েই বাংলা গল্পের যাত্রা শুরু।[৪] গল্পটি বৃহদায়তনের কারণে অনেকেই একে সার্থক ছোটগল্প বলতে চান না। তবে এ গল্প ছোটগল্পের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরিত করেছে। বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী ছোটগল্প 'দামিনী' (১৮৭৪) প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ (১৮৭৪) সংখ্যা 'ভ্রমর'-এ। এবং 'রমেশ্বরের অদৃষ্ট' (১৮৭৭-'ভ্রমর' পত্রিকা)– এখানে ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঘটনার একমুখিতা এবং সমাপ্তির ইঙ্গিতময়তা দুর্লক্ষ্য।

সমসাময়িক কালে বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটগল্পধর্মী দুটি আখ্যান প্রকাশিত হয়। এর একটি ইন্দিরা (১৮৭৩), চৈত্র (১২৭৯) সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। "ইহাকে আধুনিক যুগের ছোটগল্পের পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য নানা বিষয়ের মত 'বঙ্গদর্শনে' ছোটগল্প রচনার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। 'ইন্দিরা' এই পরীক্ষার ফল। এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। তখন ইহার প্রকার ছিল ক্ষুদ্র, মাত্র ৪৫ (বঙ্গদর্শন পত্রিকার ১৮ পৃষ্ঠা) পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।"[৫] পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই 'ইন্দিরা'র সংস্কার সাধন করেন এবং ইন্দিরা উপন্যাসে রূপলাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ স্বর্ণকুমারী দেবীও (১৮৫৫-১৯৩২) বেশ কিছু ছোটগল্প লিখে বাংলা ছোটগল্পের প্রস্তুতি পর্বে পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম সচেতন শিল্পী। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর ছোটগল্প সংকলনের নাম রেখেছেন 'নব কাহিনী বা ছোটগল্প' (১৮৯২)। তাঁর সার্থক ছোট গল্পগুলোর মধ্যে 'সন্ন্যাসিনী', 'লজ্জাবতী', 'কেন', 'গহনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পের শিল্পরূপ বিচারে তাঁর সব গল্পই উত্তীর্ণ হয়েছে এমন বলা যায় না। তিনি মেয়েদের নানা সমস্যা-সঙ্কুল জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন। মাতৃত্বের বঞ্চনা আর নারী প্রকৃতির স্বভাব উন্মোচনে স্বর্ণকুমারী দেবী যতটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন, ততটা নয় ইতিহাস-কাহিনীর গল্প-অবয়ব নির্মাণে। স্বর্ণকুমারীর কোন কোন গল্পে সমালোচক লক্ষ করেছেন 'অ্যান্টিক্লাইমেক্সের চমক'।[৬] স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্প সার্থক না হলেও বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এর অবদান কম নয়।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্যে অনেকেই ছোটগল্প রচনায় উদ্যোগ নেন। রবীন্দ্র-যুগের লেখক বলে

Dhaka University Institutional Repository

এঁদের অনেকেই বরীন্দ্রধারার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তবে দু একজনকে স্বতন্ত্রধারার গল্প রচনার উদ্যোগ নিতেও দেখা যায়। এই সময়ের ছোটগল্পকারদের মধ্যে তারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) রবীন্দ্রস্বতন্ত্র ধারায় গল্প লিখিয়ে হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তারকানাথের একটি মাত্র সংকলন (১৮৮৮)। এ সময়ের গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম ত্রৈলোক্যনাথ (১৮৪৭-১৯১৯)। তিনি রূপকধর্মী গল্প লিখেছেন। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাও বর্ণিত হয়েছে তাঁর গল্পে। তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য : "প্রকৃতপক্ষে ত্রৈলোক্যনাথের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ রচনাই, ছোটগল্পের পর্যায়ের রচনা, কিংবা বলা উচিত যে, তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই টানা গল্পের ফ্রেমে বাধানো ছোটগল্পের সমষ্টি।"[৭] ত্রৈলোক্যনাথের উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৬), 'মজার গল্প' (১৯০৬)। "বাংলা সাহিত্যে গল্প-শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ কোন উদ্দেশ্যমূলক রচনার স্রষ্টা নন। এদেশের চিরগত গল্প বলিয়ের সহজ উত্তরাধিকারী তিনি, নূতন যুগের শিল্পী হিসেবে তাঁর রচনাশৈলী জ্বালাতপ্ত Satirist-এর নয়– বাংলা গল্পে দৃশ্যমান জীবনকে তিনি কৌতুকের স্মিতহাস্যে সঞ্জীবিত করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা গল্পের প্রথম সার্থক 'হিউমারিস্ট'।"[৮] এই সময়ের আর একজন গল্পকার নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০)। রবীন্দ্র সমবয়সী এই লেখকের একটি সংকলন 'রথযাত্রা ও অন্যান্য' (১৯৩২)। 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই গল্পকার স্বর্ণকুমারী দেবীর মত নগেন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বলা হয় :

> "নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য রোমন্স দৃষ্টি ও রহস্য প্রবণতা। ইতিহাস, গোয়েন্দা রহস্য, পতিতা নারী, শিশুতোষ কৌতূহল ইত্যাদি নানা বিষয়ে গল্প রচনা করে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে তিনিই প্রথম বাংলা গল্পে বৈচিত্র্যের সন্ধান করেন।"[৯]

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পের মধ্যে আছে– 'লক্ষ্মীছাড়া', 'জাল কুঞ্জলাল', 'গল্প ও অল্প', 'চুরি না বাহাদুরি' ইত্যাদি। বসুমতী প্রকাশিত 'নগেন্দ্র রচনাবলী' (১৯২৫)তে তাঁর সব গল্প সংকলিত হয়েছে। নগন্দ্রেনাথের ছোটগল্পগুলো যদিও ছোটগাল্পিক সাফল্য অর্জন করতে পারে নি, তবু রবীন্দ্রযুগের ছোটগল্পকারদের মধ্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের নামের পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতির (১৮৭০-১৯২১) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সুরেশচন্দ্র একটি বিশেষ ধারার গল্প রচয়িতা হিসেবে পরিচিত। নীতি আর আদর্শ প্রচারের বাহন হিসেবেই তিনি ছোটগল্পকে বেছে নিয়েছেন। "রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সুরেশ সমাজপতির প্রধান নালিশ ছিল; প্রেম ও পূর্বরাগ প্রভৃতি সমাজগর্হিত ছবি এঁকে তাঁর সহধর্মীরা নাকি বাংলাদেশের সহজ নৈতিক পরিবেশকে ঘোলাটে করে তুলেছিলেন।"[১০] তবে সুরেশচন্দ্রের গল্পের সংখ্যা সব মিলিয়ে তেরোটির মতো। এই সব গল্পে নীতিগত জীবন চিন্তার রক্ষণশীলতা এত বেশি প্রকাশ পেয়েছে যে, তা কখনো কখনো গল্প থাকে নি, 'প্রবন্ধ' হয়ে উঠেছে। তাঁর একমাত্র গল্প সংকলন 'সাজি' (১৯০০)– এতে দশটি গল্প গ্রথিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক সময়ের আরো কয়েকজন গল্পকারের মধ্যে আছেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯), তাঁর গল্প সংকলন 'মঞ্জুষা' (১৯০৩), 'চিত্রলেখা' (১৯১০), 'চিত্রালী' (১৯১৯) ইত্যাদি। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় :

> "সুধীন্দ্রনাথের গল্পের বিন্যাস এতো অতুল্য, এবং এই বিন্যাস-এর ওপরেই তার ছোটগল্পের গুণ এত বেশি নির্ভর করে আছে যে, গোটা গল্প তুলে না দিলে বক্তব্য কেবল অস্পষ্ট থাকে।"[১১]

সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়– তাঁর গল্প সংকলন 'ঘরের কথা' (১৯১০), 'পরিকথা' (১৯১১), 'নবান্ন' (১৯১২)। ছোটগল্প শিল্পী প্রভাতকুমার আপন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। রবীন্দ্রভক্ত হয়েও তিনি আগা গোড়াই রবীন্দ্রনাথের থেকে পৃথক। তাঁর প্রমাণ মেলে 'দেবী' গল্পটিতে। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নবকথা' (১৮৯৯), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প' (১৯২১), 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৪) ইত্যাদি। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। বিশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্য ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার একটি অবিস্মরণীয় নাম। সমাজ রুচি ও সাহিত্য রুচির দ্রুত আমূল পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর গল্পের উপভোগ্যতা আজো কমে নি।[১২]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) বাংলা ছোটগল্পের ধারাকে নতুন ধাপের সীমানায় পৌঁছে দিলেন। বিচিত্রকর্মা চারুচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে আনলেন নতুন মেজাজ, নতুন আঙ্গিক। তাঁর গল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– পুষ্পমাত্র (১৯১০), সওগাত (১৯১১), পঞ্চদশী (১৯২৭), দেউলিয়ার জমাখরচ (১৯৩৮) ইত্যাদি। গল্পকার হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের (১৮৭৬-১৯৬২), গল্প সংকলন– প্রেম মরিচিকা (১৯০৯), হৃদয় শ্মশান (১৯১৯)। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৮-১৯২৯) রচনাবলীর প্রধান বাহন ছিল ভারতী এবং তাঁর শিল্পকর্ম গদ্য পদ্য উভয় মাধ্যমকেই আশ্রয় করেছিল। গল্পশিল্পই ছিল তার মধ্যে প্রধান। তাঁর গল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– কল্পকথা (১৯১০), জাপানী ফানুস (১৯০৯), মনে মনে (১৯২১) প্রভৃতি।

এ সময়ে বাংলা সাহিত্যে বেশ কয়েকজন মহিলা ছোটগল্প রচয়িতার আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে বিশেষ স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর পর শরৎকুমারী চৌধুরাণীর (১৮৬১-১৯২০) নাম উল্লেখ করতে হয়। নারী জীবনের মমতা ও কৌতূহল কৌতুকের সঙ্গে মেয়েদের জীবনের নকসা চিত্রণই শরৎ কুমারীর গল্প রচনার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র-অনুরাগ তাঁর গল্প রচনায় ছায়া ফেললেও, রবীন্দ্র অনুকরণ তিনি করেন নি। স্বামী অক্ষয় চৌধুরীর মতোই অনায়াস সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল শরৎ কুমারীর। সৃষ্টির প্রতি ঔদাসীন্যও ছিল স্বামীরই মতো সমান প্রবল। তাঁর রচিত গল্প নিয়ে 'শুভ বিবাহ' (১৯০৬) নামে একটি সংকলন গ্রন্থ আছে। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবীও (১৮৭২-১৯৪৫) একজন সার্থক ছোটগল্পকার।

Dhaka University Institutional Repository

সরলা দেবীর একটি মাত্র গল্প সংকলন 'নব বর্ষের স্বপ্ন' (১৯১৪)। গ্রন্থে গল্প সংখ্যা পাঁচটি হলেও আসলে উপখ্যান হচ্ছে চারটি। এ সময়কার আর একজন মহিলা গল্পকার সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯১৬) তাঁর গল্প সংকলন– 'কাহিনী বা ক্ষুদ্রগল্প' (১৮৯৮)। 'ভারতী' গোষ্ঠীর গল্প লেখিকাদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী ও অনুরূপা দেবী ছিলেন বিশেষ স্মরণীয়। এই দুই সহোদরা ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী। এঁরা 'ভারতী' গোষ্ঠীর গল্পধারায় এক নূতন সুরের ঝঙ্কার তুলেছিলেন– এক নবীন জীবন–প্রেমের বাণী। ইন্দিরা দেবীর (১৮৭৯-১৯২২) গল্প সংকলন হচ্ছে– 'নির্মাল্য' (১৯১২), 'কেতকী' (১৯১৪), 'মাতৃহীন' (১৯১৭), 'ফুলের তোড়া' (১৯১৮) এবং লেখিকার মৃত্যুর পর প্রকাশ পায় 'শেষ দান' (১৯২৪)। ইন্দিরা দেবীর অনুজা সহোদরা অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) শিল্পী হিসেবে ছিলেন অতিশয় আত্মসচেতন। এঁর গল্প সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে 'চিত্রদীপ', 'উল্কা', 'রাঙাশাঁখা' (১৯১৫) এবং 'মধুমল্লী' (১৯১৭); লেখিকার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে– 'ক্রৌঞ্চমিথুনের মিলন কথা'। নিরুপমা দেবীর (১৮৮৮-১৯৫১) কিছু কিছু গল্প নারী হস্তের স্নিগ্ধতায় মনোহর। তাঁর গল্প সংকলন 'আলেয়া' (১৯১৭)। এছাড়া তাঁর অগ্রজ ভাই বিভূতি ভট্ট'র সঙ্গে যৌথভাবে 'অষ্টক' (১৯১৭) নামে একটি গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। অষ্টকের আট গল্পের মধ্যে চারটি নিরুপমা দেবীর। রবীন্দ্র কন্যা মাধুরীলতাও (১৮৮৬-১৯১৮) কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। এঁর কোন গল্পগ্রন্থ হয় নি, তবে মাধুরীলতার লেখা তিনটি গল্পের সন্ধান মেলে– 'মাতাশত্রু' (ভারতী), 'সুরো' (সবুজপত্র) এবং 'সৎপাত্র' (বঙ্গদর্শন) এগুলো পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

এই সময়ের বাংলা ছোটগল্পে মূলত ব্যক্তি বা পরিবারের সমস্যাই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। "উপাখ্যান, রূপকথা, রোমান্স, নভেলা প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করে কালক্রমে জন্ম নিয়েছে আধুনিক বাংলা ছোটগল্প।"[১৩] বাংলা ছোটগল্পের ক্রমধারা আলোচনায় এর পরেই আসে রবীন্দ্রনাথের কথা। "ছোটগল্পের প্রতীতি– সমগ্রতা, প্রারম্ভিক দ্রুততা, পরিণামী ইঙ্গিতময়তা, সঙ্কেতধর্মিতা কিংবা শৈলীর সূক্ষ্মতা রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী গল্পকথিত রচনাপুঞ্জে ঐতিহাসিক ভাবেই অনুপস্থিত।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' প্রকাশিত হয় 'ভারতী'র প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪/১৮৭৭ ইং)। পরের গল্প 'করুণা'। 'করুণা' উপন্যাসোপম বৃহৎ গল্প (রবীন্দ্র রচনাবলীর ৬৮ পৃষ্ঠাব্যাপী)। একে উপন্যাস বলাই শ্রেয়। পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ দুটির কোনটিকেই গল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য :

> "ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে।"[১৫]

দীর্ঘ জীবনের সাতান্ন বছরের কাল পরিধিতে রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখেছেন ১১৯টি। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য, রচনাশৈলী, চরিত্র নির্মাণ, ভাবাবেগ বা অনুভূতি প্রকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। এবং এইসব

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষায় তিনি সার্থকতাও অর্জন করেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প রচয়িতাদের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছেন অনায়াসে। রবীন্দ্রনাথের "গল্পে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ মানবসংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষাটা প্রবলতর।"[১৬] ফলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্প বিচার করলে আমরা সুখ-দুঃখ প্রেম-বিরহময় সমগ্র বাঙালি মানস তথা তৎকালীন সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনীতিক জীবন প্রবাহের সন্ধান পাই। প্রাক-রবীন্দ্রযুগের রিক্ত উত্তরাধিকারের উপরেই রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেন বাংলা ছোটগল্পের রাজকীয় সৌধ। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের একক সাধনায় বাংলা ছোটগল্প বিশ্ব ছোটগল্পের আসরে অর্জন করে সম্মানের আসন। তবুও রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ছোটগল্পকার সঞ্জীবচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, চারুচন্দ্র প্রমুখ লেখকের প্রচেষ্টায় বাংলা ছোটগল্পের যে ভিত্তিপ্রস্তর নির্মিত হয়েছিল, তার গুরুত্ব ঐতিহাসিক কারণেই অপরিসীম। এঁদের একনিষ্ঠ সাধনা রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল আবির্ভাবের পথ নির্মাণ করে দিয়েছিল; একথা বলা অত্যুক্তি নয়।

তথ্যনির্দেশ :

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ: ৬
২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ: ৬
৩। শিশিরকুমার দাশ : বাংলা ছোটগল্প (কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ: ২৭-২৮
৪। শ্রীভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ: ৪৮
৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় : বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ: ৩৪
৬। রবীন্দ্রনাথ রায় : ছোটগল্পের কথা, (সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৮৮), পৃ: ৮৪
৭। প্রমথনাথ বিশী : বাংলার লেখক (প্রবন্ধ : ত্রৈলোক্যনাথ)।
৮। শ্রীভূদেব চৌধুরী; বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ: ৬৯
৯। বিশ্বজিৎ ঘোষ : একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৯ (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ: ১০৪
১০। শ্রীভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার (কলকাতা, ১৯৮৯) পৃ: ১৯৭
১১। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৪৮
১২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ: ১৩৬
১৩। শিশিরকুমার দাশ : বাংলা ছোটগল্প (কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ: ৫৫।
১৪। সৈয়দ আকরম হোসেন : বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ: ১০১-০২।
১৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৭০
১৬। প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, পৃ: ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলা ছোটগল্প : প্রারম্ভ থেকে 'কল্লোল'-পূর্ব সময় পর্যন্ত

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) হাতেই পূর্ণতা পেল বাংলা ছোটগল্প। বাংলা ছোটগল্পের জনক, প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের হাতেই এর পত্তন, পরিচর্যা, বিকাশ। সেই অর্থে তাঁর হাতেই ঘটে আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল মুক্তি। শিল্প সার্থকতার বিচারে ছোটগল্পের প্রবর্তক ও প্রথম শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। কেবল নতুন রূপকল্প হিসেবে নয়, বাঙালির বাস্তব জীবনের স্বাদ, সৌরভ, আশা-আনন্দ, দুঃখ-বেদনার কথামালা হিসেবে গল্পগুচ্ছ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। ... আমি যে ছোটগল্পগুলো লিখেছি বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম তাতেই ধরা পড়ে।"[১]

মূলত পল্লীবাংলার জীবনচিত্রের রূঢ় বাস্তবতাই গল্পগুচ্ছের বাস্তবতা।

ঔপনিবেশিক শাসনের এক বিশেষ পর্যায়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদের প্রভাবে বাংলার পল্লীগ্রামে যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করে এবং পল্লীবাংলার মানবের মাঝে দেখা দেয় এক নবতর জীবনবোধ, মূলত এই দ্বৈত-প্রবণতার মাধ্যমেই ছোটগাল্পিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' প্রকাশ হয় ভারতীর প্রথম বর্ষ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৮৪/১৮৭৭ ইং)। পরের গল্প 'করুণা'। যদিও করুণা ছোটগল্প হিসেবে সার্থক নয়। রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সের রচনা 'ভিখারিণী'রই মধ্যে দিয়ে আধুনিক ছোটগল্প এবং রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের যাত্রা শুরু। এটি গল্পের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক নির্মাণ। এরপর দীর্ঘ ৪৩ বছর ধরে (১৮৯১-১৯৩৩) প্রায় ৯০টি গল্প রচনা করেন এবং দীর্ঘ জীবনের ৫৭ বছরের কাল পরিধিতে ১১৯টি গল্প লিখেছেন। প্রকাশকাল ও চরিত্র লক্ষণের দিক বিচার করে রবীন্দ্রনাথের গল্প সমূহকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যাস করা যায়—

Dhaka University Institutional Repository

১। ঊনবিংশ শতাব্দীর কালসীমায় রচিত গল্প (১৮৯১-১৯০০)

২। বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী গল্প (১৯০১-১৯১৩)

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্প (১৮১৪-১৯৪০)

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রথম পর্বের গল্পে পদ্মা তীরবর্তী পূর্ব বাংলার প্রকৃতির তাঁর চেতনায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। পল্লী বাংলার জীবনধারা, মানুষের কাছাকাছি অবস্থান, নগরজীবনের কোলাহলের চেয়ে বেশি ভাল লেগেছিল। একদিকে অভিজ্ঞতার দুয়ার খুলে পল্লীর জনজীবন যেমন কবির চিন্তার পটপরিবর্তন করেছে, অন্যদিকে নতুন পল্লী তাঁর সৃষ্টির ফল্গুধারাকে করেছে বিকশিত। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন :

> "রবীন্দ্রনাথ খাস কলিকাতার মানুষ। কিন্তু তাঁদের পৈতৃক জীবিকার উপায়টির অবস্থান সুদূর পল্লীবঙ্গে। ইতিপূর্বে তিনি সেখানে অনেকবার গিয়েছেন সত্য, কিন্তু সে যাওয়া এবং সে দেখা নিতান্তই বাহির হইতে। বিস্তৃত জমিদারীর পরিদর্শন ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে তিনি গেলেন ১৮৯১ সালে।"[২]

অতএব, একথা বলা যায় যে, বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও তার মানুষই এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রধান উপাদান।

পল্লীর সমাজ-সংসার, অভাব-অভিযোগ, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র, অর্থনৈতিক-পারিবারিক সমস্যাবলী তাঁর গল্পে বাঙময় হয়ে উঠেছে। এগুলোকে আমরা এক কথায় জীবনযাত্রার অনুষঙ্গ বলতে পারি। 'ছোটগাল্পিক রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী মানুষ।'[৩] তাই তাঁর ছোটগল্পের বাস্তবতাবোধে মানুষের জীবনযাত্রার অনুষঙ্গ ও প্রকৃতিচিত্র সমানভাবে ক্রিয়াশীল। পল্লীর অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত মানুষেরা তৎকালীন নাগরিক সভ্যতার আলো থেকে স্বভাবতই দূরে থেকে জীবন জীবিকার জন্য সবসময় প্রকৃতির উপরই নির্ভর করত। কৃষকের জমিকর্ষণ, জেলেদের মাছ ধরা, রাখালের গরু নিয়ে মাঠে যাওয়া, মাঝির নৌকা বাওয়া, সব কিছুই প্রকৃতি নির্ভর। "রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রকৃতি শুধু পটভূমিই নয় একেবারে গল্পের প্রধান অঙ্গ হয়ে, কোথাওবা চরিত্র হয়ে, কোথাওবা কোন চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলেমিশে গিয়ে গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে আছে।"[৪] প্রথম পর্বে রচিত গল্পের সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত রবীন্দ্রনাথের গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পোস্টমাস্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'দালিয়া', 'কঙ্কাল', 'একরাত্রি', 'জীবিত ও মৃত', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'সুভা', 'মহামায়া', 'মধ্যবর্তিনী', 'শাস্তি', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি', 'ডিটেকটিভ', 'অধ্যাপক' প্রভৃতি। এ গল্পের বেশির ভাগই পল্লিকেন্দ্রিক এবং এখানে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের হৃদয় রহস্য ও মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় ঐকাত্ম্য। কেবল পদ্মা তীরের মানব-মানবীই নয়, পদ্মাও তাঁর গল্পে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। যেমন– 'খোকা বাবুর প্রত্যাবর্তন'– দেখা যায় দুরন্ত পদ্মাই গল্পের পরিণাম নির্দেশক হয়ে উঠেছে। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

"বর্ষা আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরে কাশবন এবং বন ঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙ্গার অবিশ্রাম ঝুপঝাপ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল; এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।"

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নির্ভর "নিশীথে" গল্পে একটি অপরাধ পীড়িত মনের শংকা প্রকাশিত হয়েছে নিতান্ত কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনায়। প্রতারণাকারী দক্ষিণাচরণ মনোরমাকে বিয়ে করে বোটে বেড়াতে বেরুলেন–

"ভয়ঙ্করী পদ্মা তখন হেমন্তের বিরহহীন ভূজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত চর ধূ-ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আম বাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপঝাপ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।"

"নিশীথে গল্প একটি অপরাধী মনের ব্যঞ্জনাময় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।"[৫] প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের নিবিড়-আত্মিক সম্পর্ক এবং এই সম্পর্ক থেকে বিচ্ছেদজনিত জটিলতা গল্পগুচ্ছের একটি উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছেদ ঘটলে মানবজীবনে নেমে আসে আত্মিক মৃত্যু। 'ছুটি', 'সুভা', 'সমাপ্তি', 'অতিথি' গল্প তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ পর্বের গল্পে আর একটি দিকের প্রকাশ ঘটেছে। মানুষের হৃদয় রহস্যের উন্মোচন। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি পালন করেছে মুখ্য ভূমিকা। মানব হৃদয়ের আবেগঘন জীবনকে চিত্রিত করে এ পর্বে কিছু অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুণ্যে ভরা গল্প লিখেছেন। 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'একরাত্রি', 'মধ্যবর্তিনী', 'জীবিত ও মৃত' প্রভৃতি উল্লেখ্য। পোস্টমাস্টারের জন্য রতনের নারী হৃদয়ের যে কান্না, সে তো চিরদিন কোন অধরার জন্য। কোন সুদূর অসম্ভবের জন্য মানব হৃদয়ের কান্না, যাকে পাওয়া যাবে না, তারই জন্য অবুঝ হৃদয়ের হাহাকার।[৬] 'সমাপ্তি' গল্পে হৃদয় রহস্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মৃন্ময়ীর জীবনে নেমে এসেছে ভালোবাসার শতস্রোতস্বিনী– "সমাপ্তি গল্প গোড়া থেকেই উজ্জ্বল। সারা গল্পে 'লাইট-মোটিফ' খুব সক্রিয়। আলোকের ঝর্নাধারায় স্নাত এই গল্পে সবই তরল আনন্দ। কোন দুঃখ বিষণ্নতার ছায়াপাত হয় নি। আলোর স্রোত আর নদীর স্রোত, দুয়ে মিলে ভারি একটি আনন্দস্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছে।"[৭]

প্রথম পর্বের রবীন্দ্রগল্পে পদ্মার প্রভাব দূর সঞ্চারী। পদ্মার বোটে ভেসে ভেসে তিনি পল্লীর সাধারণ মানব জীবনের আনন্দ-বেদনা আর সংগ্রামের ছবি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ কারণে শুধু প্রকৃতিই তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য পায় নি– প্রকৃতির সাথে রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাসের রঙিন জগৎ ছেড়ে এ পর্বে রবীন্দ্রনাথ নেমে এসেছেন বাস্তব জীবনের আঙ্গিনায়। জটিল, যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনের ছবি নিয়ে তিনি রচনা করেছেন– "রামকানাইয়ের

Dhaka University Institutional Repository

নির্বুদ্ধিতা', 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'স্বর্ণমৃগ', 'দান-প্রতিদান', 'শাস্তি', 'দেনা-পাওনা', 'সমস্যাপূরণ' প্রভৃতি। 'শাস্তি' গল্পে সমাজের নিম্নস্তর থেকে উপাদান চয়ন করে প্রাগ্রসর ব্যক্তিত্বসম্পন্না চন্দরা নামের যে নারী চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ প্রায় শতবর্ষ পূর্বে নির্মাণ করেছেন, তা আজও যে কোন বাঙালি লেখকের কাছে বিস্ময়কর।

প্রথম পর্বের গল্প পল্লিকেন্দ্রিক। পদ্মা তীরবর্তী বাংলার পল্লী-প্রকৃতি প্রথম পর্বের গল্প সমূহের অন্যতম সৃষ্টি উৎস। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবীর কাছে এক পত্রে অভিমত প্রকাশ করেন– 'বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতির সঙ্গে যখন আমার চোখে চোখে পরিচয় হয়েছিল তখন প্রতিদিন আমার মনে যে আনন্দের ধারা উদ্ভাবিত হয়েছিল, তাই সহজে প্রবাহিত হয়েছিল ... নিরলংকৃত গল্পগুলির ভিতর।'[৮] পল্লীর সরল জীবনের নানা বিষয় নিয়ে যদিও তাঁর গল্পগুচ্ছের বিশাল অবয়ব। পল্লী প্রাধান্য পেলেও নগর জীবনের বিসঙ্গতি ও বিপর্যয় নিয়েও তিনি অনেক গল্প লিখেছেন। যেমন– 'কঙ্কাল', 'মধ্যবর্তিনী', 'মানভঞ্জন' ইত্যাদি। পুঁজিবাদী বিকাশের পটে কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের প্রকাশ ঘটে এসব গল্পে। কলকাতা জীবনের হঠাৎ সৃষ্ট বাবু সম্প্রদায়ের নানা কদর্যতা এবং বিসঙ্গতি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প 'মানভঞ্জন'। 'বাঙালি বাবুদের বারাঙ্গনা প্রীতির কারণে গৃহবধূর অন্তরে স্ব-রূপের যে অবমাননাবোধ জাগ্রত হয়, তা-ই এ গল্পের পরিণাম-নির্দেশক।'[৯] প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ আবেগী পরিচর্যা ও সাঙ্গীতিক মূর্ছনায় গল্পের অবয়ব নির্মাণ করেছেন। চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এ পর্বের গল্পে প্রাধান্য পায় নি। তবে বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পর্বে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে যে প্রবণতা তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তা লক্ষ করা যায় সমাপ্তি গল্পে। এ গল্পে মৃন্ময়ীর প্রকৃতিগত পরিবর্তন যেমন বাস্তবানুগ, তেমনি মনস্তত্ত্ব সম্মত। এ পর্বের গল্পে অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা রবীন্দ্রনাথ অতিক্রম করেছেন কবি দৃষ্টির সহায়তায়– ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে গীতল-কাব্যিক পরিচর্যা। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'কাবুলিওয়ালা।'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্পসমূহের সার্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি শুধু পটভূমিই নয় একেবারে গল্পের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছে কোথাও কোথাও। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কাল-পরিসরে রচিত রবীন্দ্রনাথের গল্প সমূহকে দ্বিতীয় পর্বের গল্প হিসেবে বিন্যস্ত করা যায়। এ পর্বে 'আমরা রবীন্দ্র গল্পের নতুন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি– যেমন রূপে, তেমনি স্বাদেও পদ্মা-ঋতুর গল্পগুলি থেকে এদের অভিনবতা মৌলিক।'[১০] এ পর্বে রচিত ষোলটি গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ', 'নষ্টনীড়', 'মাল্যদান', 'গুপ্তধন', 'পণরক্ষা' ইত্যাদি। 'নূতন পর্যায়ের গল্পগুচ্ছের সম্পর্কে সহজ-সরল স্বতঃস্ফূর্তির অভাব পূরণে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, 'টেকনিক' এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার বিশেষিত ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।'[১১]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পর্বের গল্পে রবীন্দ্রনাথ পদ্মা তীরবর্তী পল্লী জীবন ছেড়ে ক্রমশ শহর অভিমুখী হয়েছেন। তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় নির্বাচনে তিনি বেছে নেন নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনকে। প্রথম পর্বের গল্পের আবেগী এবং নাট্যিক পরিচর্যার স্থলে এ পর্বের গল্পে দেখা যায় বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যা। গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় পর্ব থেকেই গল্পচরিত্রসমূহ দীপ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে, যা প্রথম পর্বে ঘটে নি। প্রথম পর্বের শেষ দিককার গল্পে রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার যে সীমিত পরিচয় উন্মোচিত হয়েছিল, দ্বিতীয় পর্বের গল্পে তা বিস্তৃতভাবে রূপলাভ করেছে। প্রথম পর্বের গল্পে ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ের কথা মুখ্য উপজীব্য, কিন্তু এ পর্বে সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশে মানুষের বহির্জগতের পরিচয়ই রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট।[১২]

দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ পদ্মা ঋতুর গল্পগুলো থেকে নবতর স্বাদের গল্প রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। 'পদ্মা ঋতু বলতে বুঝেছি পদ্মা, তথা নদীমাতৃক বরেন্দ্র-পল্লীর ভাব-প্রভাবিত কবি মনোঋতুকে। এই নতুন ঋতুর পাকা ফসলটি প্রথমে ঘরে উঠল বুঝি "নষ্টনীড়'কে নিয়েই।'[১৩] এবারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোম্যান্টিকতার মোহন জগৎ ছেড়ে ধীরে ধীরে বাস্তবের কঠিন রুক্ষ ভূমিতে নেমে এলেন। প্রাক 'সবুজ পত্র' যুগের গল্প রচনার শ্রেষ্ঠ ফসল 'নষ্টনীড়'। এ গল্পের পট আর পটভূমি কলকাতা মহানগরী। হার্দিক রক্তক্ষরণে চারুলতা নামের এক আধুনিক নারীর হৃদয় বেদনার গল্প 'নষ্টনীড়'। 'সবুজ পত্র' যুগের গল্প তথা বিশ্বযুদ্ধোত্তর উপন্যাস রচনার ক্রমিক প্রস্তুতির স্বাক্ষরবাহী গল্প হচ্ছে এই 'নষ্টনীড়'। এখনে হৃদয়াবেগের চেয়ে মনোবিকলন, গতির চেয়ে বিকৃতি, গীতময়তার চেয়ে বিশ্লেষণ সমধিক– এই বৈশিষ্ট্যই 'সবুজপত্র' যুগের গল্পে ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়েছে। এ বিচারে বাংলা গল্পের ইতিহাসে 'নষ্টনীড়' এক ঐতিহাসিক সৃষ্টি। আর এখান থেকে বাংলা ছোটগল্পে মনোবিকলনাশ্রিত আধুনিক বিজ্ঞান এষণাময় জীবনচিন্তার অগ্রসৃতি।

> "ভূপতির সর্বনাশের মধ্যে অমল যে অকথিত সমস্যার প্রলয়াচ্ছন্নতা হঠাৎ আবিষ্কার করলো, আর অমলের অকস্মাৎ অন্তর্ধানের প্রেক্ষাপটে চারু যে আত্ম-আবিষ্কার করলো, এ দুইকে দুর্নৈতিক বলবো কোন মূঢ়তায়। সুবৃহৎ গল্পের অতি সংক্ষিপ্ত সমাপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি কথাই কেবল বুঝি, মানুষের মন বিচিত্র, জটিল, দুরবগাহ; মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত আদর্শবাদ ও বিবেকবুদ্ধির সব কিছু দিয়েও তার অতলান্ততার পরিমাপ হয় না। সেই অন্তহীন জিজ্ঞাসার সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে, নম্রশিরে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়; মানুষের জীবনে অনন্ত প্রাণকে প্রণাম করেই এই সমাপ্তিহীন রহস্যযাত্রা সাঙ্গ করতে হয়। ধাপে ধাপে সুকল্পিত বর্ণনা ও বিশ্লেষণের বিন্যাসে জীবনের সেই সীমাহীন জিজ্ঞাসার প্রান্তরে বাংলা গল্পকে প্রথম টেনে এনেছে– 'নষ্টনীড়'।"[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে বর্ণনার মধ্যেও ইঙ্গিত এবং ব্যঞ্জনার ঝঙ্কার তুলে দিয়ে খণ্ড-সীমিতের মধ্য দিয়ে অসীম অখণ্ডের সুরকে জাগিয়ে তোলার সাধনা করেছেন। গল্পের শেষ চারটি বাক্যে চারু-ভূপতির কথোপকথনে সেই ব্যঞ্জনা, সেই সুর অখণ্ড ঘনতা আয়ত্ত করেছে। 'নষ্টনীড়' আশ্চর্য সফল এক ছোটগল্প।

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় পর্বের গল্পগুলোতে নির্মাণ করেছেন নতুন শিল্পভুবন। এ পর্বের গল্পগুলো 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়। তৃতীয় পর্বের গল্পে মূলত 'বংশ বনাম ব্যক্তির লড়াই– ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নানাভাবে দেখা গেছে। এই দ্বন্দ্বের এক চেহারা দেখি হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী গল্প ত্রয়ীতে।'[১৫] প্রাগ্রসর জীবনবোধ ও শিল্পরীতিতে বিশিষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর পর্বের গল্প এ পর্যায়ভুক্ত। জাতিক-আন্তর্জাতিক নানা ঘটনা ও প্রবণতা এ সময়ে রবীন্দ্রমানসকে রূপন্তরিত করে এবং তিনি মুখোমুখি হন সম্পূর্ণ এক নতুন জীবন জিজ্ঞাসার। এ বিষয়ে সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেনের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য–

> "মূলতঃ এ সময় রবীন্দ্রনাথ যুগযন্ত্রণা ও সৃষ্টি বেদনার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুনর্জন্ম লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে, ইংল্যান্ডের মর্মমূল আহৃত জীবন জিজ্ঞাসা, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিজনিত দায়িত্ববোধ, সভ্যতাবিষয়ক অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষায়, স্বদেশের অবমাননাকর সমালোচনা ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয়– এ সবের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় নবজাত রবীন্দ্রচেতনা বিপুল বেগে ধাবমান হলো। সৃষ্টির নতুনসাধনায়, জীবনালোকিত নতুন তট সীমায়। 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' (বৈশাখ ১৩২১) প্রবন্ধে। 'বলাকা'র কবিতায়, 'ফাল্গুনী' নাটকে, 'গল্পগুচ্ছে' ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে তার সার্থক সূত্রপাত।"[১৬]

তৃতীয় পর্ব মূলত 'সবুজ পত্র' যুগে রবীন্দ্রনাথ যৌবনের বিদ্রোহ, ব্যক্তির আত্মমর্যাদা, নারীর আত্মমর্যাদা প্রভৃতি ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। 'হালদার গোষ্ঠী'তে অনড় বংশ মর্যাদা ও শৃংখলার বিরুদ্ধে ব্যক্তির একক সংগ্রাম, 'হৈমন্তী'তে একান্নবর্তী পরিবারের বদ্ধ দুর্গে খোলা হাওয়ার প্রবেশাধিকার। 'বোষ্টমী'তে বংশ পরম্পরার রীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ শিল্পরূপায়িত হয়েছে। বোঝাই যায়, এসব গল্পে তত্ত্বের প্রাধান্য। আগে তত্ত্ব পরে গল্প। 'হালদার গোষ্ঠী'র বনোয়ারীলাল যৌবনের সার্থকতা চায়। এ পথের প্রধান বাঁধা হালদার গোষ্ঠীর বংশ মর্যাদা। পুরাতনের বিরুদ্ধে নতুনের অভিযানে বনোয়ারীই প্রথম অভিযাত্রী। প্রাণের দাবীতে সে হালদার পরিবারে প্রবীণের খাঁচা থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে চলে গেছে। এ গল্পে ব্যক্তিত্বের স্বধর্ম ও স্বরূপ উন্মোচন হয়েছে কাব্যিক ভাবে–

> "প্রেমের নিবিড়তায় সকলের তো প্রয়োজন নাই; সংসারে ছোটো কুনকের মাপের বাঁধা বরাদ্দে অধিকাংশ লোকের বেশ চলিয়া যায়। সেই পরিমিত ব্যবস্থায় বৃহৎ সংসারে কোনো উৎপাত ঘটে না। কিন্তু এক-এক জনের ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষিশাবকের মতো কেবল মাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্যরসটুকু লইয়া বাঁচে না। তাহারা ডিম ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারী সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে, নিজের প্রেমকে নিজেই পৌরুষের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য তাহার চিত্ত উৎসুক, কিন্তু যে দিকেই সে ছুটিতে চায়, সেই দিকেই হালদার গোষ্ঠীর পাকা ভিত; নড়িতে গেলেই তাহার মাথা ঠুকিয়া যায়।"

এ বর্ণনায় প্রাণকে অনুভব করার কবি শক্তির মূলে রয়েছে প্রাণভেদী বৌদ্ধিক (Intellectual) অন্তর্দৃষ্টির বিদ্যুৎ-দীপ্তি। এই বৌদ্ধিক অনুভব-ঋদ্ধতার গুণেই এ যুগের রচনা তির্যক, এমন কি সাংকেতিকও হয়ে উঠেছে। বাঁধন ভাঙ্গার বিদ্রোহী সুরেও সকল গল্পের সাধারণ সাধর্ম। বিভিন্ন যন্ত্রের আধারে জীবনের একই সুর ধ্বনিত হয়েছে এই সময়কার সকল গল্পে।[১৭] তৃতীয় পর্বের রবীন্দ্র গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে প্রথা ও সমষ্টির সংঘর্ষ এবং সকল সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ। এ পর্বের প্রধান গল্পগুলো হল– 'হালদার গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরি' ইত্যাদি। 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত এ গল্পগুলোতে আমরা লক্ষ্য করি নারী ব্যক্তিত্বের মুক্তিসাধনা। পক্ষান্তরে 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্পে দেখতে পাই বিজ্ঞান চেতনার আলোকে ব্যক্তির আত্মমহিমা আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তির বিদ্রোহই তৃতীয় পর্বের রবীন্দ্র গল্পের মৌল বিষয়। বংশের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ এবং ব্যক্তিত্বের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম (হালদার গোষ্ঠী), রক্ষণশীল সমাজ ও প্রথার বিরুদ্ধে নারীর নীরব প্রতিবাদ (হৈমন্তী), প্রথালালিত ধর্মাচারণের বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রাম (বোষ্টমী), সামাজিক লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী নারীর বিদ্রোহ (স্ত্রীর পত্র), গতানুগতিক প্রেম ধারণার বিরুদ্ধে আধুনিক নারী সত্তার জাগরণ (পয়লা নম্বর), এক মুখী পতিভক্তি বা স্মৃতি লালিত বৈধব্যে প্রেমের মুক্তি বিষয়ক সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আধুনিক নারীর ব্যক্তিমহিমার উদ্বোধন (ল্যাবরেটরি)– এইসব বহুমাত্রিক ব্যক্তি বিদ্রোহে তৃতীয় পর্বের রবীন্দ্রগল্প বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল, শিল্পসাধনে বিশ্বপ্রসারী, জীবনবোধে সমাজ সভ্যতাসতর্ক। নারীর আত্মজাগরণের শিল্প ভাষ্য হিসেবে 'স্ত্রীর পত্র' রবীন্দ্র গল্পধারায় এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। 'মৃণালের যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এ গল্পের বিষয় তা এদেশের ফিউডাল সমাজের নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা নিয়ে একটা সামগ্রিক পুনর্মূল্যায়ন।'[১৮] অনাথ বালিকা বিন্দু মৃণালের চেতনায় জ্বেলে দিয়েছে মুক্তির আলো– নারী জাতির প্রতি অমানবিক অত্যাচারে মৃণাল জ্বলে উঠেছে আপন সত্তায় :

"আমার ঘর কন্নার মধ্যে ঐ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ত যেদিন আগাগোড়া এমন রঙিন হয়ে উঠল সেদিন আমি বুঝলুম, হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আসে– সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে; গলির মোড় থেকে আসে না।

বিন্দুর ভালোবাসার দুঃসহ বেগ আমাকে অস্থির করে তুলেছিল। ... তার এই

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখি নি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ।"

—— 'এই গল্পকে এক কথায় বলা যায়— যৌবনের আহ্বান; 'নারীর মূল্যবোধ ও ব্যক্তির বিদ্রোহের গল্পরূপ।'[১৯] "পয়লা নম্বর" এর অনিলা অনেক দুঃখের পর সেই মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। তার এক পাশে স্বামী অন্যপাশে সিতাংশু মৌলি। দুপাশে দু দেয়াল ছিল তার মাথা ঠুকবার। কিন্তু সে জীবনের চোরাগলিতে কোনো দেয়ালের আঁচড়ই লাগতে দেয় নি প্রাণের গায়ে। অনিলা কাউকে গ্রহণ করে নি। সে গৃহ ত্যাগ করে। এখানে অনিলার মাঝে দেখতে পাই একটি বিদ্রোহী সত্তা। সে নারী তার নারীত্ব সম্পর্কে সচেতন।

আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা রবীন্দ্র ছোটগল্পের একটি অন্যতম বিষয়। যুগলের নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র ছোটগল্পের নর-নারীকে বিচিত্র জীবন জটিলতার সম্মুখে দাঁড় করিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র ছোটগল্পে অনেক সময়েই সামাজিক অর্থনৈতিক কারণের সূত্র ধরে উপস্থিত হয়। যুদ্ধোত্তর বিচ্ছিন্নতা বোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছিন্নতাকে এক করে দেখা কোন সূত্রেই নয় যৌক্তিক, তবু দাম্পত্য-পঙ্গুতার রূপায়ণের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধের আধুনিক রুগণতার জায়মান বীজটিকে যেন আমরা হঠাৎ করেই পেয়ে যাই। নর-নারীর বিযুক্তি ও বিয়োগ রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে আমরা লক্ষ করি।[২০] 'দৃষ্টিদান' গল্পে আমরা দেখতে পাই শারীরিক পঙ্গুতায় আসে দূরতিক্রম্য ব্যবধান। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে শারীরিক সান্নিধ্য সত্ত্বেও তৃতীয় মানুষ এসে যুগলের মাঝে তৈরি করে মেরুদূর মানসিক বিচ্ছিন্নতা। প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যা রবীন্দ্র গল্পে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা হয়েছে চিত্রিত। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা গল্প হয়ে উঠেছে শিল্পিত ও বহুবর্ণশোভিত। দৃষ্টিকোণ, পরিচর্যা, ভাষারীতি এবং প্রকারণ-প্রকৌশলে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শেই বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ছোটগল্প রচয়িতাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) নাম উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্র সমাজ সচেতন লেখক। সাধারণ নিম্নবিত্তরাই শরৎচন্দ্রের গল্পে ভীড় করেছে। 'গল্প রচনায় শরৎচন্দ্রের মূল লক্ষ্য ছিল চরিত্র সৃষ্টি, সন্দেহাতীত। অথচ কাহিনীও সেখানে কাজ করেছে চরিত্র সৃষ্টির মূল সহায়ক শক্তিরূপে।'[২১] মূলত শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক হলেও বেশ কিছু ছোটগল্প লিখেছেন। ছোটগল্পের একমুখী গতি, ব্যঞ্জনার প্রতীতিসমগ্রতা এবং ঘটনাংশের শাখাহীনতা শরৎচন্দ্রের গল্পে প্রায়ই দুর্লক্ষ্য। তাঁর গল্প মূলত উপন্যাসেরই সগোত্র। "শরৎচন্দ্রের গল্প চরিত্র বা ঘটনার প্রতি আলোকপাত করেই নিভে যায় না, তা সেই সঙ্গে আরো অন্য চরিত্রকে আলোকিত করতে চায়, তা ঘটনার স্বল্পতায় সন্তুষ্ট হয় না, বহুলতাকে

Dhaka University Institutional Repository
ভালোবাসে। ... তাঁর ধর্ম ভাবাতিরেক, তাই ছোটগল্পের ছোট পরিসরে বাকস্বল্পতার ও মিতভাষণের মধ্যে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। আর তাঁর লক্ষ্য উপন্যাসিক সুলভ খুঁটিনাটি দিকেও ঘটনাপ্রবাহের ধাক্কায় চরিত্রকে তরঙ্গিত করে তোলা।"[২২] ছোটগল্পের মূল লক্ষ্য– ঘটনাংশ বিস্তার, চারিত্রিকবিকাশ এবং ঘটনা স্রোতের বিপুল বিস্তারের অবকাশ থাকবে না। কিন্তু শরৎচন্দ্র গল্পে এ ছোটগাল্পিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেন নি। এ কারণে তাঁর ছোটগল্প অনেকে ক্ষেত্রে শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে নি। তবে কিছু গল্প সার্থক ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের মোট পঁচিশটি গল্পের সমাহারে ৮টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গল্প গ্রন্থগুলো– (১) বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (১৯১৪), (২) মেজদিদি (১৫১৫), (৩) নিষ্কৃতি (১৯১৭), (৪) কাশীনাথ (১৯১৭), (৫) স্বামী (১৯১৮), (৬) ছবি (১৯২০), (৭) হরিলক্ষ্মী (১৯২৬) এবং অনুরাধা সতী ও পরেশ (১৯৩৪)। গল্পের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র সমাজের সংস্কার কু-সংস্কারকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সমাজে অপ্রলিত উঁচু নীচুর প্রেম কাহিনীও বিষয়বস্তু হয়েছে তাঁর গল্পে। তাঁর গল্পে, উপন্যাসের মতোই সমাজ ভাবনা, মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব এবং হার্দিক ভাবালুতা প্রকাশ পেয়েছে। 'মন্দির', 'দর্পচূর্ণ', 'মামলার ফল', 'পরেশ', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বোঝা', 'সতী', 'অনুপমার প্রেম', 'বিলাসী', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতি গল্পে আমরা শরৎচন্দ্রের ছোটগাল্পিক প্রতিভার যথার্থ পরিচয়ের সন্ধান পাই।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে বিশিষ্ট গল্পকারদের মধ্যে বিশেষভাবে অন্যতম প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। প্রমথ চৌধুরী যে হাতে শাণিত প্রবন্ধ লিখেছেন, সে হাতেই লিখেছেন গল্প সমূহ। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমধর্মী উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তিনি যখন ছোটগল্প লিখেছেন তখন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, 'ভারত' ও 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকরা গল্প আসরে সগৌরবে বিরাজমান। তবে লক্ষণীয়, প্রমথ চৌধুরীর গল্পের সঙ্গে তাঁদের গল্পের কোন মিল নেই। তাঁর গল্পের গোত্র আলাদা। তাঁর গল্পে তাঁর প্রবন্ধের মতো তীব্র-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, সূক্ষ্ম আঘাত আর তর্কের শাসন। তাঁর গল্পে ঔপনিষদিক উপদেশ বা গভীর তত্ত্ব কথা, সমাজের উপকার ও অনাচার প্রতিরোধের নীতি কথার প্রকাশ ঘটে নি। 'তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু– প্রেম ও রোমান্টিক প্রেমের ন্যাকামি, মর‍্যালিটি ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, রাজনীতি ও সুবিধাবাদ, অ্যাডভেঞ্চার; ভূত আর রোমান্স।'[২৩] তিনি বিশুদ্ধ গল্পরসকে যে কোন মূল্যে বিসর্জন দিতে রাজি নন। প্রমথ চৌধুরীর সংকলিত গল্পগুলো হচ্ছে– 'চার-ইয়ারী কথা' (১৯১৬), 'আহুতি' (১৯১৯), 'নীললোহিত' (১৯৩২), 'ঘোষালের ত্রিকথা' (১৯৩৭) প্রভৃতি। প্রমথ চৌধুরীও জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গল্প লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণীয়–

Dhaka University Institutional Repository

'গল্প রচনার ক্ষেত্রে আর পাঁচজন শিল্পীর মতোই প্রমথ চৌধুরীরও মূল পুঁজি চোখে দেখা জীবনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা যে বিশেষিত উদ্দেশ্যে তিনি প্রয়োগ করেছেন এক অপূর্ব পদ্ধতিতে, সেখানে তিনি পাঁচজনের মধ্যে থেকেও আর একজন– একতমজন। জীবন চিন্তার সতন্ত্র individuality ও প্রয়োগবিধির intellectual অনন্যতাই প্রমথ চৌধুরীর গল্পশিল্পকে তুলনারহিত স্বতন্ত্রতার মহিমায় নিঃসঙ্গ করে রেখেছে। আসলে তাঁর সকল সৃষ্টিই নিজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ।'[২৪]

প্রমথ চৌধুরীর ছোটগাল্পিক প্রতিভার উজ্জ্বল ফসল 'চার-ইয়ারী কথা'। এখানে একটি নয় চারটি গল্পের সমষ্টি। বর্ষাঘন এক সন্ধ্যায় মদের আড্ডায় বসে চার বন্ধুর জীবনের প্রেমের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে চারটি প্রেমগাঁথাই হল 'চার-ইয়ারী কথা'র মূল উপজীব্য বিষয়। কাহিনী বিন্যাস চরিত্র পরিকল্পনা ও ভাষাশৈলীতে 'চার-ইয়ারী কথা' বাংলা ছোটগল্প ধারায় এক উজ্জ্বল মাইলফলক। প্রতিটি গল্পের পিছনে আছে তাঁর সুরুচি ও মননের দীপ্ত প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উল্লেখ্য– "গল্প সাহিত্যে তিনি ঐশ্বর্য দান করেছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা, গাঁথা হয়েছে উজ্জ্বল ভাষার শিল্পে।"[২৫] প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গল্পে লক্ষ করা যায় সৌকর্যের প্রতি প্রবল আসক্তি। 'চার-ইয়ারী কথা'র চার নায়কই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রেমের উত্তাল উচ্ছ্বাসে ভেসেছে। 'চার-ইয়ারী কথা'র প্রথম নায়ক সেনের কথা। এক পূর্ণিমা রাতে বেড়াতে গিয়ে দেখা হয় এক অপূর্ব সুন্দরী পূর্ণযৌবনা ইংরেজ রমণীর সাথে। সে রাতে জ্যোৎস্না কলকাতায় অপূর্ব মোহবিস্তার করেছিল। সেই আলোর বন্যায় মেয়েটিকে দেখা মাত্র প্রেমে পড়ে যায়। মেয়েটি হেসে সম্মতি জানায়। তার পর পরই মোহভঙ্গ। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রকাশ পেল মেয়েটি পাগল। সেই উন্মাদিনীর অট্টহাসি আর কান্না সেনের স্বপ্নকে বিদীর্ণ করে দিল। তখন সেনের উক্তি–

'সেদিন থেকে চিরকালের জন্য ইটার্নাল ফেমিনাইনকে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।'

'চার-ইয়ারী কথা'র অন্য নায়কেরাও সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন।

'আহুতি'র গল্পগুলোতে বিচিত্র ও বিরোধী রসের সমাহার। প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি' গল্পে ফুটে উঠেছে বাংলা নিঃশেষিত জমিদার তন্ত্রের পতন এবং পরাভবের করুণ বীভৎস রূপ। করুণ ও ভয়ানক রসে মিশ্রিত ধারায় গল্পটি বাংলা সাহিত্যের বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে 'নীললোহিত' গল্পগ্রন্থ। এ গল্পে আছে বিশুদ্ধ গল্প রস। এ গল্পগুলোকে অনায়াসেই অ্যাডভেঞ্চার গল্প হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ গল্পগুলোর মাধ্যমে একটি ভীরু, কল্পনাপ্রবণ আড্ডাবাজ, অসাধারণ গুলবাজ গল্প বলিয়ে চরিত্রকে লেখক গড়ে তুলেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গল্পেরই মুখ্য বিষয় বিশুদ্ধ গল্পরস নির্মাণ– কোন নীতিপ্রচার; প্লট পরীক্ষা কিংবা ঘটনার চমৎকারিত্ব সৃজনে তিনি মোটেই উৎসাহী নন।[২৬] রবীন্দ্র-

Dhaka University Institutional Repository

শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমার থেকে প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পের ক্ষেত্র ব্যতিক্রমধর্মী। স্বীকার্য, তা কালমণ্ডিত, বিদগ্ধ ও মননঋদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রমথ চৌধুরীর সমকালের লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং তা শিল্প উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে গল্প লেখক হিসেবে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক ত্রৈলোক্যনাথের মতো তিনিও প্রধানত রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের শিল্পী। তাঁর কৌতুক কখনোই নির্মম স্ট্যাটায়ারে পরিণত হয় নি। তাঁর হাস্যরসের পিছনে সর্বদা একটা আত্মতৃপ্ত প্রসন্নতা ও সহজ ব্যঙ্গরস লক্ষ করা যায়। 'প্রভাতকুমারের গল্পের তিন প্রধান বৈশিষ্ট্য– স্বতঃস্ফূর্ততা, পরিমিতিবোধ ও গ্রন্থন নৈপুণ্য। তিনি কোথাও রোমান্টিক কল্পনার রঙিন কল্পলোকে বিহার করেন নি, ভাববাদের প্রেরণায় বাস্তবকে লংঘন করেন নি।'[২৭] তিনি যা বাস্তবে অবলোকন করেছেন তাকেই গল্পে রূপ দিয়েছেন। অভিজ্ঞতার বাইরে তিনি কখনোই পদার্পণ করেন নি। জীবনের নানা অসঙ্গতিকে তিনি ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে সাবলীল সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করে সমাজ জীবনে আনতে চেয়েছেন সঙ্গতির সুর। বিশুদ্ধ কৌতুকরস তাঁর গল্পের প্রধান অবলম্বন, সাথে যুক্ত হয়েছে– বাৎসল্য ও মানব-প্রেম। জীবনকে দেখেছেন তিনি ক্ষমা সুন্দর চোখে। উদার মানবতাবোধের ক্ষেত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ প্রশস্ত ভাষার প্রাঞ্জল, ঘটনা, চরিত্রের আন্তরসম্পর্ক, পরিমিতিবোধ ছোটগাল্পিক গ্রন্থনৈপুণ্য প্রভাতকুমারের জনপ্রিয়তার কারণ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্পকে 'বয়স্কদের রূপকথার রাজ্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের অসামান্য জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে প্রভাতকুমারকে লেখেন– "তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়া, কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।"[২৮] বাঙালির সহজ সরল জীবনের ঘটনার বিন্যাস পরিবেশ, শিল্পসংযম দ্বারা তিনি গল্পে রস সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কেবল হাস্য কৌতুক নয়, অশ্রুর সাগরেও তিনি অবগাহন করেছেন। 'ফুলের মূল্য', 'মাতৃহীন', 'আদরিণী', 'কাশিবাসিনী' গল্পগুলো তার উদাহরণ। রবীন্দ্র সমকালে গল্পের আঙ্গিক-নিরীক্ষায় প্রভাতকুমার সচেতনতার স্বাক্ষর রেখেছেন। গল্পের আঙ্গিক-নির্মাণে তিনি পরিস্থিতি বা Situation এর বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রভাতকুমারের যে সব গল্প জনপ্রিয়তার শীর্ষে তা হল– 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'ফুলের মূল্য', 'খালাস', 'কুড়ানো মেয়ে', 'মাস্টার মশায়', 'বলবান জামাতা', 'রসময়ীর রসিকতা', 'আদরিণী', 'নিষিদ্ধ ফল', 'বি.এ পাশ কয়েদী', 'বিষবৃক্ষের ফল' ইত্যাদি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক একই ধারার লেখক ত্রৈলোক্যনাথ-পরশুরাম-

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দ্রনাথ-কেদারনাথ-সৈয়দ মুজতবা আলী। ছোটগল্পের জগতে এই শিল্পীরা হাস্য-কৌতুক-রঙ্গ-ব্যঙ্গের এক সরস ধারা নির্মাণ করেছেন।

ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) গল্প সংকলনের সংখ্যা চার– 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৭), 'মুক্তমালা' (১৯০১), 'মজার গল্প' (১৯০৪), 'ডমরুচরিত' (১৯২৩)। ত্রৈলোক্যনাথ মূলত বিদ্রূপ, শ্লেষ, রঙ্গ-ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে সামাজিক কল্যাণ সাধনার চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে তাঁর গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুক এবং স্যাটায়ারধর্মী গল্প লেখকদের মধ্যে বিশেষ আসনের অধিকারী পরশুরাম ওরফে রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)। তাঁর গল্পে একটা উদ্দেশ্য ছিল সমাজের অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধরে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা। তিনি পৌরাণিক উপাদান-উপাখ্যানকে উপজীব্য করে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পের সংখ্যা একশ। গ্রন্থের সংখ্যা নয়। গড্ডালিকা (১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৮), হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি (১৯৩৭), গল্পকল্প (১৯৫০), ধুস্তুধীমায়া ইত্যাদি গল্প (১৯৫২), কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প (১৯৫৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) একই হাস্য ও কৌতুক রসের লেখক। ইন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে সামাজিক ভণ্ডামি ও সামাজিক অসঙ্গতি ও বিপর্যয়ের মূলে আঘাত হেনেছেন। ঠিক একইভাবে কেদারনাথের গল্পেও দেখা যায় আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে সমাজে যে সব অসঙ্গতি ও বিপর্যয় তার বিরুদ্ধে তিনি শাণিত বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করেছেন। তবুও তাঁর গল্প জীবনরসে পরিপূর্ণ, যা হৃদয়কে করে কোমল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসমূহ হচ্ছে– 'আই হ্যাজ', 'ভুদুড়ি মশাই', 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি', 'আনন্দময়ী দর্শন' প্রভৃতি।

এই হাস্যরসের ধারার আর এক বিশিষ্ট শিল্পী সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)। তাঁর গল্পসমূহ হাস্যরসের ধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বস্তুত আড্ডা বা বৈঠকী মেজাজকেই কেন্দ্র করে মুজতবা আলীর গল্প সরস হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্ম এবং পরিশীলিত কৌতুকবোধ তাঁর ছোটগাল্পিক প্রতিভাকে করেছে উজ্জ্বল। এখানে সমালোচকের বাণী স্মরণীয় :

> সৈয়দ মুজতবা আলীও বয়োজ্যেষ্ঠতা সত্ত্বেও অনেক পরে সাহিত্যের আসরে এসেছেন এবং এসেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। রসিকতা; বাগ-বৈদগ্ধ্যে, পাণ্ডিত্যে এবং অদ্ভুত কল্পনায় তাঁর গল্প বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে, বলতে গেলে আধুনিক রম্যরচনার ধারাই খুলে দিয়েছেন তিনি।[২৯]

সমসাময়িক রবীন্দ্রানুপ্রেরিত ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে আছেন– সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Dhaka University Institutional Repository

(১৮৬৯-১৯২৯) তাঁর গল্প সংকলন 'মঞ্জুষা' (১৯০৩), 'চিত্ররেখা' (১৯০৬), 'কলঙ্ক' (১৯১২), 'চিত্রালী' (১৯১৯)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫) লেখা গল্প– শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল ছোটদের জন্য। এছাড়াও আছে– দেবী প্রতিমা, রাজকাহিনী, আলোর ফুলকি প্রভৃতি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯৩৮) গল্প সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পুষ্পপাত্র' (১৩১৭), 'পঞ্চদশী' (১৩৩৪), 'বনজ্যোৎস্না' (১৩৪৫)। মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮৮-১৯২৯) গল্প সংকলনের মধ্যে আছে– 'জাপানী ফানুস' (১৩১৫), 'ঝাঁপি' (১৩১৯)। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের (১৮৮৪-১৯৬৪) গল্প হচ্ছে– 'শেফালী', 'নির্ঝর', 'মৃণাল', 'পিয়াসী' ইত্যাদি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর (১৮৯০-১৯৬৬) গল্প সংকলন– 'বাজীকর' (১৩২৮)। এছাড়া আছে 'স্বর্গের চাবি'। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৮৮-১৯৬৩) গল্প সংকলন গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে– পসরা (১৯১৫), মালা-চন্দন (১৯২২) ইত্যাদি।

সমসাময়িক কালের শরৎ অনুব্রতী লেখকদের মধ্যে আছেন বিভূতিভূষণ ভট্ট। তাঁর গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– অকালের গল্প। এছাড়াও গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প– 'প্রত্যাবর্তন'। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৫৪) কিছুটা যেন কল্লোল যুগের পূর্বসাধ। তাঁর গল্প সংকলন প্রকাশ পায় নি। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৩-১৯৬০)-এর গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী'। প্রমথ চৌধুরী দ্বারা প্রভাবিত এক ঝাঁক লেখক বাংলা ছোটগল্পের ধারায় বুদ্ধি ও মননের এক শৈল্পিক দীপ্তি নিয়ে এলেন। তাঁদের নাম ও গল্প সংকলন– ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৬২) গল্প সংকলনের মধ্যে অন্যতম 'রিয়ালিস্ট' (১৯৩৩)। সতীশচন্দ্র ঘটকের (১৮৮৫-১৯৩২) দুইটি গল্প সংকলন 'সতীর জেদ' (১৯২৪) এবং 'দুই চিঠি' (১৯২৮)। কিরণশঙ্কর রায়ের (১৮৯১-১৯৪৯) ছোটগল্পে মেধাদীপ্ত সমাজচিন্তার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর প্রধান গল্পগ্রন্থ 'সপ্তপর্ণ' (১৯২৯)। সমালোচক হিসেবে খ্যাত বিশ্বপতি চৌধুরীর (১৮৯৫-১৯৭৮) প্রধান গল্পগ্রন্থের নাম 'ব্যথা' (১৯১৫), 'বহুরূপী' (১৯৩২), 'স্বপ্নশেষ' (১৯৩২) এবং 'সেতু' (১৯৩৪)। ছোটগল্পের জগতে মননধর্মের অনন্যতার আসনে আছেন বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-১৯৮৯)। তাঁর দুটি গল্প সংকলন হচ্ছে– 'পঞ্চমী' (১৯৩৭) এবং 'সেকেন্ডহ্যান্ড' (১৯৪৪)।
এসব লেখক কল্লোল-কালে অবস্থান করেও কল্লোল বলয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, 'গ্রন্থ পরিচয়' (১৪শ খণ্ড), পৃ: ৫৩৮-৩৯
২। প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৩১৮), পৃ: ৮
৩। মুহম্মদ মজির উদ্দীন : রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশচেতনা (ঢাকা, ১৯৭৮), পৃ: ২০
৪। আনোয়ার পাশা : রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা (ঢাকা, ১৩৭৫), পৃ: ১২৯
৫। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ: ৪৩
৬। আনোয়ারা পাশা : রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা পূর্বোক্ত, পৃ: ১২
৭। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৮
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠিপত্র, নবম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৭৭), পত্রসংখ্যা: ২১৪
৯। নীরদচন্দ্র চৌধুরী : বাঙালী জীবনে রমণী (কলকাতা, ১৯৮৮), পৃ: ১১৬-১৭
১০। ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ: ১২০
১১। পূর্বোক্ত, পৃ: ১২২
১২। আনোয়ার পাশা : পূর্বোক্ত, পৃ: ৪৮
১৩। ভূদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ১২০
১৪। পূর্বোক্ত, পৃ: ১২৭
১৫। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৯
১৬। সৈয়দ আকরম হোসেন : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, চেতনালোক ও শিল্পরূপ (ঢাকা, ১৩৮৮ / ১৯৮১), পৃ: ২৬২
১৭। ভূদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩২
১৮। ক্ষেত্র গুপ্ত : রবীন্দ্র গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ (কলকাতা, ১৯৮৪), পৃ: ২১৯
১৯। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৫
২০। অশ্রুকুমার শিকদার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস (কলকাতা, ১৯৮৮), পৃ: ২৩-২৪
২১। শরৎ রচনাসমগ্র : ২য় খণ্ড (কলকাতা ১৯৮৮), ভূমিকা, উবেশ রায়।
২২। শিশিরকুমার দাশ : বাংলা ছোটগল্প (১৯৮৩), পৃ: ১৭৮-৭৯
২৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃ: ১৫৪
২৪। ভূদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ২৫৯
২৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক) : প্রমথ চৌধুরীর গল্প সংকলন (কলকাতা, ১৯৪১), ভূমিকা।
২৬। একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৯ : বাংলা একাডেমী (ঢাকা, ১৯৯১) প্রবন্ধ : বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলা ছোটগল্পে রূপ-রূপান্তর, পৃ: ১১৩
২৭। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৮
২৮। উদ্ধৃতি—শিশিরকুমার দাশ : বাংলা ছোটগল্প (কলকাতা, ১৯৮৩), পৃ: ১৪৬
২৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প (কলকাতা, ১৩৬৩), পৃ: ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কল্লোলযুগ

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই সারা বিশ্বব্যাপি এক নবজাগরণ ও সমাজ সচেতনতার জোয়ার জাগে, তা বাংলা ছোটগল্পেও এসে লাগে। "বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত বাঙালির অবক্ষয়ের প্রবাহ আশ্রয় করে নূতন জীবন প্রতিক্রিয়ার যে রসদ সঞ্চিত হচ্ছিল দিনে দিনে তার দ্বিধাহীন স্পষ্ট উৎসার চোখে পড়ে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সাধনায়।"[১] সমসাময়িককালের তিনটি পত্রিকা 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'– এরা একই চিন্তা ধারায় বিকশিত হয়েছিল। এ সময়ের ছোটগল্পে নতুন ভাব ও রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। মূলত এ যুগের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্র মুক্ত যুগ হিসেবে। রবীন্দ্র প্রভাব থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে নিয়োজিত ঐ সময়ের অপেক্ষাকৃত তরুণ লেখকরা জোট বেঁধেছিলেন 'কল্লোল' (১৯২৩-১৯২৯), 'কালিকলম' (১৯২৬-১৯২৮), 'প্রগতি' (১৯২৭-১৯২৮) প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে প্রগতি প্রকাশিত হত ঢাকা থেকে।

> কল্লোল গোষ্ঠীর গল্প লেখকরা রবীন্দ্র-বিরোধিতার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন। যুগের অবিশ্বাস ও অস্থিরতা তাঁদের চঞ্চল করে তুলেছিল। সেদিনকার এই তরুণদের তিন প্রধান হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৭), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। এঁদের সঙ্গেই ছিলেন মনীশ ঘটক (১৯০১-১৯৮০), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৭-১৯৮৩), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫), দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৬৭), কিছু পরে ভবানী মুখোপাধ্যায়। কল্লোল মাসিক পত্র (১৯২৩-২৯) বন্ধ হয়ে গেলেও তার ঢেউ ছড়িয়ে যায় অনেক দূর পর্যন্ত। তবে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' (শ্রাবণ ১৩৩৭/১৯৩০) এসে কল্লোলের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস ও ফেনিলতাকে স্তিমিত করে দেয়।[২]

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই পৃথিবীতে নেমে আসে ভাঙ্গাগড়ার প্রচণ্ড আবহ। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান– সর্বক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রভাবে

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের মাঝে এক নতুন মূল্যবোধের সূচনা হয়। পুরনো জীবন দর্শন ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে পূর্বতন ধারণা ও প্রত্যয় বিপন্ন হয়ে যায়, ধসে পড়ে মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিস্তর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এ পরিস্থিতিকে করে তোলে অধিকতর জটিল। উত্তর-সামরিক কাল পর্বে ইয়োরোপে বেকারত্ব-মুদ্রাস্ফীতি-অবক্ষয় শূন্যতাবোধ ও অবিশ্বাস শিল্পী-সাহিত্যিকদের আক্রান্ত করে হতাশা ও বিচ্ছিন্নতার কর্কট রোগে। মানুষ চরম অনিশ্চয়তার মুখে পতিত হয় পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার চাপে। ইয়োরোপ-আফ্রিকা-এশিয়া জুড়ে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন মানুষের অস্তিত্বকে করে তোলে উন্মূল। সাহিত্যে এর প্রথম প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ইয়োরোপে। কিন্তু অচিরেই এর ঢেউ এসে লাগে বাংলা সাহিত্যে। বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়োরোপে, কিন্তু তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। সে সময়ের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সমাজনৈতিক পটভূমির চেহারা হল— বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১), রুশ বিপ্লব (১৯১৭), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সাম্যবাদ আন্দোলন (১৯১৯-২১), কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৮), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বহু রাজনৈতিক কর্মীর দণ্ড (১৯২৯), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩১), বাংলায় মার্কস-এর দর্শন ও লেনিন-এর রণকৌশলের চর্চা (১৯৩১-৩৫), ফ্রয়েডের যুগান্তকারী মনোবিকলন তত্ত্বের ইংরেজি অনুবাদের প্রচার (১৯১৩-১৪), তাঁর শিষ্য অ্যাডলার ওয়ুং এবং হ্যাভলক এলিস-এর প্রেমের দেহবাদী যৌনবাদী ব্যাখ্যা, বার্নাড শ ও ফেবিয়ানদের নব অর্থনৈতিক চিন্তা সেদিনকার বুদ্ধিজীবীদের উদ্বেজিত, উত্তেজিত ও উদভ্রান্ত করেছিল। এর প্রভাব পড়ে কল্লোল যুগের তরুণ লেখকদের উপর। যুদ্ধোত্তর সময়ে সামগ্রিক এই সমাজপটভূমিতে তরুণতর লেখকগোষ্ঠী নতুন পরিচয় নিয়ে আবির্ভূত হলেন বাংলা সাহিত্যে। যুদ্ধোত্তর পর্বে কল্লোল চেতনার মৌলিচারিত্র্য বুদ্ধদেব বসুর ব্যাখ্যায় ধরা পড়েছে এভাবে :

> "অতি আধুনিক সাহিত্যিকে post-war সাহিত্য বললে ভুল হয় না। আধুনিক লেখকেরা সকলেই post-war সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে এক হয়ে উঠেছেন। লড়াইয়ের ফলে ইয়োরোপের যে দুরবস্থা হয়েছে ও মানুষের চিন্তা -জগতে যতটা পরিবর্তন এসেছে, আমাদের দেশ তার চেয়ে অনেক কম হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ ও মনের ভাব-ধারার গতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আধুনিক লেখকরা শিশুকাল থেকে যে অর্থনৈতিক সংকটের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করেছেন; বঙ্কিম বাবুর সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা দেশমাতা বা রবীন্দ্রনাথের সোনার বাঙলায় তার চিহ্নমাত্র ছিল না।"[৩]

কল্লোল চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণদের প্রধান লক্ষ্য রবীন্দ্র বিরোধিতা করা। রবীন্দ্রনাথের সুস্থিত-প্রসন্ন ও মঙ্গলময় জীবন চেতনায় এরা বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন নি। সাহিত্য যেহেতু সময়সচেতন ও সমকাল শাসিত স্রষ্টার অভিজ্ঞতাস্নিগ্ধ জীবনের আগ্নেয় উদ্ভাসন, তাই স্বভাবতই তাঁরা রবীন্দ্রদর্শন ও জীবনবোধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরব ঘোষণা দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

অতিক্রম করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথকে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁদের রবীন্দ্রনাথকে যুগোপযোগী বলে মনে হল না। ছোটগল্প তথা কথাসাহিত্যে 'কল্লোল'-এর এই প্রবণতা সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষ্য এখানে স্মরণীয়– "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপরাজ ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাথে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।"[৪] এযুগের লেখকবৃন্দের "শিল্প চেতনার মূলে ছিল কোনো এক অজ্ঞাত বন্ধন থেকে অপরিচিত মুক্তি লাভের এক দুর্বার রোমান্টিক পিপাসা– যাকে তাঁরা প্রগতি বা আধুনিকতা নামে অভিহিত করেছিলেন।"[৫]

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত বাঙালির অবক্ষয়ের শিল্পরূপ নির্মাণের অগ্রদূতের ভূমিকায় দেখা যায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে (১৮৮২-১৯৬৪)। ফ্রয়েড ও এলিসের প্রভাব পড়েছে নরেশচন্দ্রের সাহিত্যে। সেখানে দেখা যায় নর-নারীর অবচেতন যৌনকামনা এবং তজ্জাত নানা অসঙ্গতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। বিবাহিতা নারীর স্বামীগৃহ ত্যাগ ও প্রণয়ীর নিকট আত্মসমর্পণ; প্রৌঢ়া নারীর পরপুরুষে গোপন আসক্তি; যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপাচারের চিত্র নির্মাণে তিনি প্রায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বশবর্তী হয়ে এক ধরনের আধুনিকতার প্রবর্তন করলেন বাংলা কথাসাহিত্যে।[৬] তাঁর বিখ্যাত "ঠান্‌দি" গল্পের ঠান্‌দি বিধবা হবার পূর্বেই পিসতুতো দেবরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়, এমন কি স্বামীর মৃত্যুর পরও দেবর শচীকান্তকে ঠান্‌দি বলেন এই কথা–

> "আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস। এমন কি, আমারও মনে হয়েছে যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি যেন তোমাকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভাল না বেসে, আমার সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা না করে পারি নি। তোমাকে দেখলে আমার লোভ হয়, তুমি আমার কাছে আর এসো না।"

নরেশচন্দ্রের প্রতিভায় সার্থক গল্প রচনার উপযোগী অন্তর্দৃষ্টির অভাব নেই– কেবল সুকল্পিত প্রকাশের অভাবে তা সংহত হতে পারে নি। সব মিলিয়ে তাঁর গল্পগুলো শিল্পমণ্ডিত হতে পারে নি। নিজের গল্প রচনার প্রকরণ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন– "আমার কোন গল্পই গ্রীক পুরাণের মিনার্ভার মত বর্মে-চর্মে পূর্ণাঙ্গ হয়ে আমার মনে আকারিত হয় না। একটা ছোট ঘটনা বা অবস্থার কথা আমার মাথায় এসে তা লতা-পল্লবিত হয়ে উঠে ক্রমে লেখবার যোগ্য আকার ধারণ করে। এই যে লতা পল্লব, তাও প্রায় মনে মনে ধ্যান করে জন্মায় না, জন্মায় বেশির ভাগ কলমের ডগায়। গোড়ার কথাটা মনের ভিতর আকারিত হলেই আমি কলম নিয়ে বসি, তারপর কলম চলতে চলতে কথা, চিত্র ও চরিত্র আমার মাথার চারপাশে ভিড় করে এসে কলমের মুখে আত্ম-প্রকাশ করে ফেলে।"[৭] নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গল্প সংকলন হচ্ছে– দ্বিতীয় পক্ষ (১৩২৬), অগ্নিসংস্কার (১৩২৭), গ্রামের কথা (১৩৩১)।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিচিত্র জটিল জীবন প্রবাহ এবং নৈতিক সামাজিক ভাঙ্গনের গল্প সৃজনে মনীন্দ্রলাল বসুর (১৮৯৭-১৯৮৬) ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তির বিনষ্টির পীড়া শিল্পী মনীন্দ্রলালের অন্তরকে গোপনে গোপনে ব্যথিত করেছে। গ্রন্থগত বিদ্যা এবং সুমার্জিত রুচির বৈদগ্ধ নিয়ে মনীন্দ্রলাল সেই গোপন ব্যথা মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। ১৩৫১ বাংলা সালে 'পরিকল্পনা' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার সূচিপত্রে গ্রন্থ পরিচয় দেয়া হয়েছে "সমস্যা ও সংকলনের কথা"। তাতে 'হলায়ুধের ডায়েরি' নামে একটি গল্পে হলায়ুদের দৃঢ় উদার প্রতিশ্রুতি, "ভাঙ্গনের দুর্দিনে জন্মেছি বলে দুঃখ নেই, নূতন যুগকে গড়ে তোলবার, নূতন কালের স্বর্ণদ্বার উদঘাটন করবার আনন্দ আমাদেরই।"[৮] এখানে হলায়ুদের মুখ দিয়ে মনীন্দ্রলাল তাঁর যুগ সঙ্কটের কথা বলেছেন। মনীন্দ্রলাল কল্লোল চেতনার পূর্বসূরি হলেও তাঁর গল্পের নারীরা শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের মত চিরন্তন বাঙালি সত্তায় উদ্ভাসিত। তারা একাধারে কল্যাণী আর মোহিনী। এখানেই মনীন্দ্রলাল পুরাপুরি বাস্তববাদী হতে পারেন নি।

> "দৃষ্টি ও প্রকরণের বিচারে মনীন্দ্রলালকে বৈঠক-বিলাসী অভিজাত গোষ্ঠীতে অপাংক্তেয় করে রাখবার উপায় নেই। বিশ শতকের অবধারিত মধ্যবিত্ত জীবন-বেদনা ও জীবন বাসনার প্রথম সার্থক গল্পকার কবি ইনি।"[৯]

এঁর গল্প সংকলনের মধ্যে রয়েছে– 'মায়াপুরী (১৯২৩), 'রক্তকমল ও সোনার হরিণ' (১৯২৪), 'কল্পলতা' (১৯৩৫), 'ঋতুপর্ণ' (১৯৩৭) ইত্যাদি।

যে কল্লোল তার বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করেছিল– "জীবন যেখানে বারে বারে সংহত হইতেছে সেইখানেই বাঁচিবার শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে। জীবনের সেই শক্তি পিঠ যৌবন ছাড়া আর কিছু নয়।"[১০] সেই কল্লোলের প্রাণপুরুষ প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১) আর তাঁর আমৃত্যু সহযোগী ছিলেন গোকুল নাগ (১৮৯৪-১৯২৫)। এই দুই বন্ধু সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার বলেছেন–

> "গোকুল আর দীনেশ– এই দুই বন্ধুর সাধনা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রেরক ছিল একথা কিছুতেই ভোলবার নয়। ... কালক্রমে অনেক লেখক ম্লান হয়ে পড়লেও তাঁরা কখনো ম্লান হবেন না।"[১১]

> "কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখক সেদিন যাঁরা এসেছিলেন, জন্ম এবং শিল্প ভাবনার বৈশিষ্ট্যেও এঁদের প্রতিষ্ঠা দীনেশরঞ্জন-গোকুলনাগের উত্তর ভূমিতে। অর্থাৎ দীনেশ-গোকুলের চেতনায় মধ্যবিত্ত অবক্ষয়ের অনুভব বেদনার রক্ত গোলাপ হয়ে ফুটেছিল।"[১২]

এঁদের গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে রোমান্টিক যৌবন চেতনা আর বিপ্লব বাসনা। উত্তর সাময়িক অবক্ষয়, হতাশা যৌবনরাগ আর পরিবর্তনের উদ্দামতায় মুখর এঁদের গল্প সাহিত্য। হতাশার প্রেক্ষাপটে লিখলেও দীনেশরঞ্জনের গল্পে শেষ পর্যন্ত উঠে আসে আশ্বাসের ব্যঞ্জনা, অবক্ষয়ের কলুষ বাসাতে তিনি ছড়িয়ে দেন স্বপ্ন সুরভির কল্যাণ

Dhaka University Institutional Repository

কমল। তাঁর গল্প সংকলন হচ্ছে– 'ঝড়ের দোলা', এটি ফোর আর্টস ক্লাব থেকে প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া 'মাটির নেশা' ও 'ভুঁইচাপা' নামে দুই সংকলন প্রকাশ পায় ১৩৩২ সালে।

গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) কল্লোল-এর প্রাণের সারথি। দীনেশরঞ্জন দাশের আমৃত্যু সহযোগী। যেন একবৃন্তে দুটি কুসুম। গোকুলচন্দ্রের পরিচয় প্রসঙ্গে দীনেশরঞ্জন বলেছেন–

> "ফুল নিয়ে এর বেসাতি, দুনিয়ার জানোয়ার নিয়ে এর বসবাস। হৃদয় তাই ফুলের মত কোমল, মনটি তেমনি সুন্দর; আর শীর্ণদেহেও পশুজগতের প্রাণপ্রাচুর্য। অথচ মনের মধ্যে মানব মনের অনন্ত জিজ্ঞাসা। তাছাড়া ইনি চিত্রশিল্পী। আর যে অশান্তির ঝড় মানুষকে আদিম অবস্থা থেকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, দর্শন-কাব্য-বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়ে, সেই অশান্তিই ওর মনে দোলা দিচ্ছে। ও বলে, যে তরুণের মনে ঝড়ের দোলা নেই, সে ত বুড়িয়ে গেছে, স্থবির ও স্থাবর। ওর অন্তরস্থ প্রভঞ্জন মূর্ত হয় ওর মুখে বাঁশের বাঁশিতে; হাতের তুলি ও রঙে।"[১৩]

গোকুল নাগের গল্পগুলো আলো আঁধারের রেখাচিত্রের মত ব্যঞ্জনাময়, যেন তুলিতে আঁকা স্কেচ। কোন গল্পের 'পরিপূর্ণ প্লট নেই, অথচ সেখান আছে জীবনের একটা অখণ্ড কামনা, বাসনা, অতৃপ্ত বেদনার নিটোল রূপ। গল্পগুলোতে প্রাণ আছে, দেহ নেই। গোকুলচন্দ্রের গল্প মূলত 'বিদ্রোহী' যৌবনের বাসনা আর ব্যর্থ যৌবনের বিভোক্ষ'। অতৃপ্ত যৌবনের নানা অসঙ্গতি ও অসন্তোষ; অবচেতন যৌন কামনা ও বাসনাবহ্নি শব্দ রূপ পেয়েছে গোকুলনাগের গল্পে, তাঁর গল্প সংকলন– 'রূপরেখা' (১৩২৯), 'মায়ামুকুল' (১৯২৭)। কল্লোলের দোলায় যাঁদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চারণ ঘটেছিল; সচেতন এ শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে জাগ্রত হয়েছে জীবন জিজ্ঞাসা। বাংলা ছোটগল্পের ধারায় যাঁরা কল্লোল চেতনার শিল্পী বলে আখ্যায়িত হয়েছেন এবং কল্লোল ধারায় যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁরা হলেন– অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) এবং বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)। এছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনীশ ঘটক (১৯০১-১৯৭৯), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ। এঁরা সকলেই আধুনিক শিল্পী দৃষ্টির অধিকারী, যুগের বিপন্নতাকে এঁরা পাশ কাটিয়ে যেতে চান নি। এঁরা সাধনা করেছেন নবীনতা এবং অনন্যতার। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায়– "ভাবতুম রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তাঁর পরে আর পথ নেই, সংকেত নেই। তিনিই সবকিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু 'কল্লোলে' এসে আস্তে আস্তে সে ভাব কেটে যেতে লাগল। বিদ্রোহের বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী।"[১৪] এই নতুন পৃথিবীতে, নতুন পথে এসে তাঁরা প্রথা আর শৃঙ্খলে

Dhaka University Institutional Repository

প্রবল আঘাত হানলেন, প্রেমের প্রান্তরে দেহ দিয়ে এঁরা নির্মাণ করলেন ভালবাসার শরীর। সাহিত্যে স্থান পেল বিদ্রোহ, দরিদ্র-নিম্নবিত্ত জীবনের প্রতি সহমর্মিতা, স্বপ্ন ও সংগ্রাম বাসনা, বাস্তবপ্রীতি, ব্যর্থ যৌবনের ক্ষোভ, কামনা, বাসনা। সাহিত্য সাধনা এঁদের কাছে হয়ে উঠেছে "উদ্ধৃত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।"[১৫] মধ্যবিত্ত জীবনের রোমান্টিক মনোবিলাস ও মনোবিকার এঁদের সাহিত্যে স্থান পেল নানা আঙ্গিকে।

কল্লোল চেতনার লেখক গোষ্ঠীর প্রধান তিন লেখকের মধ্যে একজন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৫)। "সামাজিক ভাঙ্গন আর অবক্ষয়ের পটভূমিতে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যে কল্লোল গোষ্ঠী, অচিন্ত্যকুমার তাঁদেরই অগ্রণী পদাতিক। উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, ভবঘুরে জীবন যাত্রা, মিথুনাসক্তি, স্থবির ও প্রতিষ্ঠিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, উগ্র যৌন চেতনা ও যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা, প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধের অস্বীকৃতি, আত্মবিস্তারী প্রেম চেতনা, আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তির অস্থিরতা, ব্যর্থতা, স্বপ্ন প্রবণতা : সবটা মিলিয়ে অচিন্ত্যকুমার।"[১৬] অচিন্ত্যকুমার জীবনকে দেখেছেন 'রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো' দৃষ্টি দিয়ে। অচিন্ত্যকুমারের প্রথম দিকের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের পদে পদে পরাজয়ের গ্লানি। পটভূমিতে রক্তাক্ত অস্ত সূর্য। পরম বেদনাকে রঙিন করে দেবার প্রয়াস। কঠোর বাস্তবে মিশেছে রোমান্টিকতার মোহ। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে তিনি নেমে এলেন রোমান্টিকতার জগৎ ছেড়ে বাস্তবতার কঠিন মৃত্তিকায়– শাহরিক মধ্যবিত্ত জীবন বলয় ভুলে গিয়ে তিনি এবার চাষা-ভুষা-হাড়ি-মুচি-ডোম-জেলে-মালো প্রভৃতি গরিব মানুষের জীবন সংগ্রাম চিত্রণে হলেন উৎসাহী। এ পর্বের গল্পেই তিনি সাফল্যের স্বর্ণ-শিখরে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্প সংগ্রহের মধ্যে টুটাফুটা (১৩৩৫), ইতি (১৩৩৮), অধিবাস (১৩৩৯), চাষা-ভুষা (১৩৫৪), একরাত্রি (১৩৬৮) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের গল্পে নতুন শিল্পী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীর নাটকীয় উন্মোচন, শব্দের ঝংকার, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সেই সঙ্গে গোপনীয়তার প্রতি ঔৎসুক্য তাঁর গল্পকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কল্লোল গোষ্ঠীর শিল্পী হলেও উপন্যাস ও গল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) কল্লোল বলয় থেকে ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। যুগ সংকটে বিপর্যস্ত মূল্যবোধের প্রতিবেশে বসে অবলোকন করেছেন– হতাশা, বেদনা, ব্যর্থতা, আর গল্পে সন্ধান করেছেন এই হতাশা বেদনা থেকে মুক্তির পথ। কল্লোল চেতনার মূল কুললক্ষণ প্রবল আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য বিস্ময়কর ভাবে মুক্ত। তিনি জীবনের অসঙ্গতি ভাবোচ্ছ্বাস ও রোমান্টিসিজমের মোহমুগ্ধতা বিস্তার করতে চান নি। তিনি চেয়েছেন অসঙ্গতির শরীরে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করতে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে স্থান পেয়েছে– অবহেলিত, অবজ্ঞাত নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন। নিম্নবিত্ত

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের চরম ব্যর্থতা ও দারিদ্র্যের চাপে নৈতিক আদর্শবোধ, সনাতন জীবন প্রত্যয় কিভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তা তাঁর গল্পে বিশেষভাবে শিল্পরূপ লাভ করেছে। "প্রেমেন্দ্র মিত্র কেবল ভাঙাচোরা মানুষের ইতিহাস উপাদানই সংগ্রহ করেন নি। সেই সঙ্গে গোটা মানুষকে পেতে চেয়েছেন; পেয়েছেন। তার পরিচায়ক 'সংসার সীমন্তা', 'সাগর সঙ্গম'।"[১৭] প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্প প্রসঙ্গে বলেছেন–

> "অনেক প্রেমের গল্পই এ পর্যন্ত পড়েছি কিন্তু হিলিওট্রোপ রঙের শাড়ি পরে রডোডেনড্রন গাছের তলায় অনুরাগের রঙীন খেলা খেলে; তাদের কথা যেন আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল। মনে হল রাঙা মাটির পাহাড়ী দেশে বিরাগী হয়ে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় বসে যারা বিরহের দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের বেদনা নেহাৎ জোলো। কিছু যাদের নেই– যারা কেউ নয়, তাদের শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের কোন গল্প কি হতে পারে না।"[১৮]

প্রেমেন্দ্র মিত্র দাম্পত্য জীবনে সঙ্কট, অবিশ্বাস, সন্দেহ, সংশয় কিভাবে জীবনকে জটিল থেকে জটিলতর করে তোলে তা নিয়েও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- বেনামী বন্দর (১৯৩০), পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩১) ধূলিধূসর (১৯৩৮), সপ্তপদী (১৯৫৩), নানা রঙে বোনা (১৯৬০), মৃত্তিকা (১৯৩৫), প্রতিশোধ (১৯৪১) প্রভৃতি। বাংলা গল্পসাহিত্যে কল্লোল ধারায় উত্তরাধিকারদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভাবালুতাহীন, অনাড়ম্বর অথচ দীপ্তিমান গল্পকার হিসেবে পরিচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবী জোড়া বিপন্নতার পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর বলিষ্ঠ আগমন। বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) ছোটগল্পে রচনারীতির বৈচিত্র্য আছে। তবে তাঁর ভালবাসার উপাদান ভালবাসা। জীবনের প্রতি মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা। ভালবাসার বিচিত্র রূপ তাঁর গল্পকে করেছে উদ্ভাসিত। বুদ্ধদেবের গল্পে অনেক সময় প্রাধান্য একটি ভাব– নস্টালজিয়া। মধুর স্মৃতি, মন কেমন করা স্মৃতি, ঈষৎ বেদনা–আনন্দময় স্মৃতি তাঁর গল্পলোক শান্তিকে সামান্য আন্দোলিত করেছে। মানুষের জীবনের রুক্ষ ধূলিধূসর বর্তমানই সব নয়। জীবনে নস্টালজিয়ারও একটা ভূমিকা থাকতে পারে তা বুদ্ধদেবের গল্পে বারবার দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসু মূলত ঢাকা এবং কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। বুদ্ধদেবের গল্পে আত্মজৈবনিক উপাদান বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। বুদ্ধদেবের গল্পের মানুষেরা এসেছে উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায় থেকে। বুদ্ধদেব আপন অভিজ্ঞতার কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন। গল্পে বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে তিনি অপরিচিত জগৎ বা পরিবেশের গুরুত্ব দেন নি। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়েই গল্প রচনা করেছেন। এর প্রমাণ তাঁর অধিকাংশ গল্পের নায়কই তরুণ কবি, কখনো বা কথা-সাহিত্যিক, কিংবা অধ্যাপক। বুদ্ধদেবের প্রথম দিকের গল্পে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমের প্রসন্নতা ও সার্থকতা। দ্বিতীয় পর্বে এসেছে বিচ্ছেদ আর ব্যর্থতা। নর-নারীর দেহ কামনাকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর গল্পে। অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষার মর্মদাহী যন্ত্রণা থেকেই তাঁর নায়ক-নায়িকারা নিপতিত হয়েছে তমসগুহায়। বুদ্ধদেবের প্রেমের গল্পগুলো তাঁর ছোট গাল্পিক প্রতিভার বিশিষ্টতার পরিচয়বাহী। বুদ্ধদেব প্রচুর গল্প লেখার পরেও নিজের সম্পর্কে বলেন– "খুব সম্ভব আমি স্বাভাবিক গল্প লেখক নই– আমার উদ্ভাবনী শক্তি দুর্বল; ঘটনার চাইতে বর্ণনার দিকে আমার ঝোঁক, নাটকীয়তার চাইতে স্বগতোক্তির দিকে, উত্তেজনার চাইতে মনস্তত্ত্বের দিকে।"[১৯] লেখকের সংকলিত গল্পগ্রন্থের মধ্যে– 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩০), 'এরা ওরা এবং আরো অনেকে' (১৯৩২), 'নতুন লেখা' (১৯৩৬), 'ফেরিওয়ালা ও অন্যান্য গল্প (১৯৪১), 'খাতার শেষ পাতা' (১৯৪৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কল্লোলের পাতায় গল্প নিয়ে একদিন আধুনিকতাবোধের উচ্ছ্বসিত উৎসাহকে উদ্দাম করে তুলেছিলেন– মনীশ ঘটক (১৯০১-১৯৭৯)। তিনি যুবনাশ্ব ছদ্মনামে লিখতেন। কল্লোল চেতনার শিল্পী হলেও পুরোপুরি কল্লোল বলয়ে আবদ্ধ থাকেন নি। গল্পে মূলত দারিদ্র্য ও যৌনতার ক্লেদাক্ত বিকৃতির এক অসহ্য অবিচ্ছিন্নতা রূপচিত্রণে তাঁর উৎসাহ অদম্য। অসঙ্গতি, বিকৃতি আর যৌনপঙ্কিলতার রূপচিত্রণে মনীশ ঘটক এক ক্লান্তিহীন শিল্পী। অসঙ্গতি, যৌনতার ক্লেদাক্ত বিকৃতির গল্প রূপচিত্রণে যুবনাশ্ব প্রায়ই বিস্মৃত হয়েছেন মানবিক মূল্যবোধ ও চেতনার কথা। মনীশ ঘটকের একমাত্র গল্প সংকলন 'পটলডাঙার পাঁচালী' (১৯৫৬)। "মনীশ ঘটক অনেক স্থলেই জীবনের অন্ধকার পাতালপুরীতে সূর্যোদয়ের স্মৃতিবাহী শিল্পী চেতনার প্রচ্ছন্ন অনুভব গল্পের দেহে মনে গ্লানিমুক্ত অবসন্ন এক গতিশক্তির দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন। এখানেই 'যুবনাশ্ব'র স্বার্থক পরিচয়– নামে এবং সৃষ্টির স্বকীয়তায়।"[২০]

প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৫-১৯৮৩) গল্পে আছে কল্লোলীয় যৌবনরাগ। যুদ্ধোত্তর অবক্ষয় সর্বগ্রাসী ভাঙ্গন প্রবোধকুমারকে করেছে ব্যথিত। ফলে তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে নষ্ট জীবনের আরাধনা। অসঙ্গতি, অবক্ষয়, দারিদ্র্য, অবদমিত যৌনাচার ইত্যাদি। যৌবনের ভবঘুরে জীবন তাঁর গল্পে নানা রঙে চিত্রিত হয়েছে। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনই তাঁর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রবোধকুমার নিজে স্বীকার করেছেন–

> "পথে-ঘাটে গল্প খুঁজে বেড়িয়েছি– স্টীমারঘাটে, চটকলের ধারে, রেলস্টেশনে, বিদেশের ধর্মশালায়, মফঃস্বলের ওয়েটিংরুমে, তীর্থপথের মেলায় ... আমি বড়লোক নিয়ে কিছু লিখতে পারতুম না। আমি লিখতুম মজুর, জেলে, রাজমিস্ত্রি, গাড়োয়ান, মুদি, ফড়ে এইসব চরিত্র নিয়ে। কারণ তাদের জীবন যাত্রাটা চোখে দেখতে পেতুম।"[২১]

Dhaka University Institutional Repository

প্রবোধকুমার সান্যালের গল্প সংকলন হচ্ছে– নিশিপদ্ম, দিবাচল, কয়েকটি ঘণ্টামাত্র, অবিকল, গল্প সঞ্চয়ন, সায়াহ্ন, অঙ্গার, মধুকরে, অঙ্গরাগ, পঞ্চতীর্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) কল্লোল সমকালীন শিল্পীদের মত পুরাতনের অবিশ্বাসই নয়, প্রাচীন বিশ্বাসের সমূলে আঘাত হানার এক দুর্দম স্পৃহা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমকালীন লেখকদের সাথে তাঁর লেখার পার্থক্য ছিল প্রচুর। আসলে তিনি ছিলেন অপরিণত যৌবনের দিশাহারা চঞ্চলতার সঙ্গে স্থিতধী প্রৌঢ়'র পার্থক্য। ফলে স্বভাবগত দূরত্বও ছিল ব্যাপক। সমাজ অসঙ্গতিজাত ব্যক্তি অসঙ্গতির শিল্প রূপ সৃষ্টিতে জগদীশ গুপ্ত অনন্য শিল্পী। "সুপ্ত মানবতার বীভৎস কদর্য অসঙ্গতির শিল্প রূপকার হলেও তাঁর রচনায় মানুষের জীবন সাধনা, মানবত্ব, সম্প্রদায় নিরপেক্ষ ঔদার্য ও সংগ্রাম স্পৃহা ইঙ্গিত নৈপুণ্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়। জগদীশ গুপ্ত মনুষ্যত্বহীনতার রূপদর্শী মাত্র, সুপ্ত মানবতার পূজারী নন, মানুষের মানবিক অভ্যুদয়ে তাঁর প্রশান্তি।"[২২] তাঁর গল্প সংকলন গ্রন্থের মধ্যে– 'বিনোদিনী' (১৩৩৪), 'রূপের বাহিরে' (১৩৩৬), 'শ্রীমতি' (১৩৩৭), 'উদয়লেখা' (১৩৩৯), 'তৃষিত সৃক্কনী' (১৩৩৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) কল্লোলের তীরে তরী ভিড়ালেও তিনি কল্লোল চেতনা থেকে স্বতন্ত্র। তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্পের আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃৎ। শৈলজানন্দ জীবনের পুঞ্জিত অন্ধকারের খোঁজে ঘুরে ফিরে মাটির তলার কালো গাঢ় অন্ধকার গহ্বরে পৌঁছেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম কয়লা কুঠির অনাদৃত কুলি মজুরদের সাহিত্যের পাতায় স্থান দিলেন। শৈলজানন্দ নিজেই বলেছেন "আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল কয়লা খনি এবং চরিত্রেরা সব কুলিমজুর।"[২৩] তিনি কল্লোলীয় দারিদ্র্যপ্রীতি, যৌবনরাগ বর্জন করে– সাঁওতাল অধিবাসী, কয়লা খনির কুলি মজুর ও ডোম নর নারীদের ভালবাসা, দ্বন্দ্ব সংগ্রাম যৌন প্রবৃত্তির জটিলতাকে চিত্রায়িত করেছেন তাঁর ছোটগল্পে। কয়লাখনি এবং সাঁওতালদের গ্রামীণ জীবন ছাড়াও কলকাতা শহরের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন নিয়েও বেশ কিছু সার্থক গল্প লিখেছেন। এর গল্প সংকলন গ্রন্থের মধ্য উল্লেখযোগ্য– অতসী (১৩৩২), নারীমেধ (১৩৩৫), দিনমজুর (১৩৩৯), স্বনির্বাচিত গল্প (১৩৬২), মিতেমিতিন (১৩৬৭)।

ছোটগল্পের জগতে এক অনন্যপূর্বতার স্বাদ নিয়ে এলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। নজরুল ইসলামের গল্পে আছে সেই কল্লোলীয় ধারার উদ্দাম যৌবনের রোমান্টিক বাসনা। তাঁর গল্পের শরীরে আছে আধুনিক জীবনের যৌন জটিলতা, স্বদেশী আদর্শবাদ, অশান্ত বিদ্রোহ, বস্তুভাবহীন গীতলতা, কল্পনার উচ্ছ্বাসের প্রকাশ। ফলে তাঁর গল্পে ধরেছে কবিতার রূপ– যে কবিতা কেবল কবির অন্তর্লীন ego-র আত্মসৃষ্টি। "নজরুলের কবিআত্মা জীবন এবং যৌবনকে কেবল সম্ভোগের ও উত্তেজনার সামগ্রীরূপে দেখে নি। বেদনা ও ব্যর্থতার পবিত্র অগ্নিতে সেই কামনাচঞ্চল জীবন যৌবনকে পরিশুদ্ধ করে নিতে চেয়েছিলেন প্রেমিক নজরুল। তাই সমস্ত অস্থিরতা,

Dhaka University Institutional Repository

আবেগের প্রচণ্ডতা, বিদ্রোহ-বাসনার শেষে তাঁর গল্পের নায়কের জীবন রিক্ত ব্যথাতুর নিষ্ফল ও নিঃসঙ্গ।"[২৪] তাঁর গল্প সংকলন– ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন।

'কল্লোল'-এর কালের বিশ্বাস, মতবাদ এবং বিশেষ ঝোঁক নিয়ে জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) ছোটগল্পের উপস্থাপন। জীবনানন্দের মত অন্তর্মুখী 'সুর রিয়ালিস্ট' কবি দৃষ্টির পক্ষে কাহিনী– আধুনিক জীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তব সমস্যাতুর কাহিনী– সাহিত্য রচনাও সম্ভব; এ ধারণা ছিল অকল্পনীয়। জীবনানন্দ নিঃসঙ্গ নিঃসমাজ অন্তর্বদ্ধ কবি ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অনুভবে সমাজের অস্তিত্ব ব্যক্তির অন্তঃসত্তা ঘিরে। আর সকল ব্যক্তিত্বের উৎসবিন্দু তো তাঁর আপন ব্যক্তি চেতনার সমীক্ষা ও প্রতীতি ঘিরেই। কলকাতায় বসবাস ফলে তাঁর চেতনায় এসেছে যুদ্ধোত্তর বাংলা; মন্বন্তর, যান্ত্রিক সভ্যতার যন্ত্রণা, পাশ্চাত্য দর্শন ইত্যাদি মিলে জীবনানন্দ হয়েছেন আধুনিক কথা সাহিত্যের এক সার্থক শিল্পী। অস্তিত্বের সংকট তাঁর কথা সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়। ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনে এই সংকট কতখানি তীব্র হতে পারে তা স্থান পেয়েছে তাঁর কথা সাহিত্যে। জীবনানন্দের গল্পের মধ্যে– ছায়ানট (১৯৩২), গ্রাম ও শহরের গল্প (১৯৩৬), বিলাস (১৯৪৭), বিবাহিত জীবন (১৯৩১), তাজের ছবি (১৯৩৩-এর দিকে) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কল্লোল সমসাময়িক কালে আবির্ভাব সত্ত্বেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়– এই ত্রয়ী সাহিত্য জগতে সৃষ্টি করেছেন এক অনন্য ধারা। তাঁরা তিনজনই ছোটগল্পের জগতে কৃতী শিল্পী। বাংলা সাহিত্যে এঁদের আগমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের ভাঙ্গনের পটভূমিতে। সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭২) আসন খ্যাতির শীর্ষে। আত্মসমর্থন করে ড. সেন বলেছেন– "শৈলজানন্দ কয়লা কুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন– পুরানো জমিদার ঘর হইতে মালবেদে পাড়া পর্যন্ত।"[২৫] বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্রের প্রতি মমত্ববোধ, রচনা শৈলীর সৌকর্য– সব মিলিয়েই তারাশঙ্কর বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ যেমন এসেছে তারাশঙ্করের গল্পে, সেই সঙ্গে এসেছে সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদিও। তারাশঙ্করের গল্পগ্রন্থের মধ্যে– পাষাণপুরী (১৯৩৩), বেদেনী (১৯৪৩), হারানো সুর (১৯৪৫), মাটি (১৯৫০) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া– 'তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠগল্প', 'প্রিয় গল্প' (১৯৫৩), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৫৪) অত্যন্ত পাঠক প্রিয়। মাটি, মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর– তিন মিলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) সাহিত্য জগত গড়ে উঠেছে। তিনি ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারার বাইরে অবস্থান নিয়েছেন। প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে মানবীয় প্রেম তথা নারী স্নেহের রোমান্টিক ও মনোহর

Dhaka University Institutional Repository

রূপানুসন্ধানই বিভূতিভূষণের গল্পের বিষয়বস্তু। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে যখন যুদ্ধোত্তর হতাশা-বিভ্রান্তি ও সংশয়-জিজ্ঞাসায় কল্লোলিত, তখন বিভূতিভূষণ সেখানে নিয়ে এলেন জীবন সম্পর্কে সুগভীর বিশ্বাস ও অখণ্ডতার নিগূঢ় উপলব্ধি। অখণ্ড জীবনদৃষ্টি, অধ্যাত্মবিশ্বাস এবং বিশ্বাসবোধের উপলব্ধি তাঁর ছিল বলেই নিজেকে তিনি মুক্ত রাখতে পেরেছেন যুগধর্মের ভাব উন্মাদনা, যৌবনবিলাস ও নির্বেদের অবক্ষয় আবর্ত থেকে।[২৬] বিভূতিভূষণ সামগ্রীক জীবনের শিল্পী, তার পরিচয় মেলে তাঁর ছোটগল্পে। তাঁর গল্পে বিষয়বৈচিত্র্য ও রূপ বৈচিত্র্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি কেবল প্রকৃতি মুগ্ধতার পরিচায়ক আবেগধর্মী গল্প লিখতেন, একথা মনে করা ভুল। বিভূতিভূষণের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা ২৯টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– মেঘমল্লার (১৯৩১), মৌরীফুল (১৯৩২), কিন্নরদল (১৯৩৮), জ্যোতিরিঙ্গন (১৯৪৮), কুশল পাহাড়ী (১৯৫০)। প্রচলিত ধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে এলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তর কালে কল্লোলীয় উচ্ছ্বাস থেকে যাঁদের সাধনা বাংলা সাহিত্যে ফিরে পেয়েছিল নিরুচ্ছ্বাস সংহতি ও সুসঞ্জস পরিণতি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম।[২৭] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গিই তাঁকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। কোন সংস্কার নয়, বৈজ্ঞানিক জীবনানুসন্ধানই তাঁর গল্পের মূল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প দৃষ্টিতে বামাভিমুখিতা মৌলিক; সেখানে আদর্শ বিজ্ঞানীর মত তিনি তথ্যনিষ্ঠ, তীব্র-বিচ্ছুরিত বিশ্লেষণী দৃষ্টির ছুরিকাঘাতে জীবনের ক্লেদ-গ্লানি-নিষ্ঠুরতার অন্তরালবর্তী সত্যরূপটিকে টুকরো টুকরো করে খুঁজে দেখেছেন। কোন উল্লাস, কোন উচ্ছ্বাস, কোন বিহ্বল পক্ষপাত তাঁর কঠিন সন্ধিৎসাকে বিন্দুমাত্র কম্পিত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে নি। বীভৎস আদিম প্রবৃত্তি এবং ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের গল্পরূপ নির্মাণেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধি শীর্ষবিন্দুস্পর্শী এবং অনতিক্রান্ত। গ্রন্থন নৈপুণ্য, ঘটনাংশের একমুখিতা, সাবলীল ভাষা এবং নাট্যিক গতিশীলতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট গল্পের অন্যতম সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংকলনগুলোর মধ্যে অন্যতম– অতসী মামী (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), আজ-কাল-পরশুর গল্প (১৯৪৬), লাজুক লতা (১৯৫৪) প্রভৃতি।

যুদ্ধোত্তর অসঙ্গতির পটে সাহিত্যচর্চা করলেও এঁরা 'কল্লোল'-এর কোলাহল-ভাবোচ্ছ্বাস-যৌবন রাগে আকৃষ্ট হলেন। এবং তাঁদের অন্বিষ্ট হলো হাসি-কান্না-আনন্দ-বেদনামিশ্রিত মানব জীবনের সদর্থক প্রান্ত।[২৮] ছোটগল্পের ঋদ্ধিরেখা বিনির্মাণে এ ধারায় যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন– বনফুল যাঁর প্রকৃতনাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), মনোজ বসু

Dhaka University Institutional Repository

(১৯০১-১৯৮৭), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০১-২০০২), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫-১৯৮১), রবীন্দ্রনাথ মৈত্রী (১৮৭৬-১৯৩৫), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-) প্রমুখ। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) ছোটগল্পের শিল্পী। ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে শব ব্যবচ্ছেদের যে ছুরি রয়েছে; তাঁর নির্মম নিপুণ ব্যবহার হয়েছে ছোটগল্পে মানবজীবনের বিশ্লেষণে। পরিচিত সংসারের পরিচিত মানুষের হীনতা-নীচতা-মহত্ত্ব-ঔদার্য তাঁর বিশ্লেষণের সূচি মুখে ধরা পড়ে অতি প্রাকৃত রস সৃষ্টিতে। মানুষের হীনতা-নীচতার নির্মম বিশ্লেষণে, বিজ্ঞানদৃষ্টির সার্থক প্রয়োগে, দূর প্রসারী সদা অতৃপ্ত কৌতূহলের ব্যাপক ব্যবহারে তাঁর ছোটগল্পগুলো হীরের টুকরোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ছোটগল্পে তার রূপসাধনাই বনফুলের জীবনসাধনা। "গল্প আকারে কত ছোট ও হালকা হয়ে জীবনের কত বৃহৎ ও গভীর সত্যকে প্রকাশ করতে পারে তা বোধ করি বনফুলের কথা শিল্পে রয়েছে। কত কম বলে কত বেশী বলতে পারা যায়– এ পরীক্ষায় তাঁর জুড়ি নেই।"[২৯] বনফুলের গল্প সংকলনের মধ্যে রয়েছে– ঊর্মিমালা (১৩৬২ মাঘ), অনুগামিনী (১৩৬৪ মাঘ), বনফুলের গল্প (১৯৩৬), বনফুলের আরোও গল্প (১৯৩৮), তন্বী (১৯৫২), নবমঞ্জরী (১৯৫৪) প্রভৃতি।

তথ্যনির্দেশ :

১। শ্রীভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ: ৩১১

২। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ: ১৭৯-১৮০

৩। বুদ্ধদেব বসু : 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৯৮২), পৃ: ৫৬২-৮৩

৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ (কলকাতা, ১৩৯৫), পৃ: ৪৭

৫। শ্রীভূদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭৫

৬। জীবেন্দ্র সিংহরায় : কল্লোলের কাল (কলকাতা, ১৯৮৭), পৃ: ১৩০

৭। শ্রীভূদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১৫-১৬

৮। পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১৭

৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২২

১০। জীবেন্দ্র সিংহরায় : পূর্বোক্ত, পৃ: ২০

১১। পূর্বোক্ত, পৃ: ৬০

১২। শ্রীভূদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২৩

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ: ৩২৫

১৪। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৪

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭

১৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত, পৃ: ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ: ১৯৪

১৮। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, (কলকাতা, ১৯৮৬), পৃ: ২৯৪

১৯। শ্রীভূদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৫৪

২০। পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭৯

২১। জ্যোতিপ্রসাদ বসু (সম্পাদক) : গল্প লেখার গল্প (কলকাতা, ১৩৫০), পৃ: ৮২

২২। ভীষ্মদেব চৌধুরী : জগদীশ গুপ্তের গল্প : পঙ্ক ও পঙ্কজ (ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ: ৬১

২৩। জ্যোতিপ্রসাদ বসু (সম্পাদক) : পূর্বোক্ত, পৃ: ৭০

২৪। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ২৩৭

২৫। শ্রীভূদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ৪১১

২৬। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ: ১৭

২৭। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১৫

২৮। একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৯ : বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৯৯৯), প্রবন্ধ : বিশ্বজিৎ ঘোষ : বাংলা ছোটগল্প রূপ-রূপান্তর, পৃ: ১৩০

২৯। বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প : জগদীশ ভট্টাচার্য (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ: ১৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বনফুলের ছোটগল্প ও অন্যান্য সাহিত্য : আখ্যান ও আলেখ্য

সাহিত্যস্রষ্টা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), যাঁর সাহিত্যিক নাম বনফুল, তাঁর সৌরভে সুরভিত করেছেন বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি আঙ্গিনা। তিনি বাংলা সাহিত্যাকাশে এক বিস্ময়কর প্রতিভা আর অনপনেয় রহস্য। সার্থক ছোটগাল্পিক হিসেবে বনফুলের স্থান শীর্ষে। তবুও তাঁর সাহিত্যকর্ম আলোকিত করেছে বাংলা সাহিত্যের চার ধারাকে– কাব্য, নাট্য, উপন্যাস ও ছোটগল্প। স্রষ্টা হিসেবে তাঁর সৃষ্টিকর্ম যেমন অক্লান্ত, তেমনি জীবনজিজ্ঞাসাও সীমাহীন। কাহিনীবিন্যাসে, বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্যে তিনি অনন্য এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম চির অমলিন। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নির্মাণ কাঠামোর অভিনবত্বে তিনি বিশেষভাবে আলোচিত। শুধু ছোটগল্প কেন– উপন্যাস, নাটক ও কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর নব নব রীতি ও রূপনির্মাণে তুলনা নেই। বনফুলের জন্মদিনে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মানপত্র রচনা করেছিলেন– তা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

> "হে বনফুল, সৃষ্টির প্রারম্ভে সকল ফুলই তো ছিল বনফুল! গুণগৌরব প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ দেব সেবার জন্য তাহাকে স্থান দিয়াছে, নাম দিয়াছে। বঙ্গভারতীর পূজামন্দিরে অজানা অচেনা, স্বর্গীয় সুষমা ও সৌরভমণ্ডিত ফুলের সন্ধান পাইয়া বাঙালী আজ আকুল হইয়া উঠিয়াছে, সে তাহাকে পূজামন্দিরে স্থান দিতে চায়, নাম দিতে চায়। সে নাম অক্ষয় হউক, সে স্থান অক্ষয় হউক। ব্যঙ্গে, শ্লেষে, তীব্রতায় সে গন্ধ মোহগ্রস্তকে আত্মস্থ করে; রঙ্গে, রসে, অমৃত স্বাদে আত্মস্থকেও আত্মহারা করে; প্রেমে, মাধুর্যে, সুষমায় মানুষের মন-কোরক গোলাপের মত ফুটিয়া উঠে। অজানার সন্ধানে সে ফুল বাংলার কালো দীঘির শতদলের মত সূর্যের দিকে চাহিয়া থাকে। অর্জুন যেমন কুবেরের ভাণ্ডার জয় করিয়া স্বর্ণচম্পকে জননীর উপাস্য দেবতার মন্দির পূর্ণ করিয়াছিলেন, তুমি তেমনই বনফুল দিয়া বঙ্গভারতীয় মন্দির পূর্ণ করিয়া তুলিতেছ।"[১]

বনফুল সত্যিই তাঁর সাহিত্য কর্ম দিয়ে বঙ্গভারতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারকে করেছেন পরিপূর্ণ। জীবনের গবেষণাগারে যে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের অন্ত সীমাহীন, তেমনি সাহিত্যের রূপকর্মশালায় বাণীলক্ষ্মীর নিত্য নতুন রত্নাভরণ রচনাতেও বনফুলের উৎসাহ উদ্দীপনার

Dhaka University Institutional Repository

শেষ নেই। শুধু তাঁর উপন্যাসের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখা যায়– নানা বৈচিত্র্যে রূপে রসে গন্ধে ছোট-বড়-মাঝারি নানা ধরনের ষাটটি উপন্যাস রচনা করেছেন। উৎকর্ষের বিচারে সবগুলোই যে সমান আসন পাবে এমন কোন কথা নেই; কিন্তু একটি বিষয় চক্ষুষ্মান পাঠকমাত্রকেই বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে রচিত।[২] বনফুলের সাহিত্য শিল্পরীতি, রচনাশৈলী ও রূপকর্মের দিক দিয়ে নানা বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যময়। প্রতিটি উপন্যাসেই আলাদা আলাদা ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি যুগান্তকারী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসসমূহ– তৃণখণ্ড, বৈতরণীর তীরে, কিছুক্ষণ, মৃগয়া, দ্বৈরথ, নির্মোক, রাত্রি, সে ও আমি, মানদণ্ড, সপ্তর্ষি, হাটে-বাজারে, নঞ্তৎপুরুষ, অগ্নি, স্বপ্নসম্ভব, জঙ্গম এবং তাঁর পক্ষী-পর্যবেক্ষণের নেশার পরিপ্রেক্ষিতে লিখলেন 'ডানা' শীর্ষক উপন্যাস।

বনফুলের প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড'-এর প্রকাশকাল ১৯৩৬। এখানে তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ দেখা কিছু অসহায় মানুষের বেদনার ছবি তুলে ধরেছেন। জীবন চলার পথে কিছু অসৎ অস্বাভাবিকের পাশাপাশি সুন্দর ও নির্মম জীবনের চিত্র চোখে পড়ে, বনফুল তাঁর বিজ্ঞানী চোখে সে সব চিত্র ধারণ করে কবির কোমল কলমে প্রকাশ করেছেন। এ উপন্যাস ভাগলপুর ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ নিয়ে গঠিত। তৃণখণ্ডে ভীড় করেছে মোতিহারীর বিহারী ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে চাকর ভজুয়া, কারুগোয়ানা, তেজস্বী ক্ষত্রিয়, রামবরণ সিং, বেশ্যা আসমানী, যক্ষ্মা রোগী মিত্র, গনোরিয়ায় আক্রান্ত পাঁচুগোপাল বসাক, ইনসিওরেন্স কোম্পানির কেরানি হরিশবাবু– এরা সবাই বনফুলের চারপাশে দেখা পরিচিত জন। এখানে শুধু চরিত্রই নয়, তাদেরকে ঘিরে ভাগলপুর ও বিহারের লোকজীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। 'তৃণখণ্ড' উপন্যাসটি পড়ে মোহিতলাল মন্তব্য করেছেন–

> "তৃণখণ্ড পড়িলাম এক নিঃশ্বাসে। পড়িবার সময়ে শীঘ্র শেষ না হয় এই ইচ্ছাই প্রবল হইয়াছে। গল্পগুলোর মধ্যে লেখকের 'আত্মচরিত' বা আত্মপরিচয় যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই বইখানি এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রত্যেক বাস্তব বহির্জীবনের সঙ্গে লেখকের একজন অতিশয় আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বশালী– Cultured soul-এর যে সংঘর্ষ, তাহাই এই বইখানির আসল কথাবস্তু।"[৩]

উপখ্যানটি না পড়লে বোঝা যায় না যে কি অসাধারণ শক্তি দিয়ে বনফুল তৃণখণ্ড তৈরি করেছেন। আমাদের চারপাশের সাধারণ মানুষ কেমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে তা বনফুলের সাহিত্যকর্মে ধরা পড়েছে। বনফুলের শিল্পীসত্তাকে বিশ্লেষণ বা পর্যবেক্ষণ করলে বিশেষভাবে চোখে পড়ে দুটি আপাত বিপরীত প্রবণতা–

১। বিজ্ঞাননিষ্ঠ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সমাজের মানব হৃদয় তথা মানব জীবনের বাস্তবতার অন্বেষণ এবং

Dhaka University Institutional Repository

২। এক কল্পমায়ার জগৎ নির্মাণের জন্য তাঁর কাল্পিক কবিসত্তার গূঢ় আকাঙ্ক্ষা। যদিও প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ডে' এর পরিচয় পরিপূর্ণভাবে মেলে না, তবু সেখানেই বনফুলের এ শিল্পসত্তার আভাস পাওয়া যায়। তবে এর পরের উপন্যাস 'বৈতরণী তীরে' (১৯৩৭) এসে আমরা কল্পনা ও বাস্তবের মিল দেখতে পাই। এছাড়া 'সে ও আমি' (১৯৪৪) উপন্যাসটিতেও আমরা অনুরূপ বাস্তব ও কল্পনার সমন্বয় দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণীয়–

> " 'আমি' নিতান্তই এক বাস্তব চরিত্র, আর 'সে' কথকেরই অন্তর্লোকের অবচেতনার এক বাস্তব প্রক্ষেপণ বা 'প্রোজেক্শন' এক বিচিত্র মানবায়িত মূর্তিরূপ। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক অর্থে বাস্তব উপাদানে গড়া হলেও এই 'মানবী', 'আমি'র চোখে একান্তই দুর্নিবার মোহ জাগানো এক রহস্যময়ী নারী, 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' যাকে রচনা করতে চেয়েছে কথক। 'আমি' যার সম্পর্কে তার মনে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতার 'পূর্ব জনমের ... প্রিয়ার কথা'। অর্থাৎ বিস্ময় মুগ্ধতার সঙ্গে সৌন্দর্যে নন্দন চেতনার মিশ্রণে সে রোমান্টিক কল্পনার আবির্ভাব, সেই কল্পনার আলো-ছায়া ভরা ইন্দ্রজাল আবরণে আবৃত হয়ে আছে 'সে' সম্পর্কে 'আমি' চরিত্রের দৃষ্টি। মনস্তাত্ত্বিক বাস্তব সত্তা ও মানস কল্পনার এ এক বিচিত্র সমাহার।"[৪]

'আমি'র জীবন চেতনায় কল্পনা ও বাস্তবের দুটি চিত্রের সমন্বয় ঘটে। কল্পনা প্রবণতা– 'ইম্যাজিনেশন' বা 'ইলিউশনে'র প্রতি বনফুলের যত গূঢ় মোহই থাক না কেন তিনি বাস্তব জীবন অনুসন্ধানী ঋদ্ধ ঔপন্যাসিক। এ জন্যই দেখা যায় শেষ পর্যন্ত কল্পনার মোহজাল ভেদ করে তিনি বাস্তবে ফিরে এসেছেন। 'সে' ও 'আমি'র সমাপ্তিতে কথকের অবচেতন সত্তা 'সে' তাকে (কথককে) বলেছে, বিবাহিতা মালতীকে পাওয়ার আশা বিসর্জন দিয়ে শান্ত স্বভাবের নিতান্ত ঘরোয়া মেয়ে মিনতিকে বিয়ে করে। নিছক কল্পনার জগৎ ছেড়ে বাস্তবের কঠিন মাটিতে নেমে আসতে এবং সামাজিক জীবনের দায়-দায়িত্ব বহন করতে। 'সে' বলেছে– 'মালতী আপনার কাব্যের নায়িকা হতে পারে কিন্তু মিনতি হবে আপনার গৃহশ্রী।' এভাবেই শেষ পর্যন্ত সে বাস্তবে ফিরে এসেছে। বনফুলের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী রচনা 'জঙ্গম'। আকারে সুবৃহৎ, পাঁচটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। সমকালের পটভূমিতে এ উপন্যাস গঠিত। জঙ্গম সম্পর্কে অলোক রায় লিখেছেন–

> " 'জঙ্গম' এপিক নভেল না হলেও তার মধ্যে কাহিনীর বিস্তার আছে, বহু বিচিত্র নর-নারীর উপস্থাপনা আছে, দেশকালের প্রভাব আছে। 'জঙ্গম' সম্ভাবনাময় উপন্যাস। কিন্তু তার সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে বক্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাবে। লেখকের তথাকথিত বিজ্ঞানীদৃষ্টি মানুষের বিকৃতিই দেখেছে, আর তার ফলে এসেছে চরিত্রে অতিকৃতি, যা কখনও উপভোগ্য; কিন্তু সর্বদা নয়। ব্যঙ্গ-উপন্যাস বলে যদি কোনো শ্রেণীরূপ কল্পনা করি তাহলে সেখানে 'জঙ্গম' অত্যুচ্চ স্থানের অধিকারী। কিন্তু বনফুল তো ব্যঙ্গ-উপন্যাস লিখতে চান নি।"[৫]

Dhaka University Institutional Repository

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বনফুলের জঙ্গমের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদটির কথা উল্লেখ্য–

> "শেক্সপিয়ার, দান্তে, টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি .... মহিমান্বিত মূর্তিগুলি চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিতেছিল ... বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ... এই দেশের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কল্পনা বিহঙ্গম মৃত্তিকা ছাড়িয়া বহু উর্ধ্বলোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল।"

কল্পনা ও বাস্তবের দুই আপাত বিরোধী প্রবণাতে যুক্তবেণী করতে চেয়েছেন বনফুল। এখানেই তাঁর শিল্পসত্তার স্বাতন্ত্র্য। শুধু উপন্যাস কেন তাঁর সাহিত্যকর্মের সর্বত্রই এ দুয়ের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

এবারে তাঁর নাটকের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। বনফুলের বয়স যখন চল্লিশের গণ্ডী পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের দিকে ধাবিত হয়েছে, সাথে সাথে তাঁর সাহিত্যের সার্থকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি তখন নাটক রচনায় উৎসাহিত হলেন। 'মন্ত্রমুগ্ধ' (১৯৩৮) প্রহসনের মধ্যে দিয়ে নাট্যজগতে পদার্পণ। এটি একটি হাস্যরসাত্মক প্রহসন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মন্ত্রমুগ্ধ' পড়ে স্বীকার করলেন বনফুলের লেখনী পরিহাসের পথে লাফ দিয়ে ছোটে। তিনি বনফুলকে চিঠি লিখলেন–

> "তোমার 'মন্ত্রমুগ্ধ' ঠিক লাইন ধরে চলেছে, derailed হবার আশঙ্কা নেই। যে পাড়ায় ওর টার্মিনাস সে হচ্ছে হতভাগাদের পাড়া!– ভাষায় ভঙ্গীতে ব্যবহারে তাদের ঠিক পরিচয়টি পাওয়া যায়। অতিকৃতি আছে– ব্যঙ্গীকরণ অর্থাৎ ক্যারিকেচুরের দ্বারা বিকৃতিকে স্পষ্ট করার জন্যই তার দরকার। তোমার এ বইয়ের সঙ্গে আমার মুক্তির উপায়ের তুলনা করলে তফাৎ বোঝা যাবে– হয়তো মাঝে মাঝে হাসিয়ে থাকবো, কিন্তু চরিত্রগুলো সাজে ভাষায় তাদের বসতির ছাপ নিয়ে আসে নি। অর্থাৎ আমি যে ওদের সম্পূর্ণ চিনি তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। সাহিত্যে তুচ্ছতাই গৌরব পায় যখন সে সুনিশ্চিত হয়।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' প্রহসনটিকে তিনি নাট্যরূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মুক্তির উপায় থেকে বনফুলের 'মন্ত্রমুগ্ধ' অধিকতর সার্থক। তাঁর 'মন্ত্রমুগ্ধ' নাটকের পরিহাস পাত্রপাত্রীর অসংলগ্ন আচরণ, আলাপ-চারিতা, সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ এবং ঝানু মল্লিকের উদ্ভূত উদ্ভট উদ্ভাবনী শক্তিতে এটি হাসির খোরাক। বনফুল অনেকগুলো নাটক রচনা করেছেন। যেমন– 'মন্ত্রমুগ্ধ', 'রূপান্তর', 'শ্রীমধুসূদন', 'বিদ্যাসাগর', 'কঞ্চি', 'সিনেমার গল্প', 'আসন্ন', 'বাঁশি' ইত্যাদি। বাংলা নাটকে বনফুল সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন জীবনী নাটকে। 'শ্রীমধুসূধন' ও 'বিদ্যাসাগর' এ দুটি জীবনী নাটকের মধ্যে 'শ্রীমধুসূদন' বেশি প্রশংসনীয়। এ নাটকটি বনফুলের সব নাটকের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। 'শ্রীমধুসূধন' ছাড়া বনফুলের নাট্যকার হিসেবে যা কিছু প্রসিদ্ধি, তার সবই

Dhaka University Institutional Repository

তার একাঙ্ক নাটকগুলোকে ঘিরে।[৭] পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে 'শ্রীমধুসূদন'ই তার একমাত্র সফল নাটক। এ নাটক সম্পর্কে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন– "তোমার মধুসূদন আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছে। মধু, মধুর বাপ মা, হেনরিয়েটা, বিদ্যাসাগর চমৎকার। যেমন ভয় ছিল তেমনি খুশী হয়েছি, Finish ও admirable হয়েছে। তুমি একটা নতুন পথ খুলে দিয়েছ।"[৮] বনফুলের 'শ্রীমধুসূদন' নাটকের মধ্যে দিয়ে বাঙালা নাট্যাঙ্গনে জীবনী নাটকের সূচনা।

বনফুলের ৯টি পূর্ণাঙ্গ এবং ৩১টি একাঙ্কের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি কিছু গল্প ও উপন্যাসকে ফিল্মের জন্য চিত্রনাট্য রূপ দিয়েছিলেন। একে অবশ্য নাটক বলা যায়। 'সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত নাট্য শাখায়ও বনফুলের কৃতিত্ব অদ্ভুত কল্পনাশক্তিতে, অতি অল্প আয়াসে চমৎকার জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টিতে, অভাবনীয় সংলাপ চাতুর্যে এবং আপাতলঘু ঘটনার অন্তরালে গভীর দেশাত্মবোধ ও জীবন ঔৎসুক্যে। ব্যাপক মঞ্চায়নের অভাবে বনফুলের নাটকের জনপ্রিয়তা সম্ভব না হলেও একদিন নাট্যরসিকেরা বনফুলের নাটকে নাট্যরসের বৈচিত্র্যকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন।'[৯] বনফুলের নাটকেও আমরা কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করি।

বনফুলের বিশাল সাহিত্যকর্মের বেশির ভাগই জুড়ে আছে কথাসাহিত্য। তবু কবিতার মধ্যে দিয়ে তাঁর সাহিত্য জগতে আবির্ভাব। কথা সাহিত্যের গৌরবদীপ্তির আড়ালে তাঁর কাব্য প্রতিভা ম্লান হলেও কাব্য জগতে বনফুলের কবিতা আপন স্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিমান। তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে কবিতা লিখে গেছেন। বনফুল ছদ্মনামে তিনি প্রথম কবিতাই লিখেছিলেন। তরুণ বয়সে এই কবিতাই তাঁকে কবি রূপে পরিচিতি দিয়েছিল। এরপর তাঁর আটটি কবিতার বই প্রকাশ পায়। বইগুলো হচ্ছে– বনফুলের কবিতা, অঙ্গারপর্ণী, চতুদর্শী, আহরণীয়, করকমলেষু, নতুন বাঁকে, ব্যঙ্গকবিতা, সুরসপ্তক। বনফুলের কবিতা প্রথম ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় ছাপা হয়। তখন অবশ্য বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় নামেই লিখেছিলেন। কিন্তু স্কুলের পণ্ডিত কবিতা লেখায় ক্ষুব্ধ হলেন– কারণ, এতে তাঁর লেখাপড়ার ক্ষতি হবে। একারণেই তিনি বনফুল ছদ্মনাম ধারণ করলেন। সাধারণ কবিদের প্রথম যৌবনের কবিতায় বেশির ভাগই প্রেম ও রোমান্সের আভাস থাকে, কিন্তু বনফুল তা না করে আমাদের চারপাশের অতি সাধারণ বস্তুকে কাব্যে স্থান দিলেন। কাক, গরু, দুর্বা, ঘুটে, কাঁটাগাছ প্রভৃতি উপকরণকে তাঁর কবিতায় বেছে নিয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন– 'বিজ্ঞানী মেজাজের' কবি। 'আসলে আমাদের পরিচিত জগতের আনাচে-কানাচে, আড়ালে-আবডালে ধূলি ধূসর হয়ে আছে যে সমস্ত বস্তুগুলি তাদের শুধু বস্তুরূপেই নয়, তাদের অন্তর মূল্য উদঘাটন করতে চেয়েছেন কবি। একটা অনুসন্ধিৎসু মন নিয়েই তিনি দেখতে চেয়েছেন এই রম্যতাহীন, রুক্ষ অবহেলিত বস্তুগুলিকে।

Dhaka University Institutional Repository

এখানেই তিনি 'বিজ্ঞানী মেজাজের' কবি।'[১০] বনফুল তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে নিতান্ত তুচ্ছ বস্তুকে সকলের দৃষ্টিগোচর করেছেন।

তবে বৈজ্ঞানিক সত্তার পাশাপাশি প্রকৃতিমুগ্ধ এবং সৌন্দর্য পিপাসু এক রোমান্টিক মনও বনফুলের মাঝে বিরাজ করত। তাঁর 'পাখী' নামক কবিতায় লক্ষণীয়, উন্মুক্ত আকাশে পক্ষ বিহঙ্গের অবাধগতি রেখে কবি মুগ্ধ। সংসার জীবনে আবদ্ধ মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যেন উদ্ভাসিত হয়েছে পাখির ডানায়। প্রমথনাথ বিশী বনফুল সম্বন্ধে লিখেছেন– 'বনফুল কবিতা ও ছোটগল্প লিখিয়া সাহিত্য জীবন শুরু করেন। কবিতার মধ্যে মধুর রস ও ব্যঙ্গ রস দুই-ই আছে।'[১১] মূলত বনফুল ব্যঙ্গ কবিতায় বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন। বনফুলের ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলোতে আছে কোথাও তীব্র বিদ্রূপ, কোথাও পরিহাস, কোথাও বা অনাবিল আনন্দে ভরা কৌতুক। তাঁর 'ফরমায়েসী প্রিয়া', 'বিবাহের ব্যাকরণ', 'ছারপোকা', 'ট্রাজেডি বৃক্ষের আর একটি ফল' ইত্যাদি কবিতায় আছে নির্মল হাস্যরস, যা পাঠককে আনন্দ সাগরে ভাসিয়েছে। বনফুলের কবিতায় শুধু ব্যঙ্গ বা কৌতুকই নয় পরিহাসচ্ছলে মৃদু আঘাতের পরিচয় মেলে। এখানে ছোটখাট, তুচ্ছ-মহৎ সবই তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে ধরা পড়ত। যেমন–

ফাঁকা গলি শিষ দিনু নীরব দুপুর
বাতায়ন খুলিল না, আসিল কুকুর।

আশা নিরাশা বৈপরীত্যযোগে এক অনবদ্য পরিহাস লক্ষণীয় এ কবিতায়।

বনফুলের কবিতায় বহু বিচিত্র সুর, স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণের সন্ধান মেলে। কবিতা পাঠ করলে দেখা যায় যে, তিনি একদিকে বিজ্ঞানমনস্ক, অপরদিকে রোমান্টিক ও সৌন্দর্যপিপাসু এবং একই সাথে ব্যঙ্গ ও কৌতুক রসেরও সাধক। এর কোথাও কোন বিরোধ নেই। এখানে একই লেখক-সত্তার বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় দিকমাত্র। বাংলা সাহিত্যে বনফুলের অবদান অবর্ণনীয়। বনফুল সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন–

> "তাঁহার রচনার অজস্রতা এবং বৈচিত্র্য দুই-ই বিস্ময়কর। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক– কী না তিনি লিখিয়াছেন। কী না তিনি চমৎকার লিখিয়াছেন! ইহার পরের বইখানা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবে– বনফুল সম্বন্ধে কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। এমনি তাঁহার অভিনবত্ব।"[১২]

বনফুলের সাহিত্যে এত বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটেছে। তাই প্রতিটি সাহিত্য কর্মই স্বতন্ত্র। বনফুল প্রবন্ধকারও বটে। তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর পরিমাণ খুবই সীমিত। তাঁর প্রবন্ধ পুস্তক মাত্র চারটি– উত্তর, শিক্ষার ভিত্তি, মনন ও দ্বিজেন্দ্র দর্পণ। এ প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই কোন উপলক্ষে পাঠের বা ভাষণের জন্য তৈরি। 'লিখিত ভাষণের সীমার মধ্যেই বনফুল একটি নিজস্ব রীতি সৃষ্টি করেছেন– উদ্দিষ্টশ্রোতার প্রতি তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেছেন। সেই প্রকাশ সহজ, সাবলীল, ক্ষেত্র বিশেষে নাটকীয় একোক্তির গুণযুক্ত।'[১৩] কোন উপলক্ষ ও প্রয়োজনের তাগিদে প্রবন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

তৈরি করলেও বনফুলের ভাবনা স্পষ্টভাবেই সেখানে প্রকাশ পেয়েছে। কারো মনোতুষ্টির জন্য তিনি প্রবন্ধ রচনা করেন নি।

বনফুল লঘু হাল্কা এবং জ্ঞানগর্ভ তথ্যপূর্ণ দু'ধরনের প্রবন্ধ রচনায় পারদর্শী। তথ্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ, যুক্তি-তর্কমূলক সুসংবদ্ধ রচনা, লঘু মেজাজের রচনা যা জ্ঞানের চাইতে ভাবকল্পনার রঙে রাঙানো ও অনুভূতির রসে সিঞ্চিত, এই দুই ধরনের রচনাতেই বনফুল ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। তাঁর রম্যরচনার প্রথম নমুনা 'ভূয়োদর্শন', যাকে মোহিতলাল রসসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত Essay বলেছেন, যে রসের পরিণত নিদর্শন 'চূড়ামনি রসার্ণব'। প্রবন্ধ রচনার আদিপর্বে চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার নিদর্শনরূপে সুসংবদ্ধ রচনা হিসাবে পাই 'উত্তর' বা 'শিক্ষার ভিত্তি'র প্রবন্ধমালা, যা ভবিষ্যতের 'মনন' গ্রন্থের পথিকৃৎ।'[১৪] তাঁর প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে 'মনন' অন্যতম। বনফুল তাঁর লেখায় বাঙালি জাতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অতীত, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সমস্যা তুলে ধরেছেন। বনফুল সমাজের মানুষকে খুব কাছ থেকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর মৌলিক রচনা কখনো আস্বাদ্যতা ও বাস্তবধর্মিতা হারায় নি। চেতনায় বাঙালিত্বের সাথে সাহিত্য বিচারে বনফুলের একটা নীতিবাদী মন সব সময় সক্রিয় ছিল। যার প্রতিফলন তাঁর প্রবন্ধে পড়েছে। বনফুল নিজেই লিখেছেন–

> 'বাল্যকাল থেকে আমি একটা অত্যন্ত বিশুদ্ধ নৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলাম। ফলে আমার মনের নেপথ্যে নীতির যে মানদণ্ডটি গড়ে উঠেছিল তা অত্যন্ত কড়া এবং তীক্ষ্ণ। তাই দিয়েই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি সবাইকে মাপতাম।'[১৫]

সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে যখন কারো বিচার করতেন, সেই সাহিত্য বিচারে তাঁর নৈতিকতার মানদণ্ড কখনো শিথিল হয় নি। তা রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর কারো ক্ষেত্রেই নয়। বনফুলের শেষ যুগের প্রবন্ধের মধ্যে কবি বনফুল অপেক্ষা মনস্বী ও সাহিত্যরসিক বনফুলকেই খুঁজে পাই। সমষ্টিগতভাবে তাঁর সমগ্র প্রবন্ধ রচনা শিল্প সৃষ্টির ও সৃজনশীল মনের পরিচায়ক। সংখ্যায় সীমিত হলেও চিন্তাধারায় উজ্জ্বল, ভাবরসে আপ্লুত ও রূপরস মাধুর্যে সিঞ্চিত প্রবন্ধগুলো সাধারণ পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে থাকবে। আর তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে বিদগ্ধ সমাজে প্রবন্ধকার বনফুলকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

বাংলা সাহিত্যের জগতে এক ব্যতিক্রমধর্মী লেখক বনফুল। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর বিস্তার এবং বিচরণ দীপ্তিময়। তাঁর যুক্তিবাদী মন, অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা; তাঁর দর্শন, মনন ও জীবনচেতনাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছিল। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে সমান দাপট থাকলেও মূলত তিনি ছোটগাল্পিক হিসেবে শীর্ষস্থানীয়, ছোটগল্পের রূপরীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন– যা একান্তই বনফুলের স্বকীয়তা। 'বাংলা সাহিত্যে বনফুলের ছোটগল্পগুলি এক অপরূপ বিস্ময়, সে কেবলই ঐ আশ্চর্য বাক সংক্ষিপ্তির কল্যাণেই নয়, শৈলী এবং ভাবানুষঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

এমন এক অনির্বচনীয় রহস্যকরতা রয়েছে, যার অদৃশ্য প্রভাবে স্বল্প কথার সর্বাঙ্গ ঘিরে রচনাতীতের এক মৌন স্পর্শ যেন নিরন্তর গুঞ্জিত হয়ে ফেরে।'[১৬] সর্বদিক বিচারে বনফুলের ছোটগল্প তাঁর সার্থক সৃষ্টি।

বনফুল অজস্র ছোটগল্প লিখেছেন– তাঁর গল্পের সংখ্যা মোট ৫৭৮টি। এগুলো মোট ৩৫টি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। বনফুলের গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– বনফুলের গল্প (১৯৩৬), এটি বনফুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এছাড়া বনফুলের আরো গল্প (১৯৩৮), বাহুল্য (১৯৪৩), বিন্দু বিসর্গ (১৯৪৪), অদৃশ্যলোকে (১৯৪৬), ঊর্মিমালা (১৯৫৬), অনুগামিনী (১৯৫৮), মণিহারী (১৯৬৩), ছিটমহল (১৯৬৫) ইত্যাদি। পরবর্তীতে বনফুলের সমগ্র গল্পগুলোকে একত্রে 'বনফুলের গল্প সমগ্র' চার খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। বনফুল ছাত্র জীবন থেকে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের নেশায় ভাল রেজাল্ট করেও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টিকে অভিষ্ট লক্ষ্য মনে করতেন না। তিনি এ প্রসঙ্গে পশ্চাৎপটে লিখেছেন–

> "সাহিত্যের নেশা যদি আমাকে অভিভূত না করিত তাহা হইলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অনেক ভালো ফল করিতে পারিতাম। আমার পরবর্তী ছাত্র জীবনেও কলেজের পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তে আমার ধ্যান জ্ঞান ছিল সাহিত্য। তাই শিক্ষা জীবনে সাধারণ ছাত্ররূপেই আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, অসাধারণ ছাত্রদের দলে স্থান করিয়া লইতে পারি নাই। সাহিত্যের ভূত যদি ঘাড়ে না চাপিত তাহা হইলে হয়তো পারিতাম। আমি সাহিত্য চর্চা করি বলিয়া আমার শিক্ষকরা– এমনি কি মেডিকেল কলেজে যখন পড়ি তখন সেখানকার বাঙালী শিক্ষকরাও আমাকে অনেক খাতির করিতেন।"[১৭]

মেডিকেল কলেজে পড়াকালীন বনফুল ছোটগল্প লিখতে উৎসাহিত হলেন। তিনি অনেক সময় মেডিকেল কলেজের ক্লাস রুমে অথবা প্রকাণ্ড গ্যালারীতে একা বসে নির্জনতা উপভোগ করতেন এবং নির্জন পরিবেশেই গল্প লিখতেন। বনফুল নিজেই এ প্রসঙ্গে লিখেছেন–

> "মেডিকেল কলেজে খালি ক্লাসরুমগুলিতেই সেই নির্জনতা পাইতাম। একদিন 'বাড়তি-মাশুল', 'অজান্তে' প্রভৃতি চার-পাঁচটি গল্প একসঙ্গে লিখিয়া ফেলিলাম। লিখিবার পর মনে হইল এগুলি গল্প হইলতো? 'প্রবাসী'তেই সব গল্পগুলি পাঠাইয়া দিলাম। সম্পাদক মহাশয়কে লিখিলাম– এগুলি ঠিক রসোত্তীর্ণ রচনা হইল কিনা বুঝিতে পারিতেছি না। রচনাগুলির নামকরণও করিতে পারি নাই। আপনাদের যদি ভালোলাগে এগুলির নামকরণ করিয়া প্রবাসীতে ছাপিবেন। আর ভালো যদি না লাগে ফেরত দিবেন। সঙ্গে টিকিট দিলাম। লেখা পাঠাইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইত। তখন চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক ছিলেন। কয়েকদিন পর তাহার

Dhaka University Institutional Repository

একটি পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন গল্পগুলি পছন্দ হইয়াছে। সবগুলিই 'প্রবাসী'তে ছাপিব।"[১৮]

'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর সর্বপ্রথম ছোটগল্প 'পাখী' প্রকাশ পায় ১৯২২ সালে। সেই থেকেই তাঁর ছোটগল্পের জগতে বিচরণ। বনফুলের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'বনফুলের গল্প'। এখানে সংযোজন ও বিয়োজন করে মোট ৩৫টি গল্প পাওয়া যায়। আমাদের চারপাশের বাস্তব চিত্রগুলোকে বনফুল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাঁর প্রথম পর্যায়ে গল্পে। বনফুলের অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যা দেখেছেন এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাই তিনি স্বল্পাকৃতিতে গল্পে তুলে ধরেছেন। এ সংকলনের গল্পের মধ্যে আছে– 'বাড়তি মাশুল', 'অজান্তে', 'চোখ গেল', 'অদ্বিতীয়া', 'তর্কস্বপ্ন', 'ট্রেনে', 'যুগল স্বপ্ন', 'ভিতর ও বাহির', 'বুধনী' ইত্যাদি। 'বাড়তি মাশুল' গল্পে আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের ট্রাজেডির কথা প্রকাশ পায়, হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে না পেয়ে ট্রেনে বাড়তি ভাড়া দিতে হয়েছে। জীবনের টানাপোড়নে ছেলের চেয়ে ঐ বাড়তি ভাড়াই ভদ্রলোকের কাছে বাড়তি মাশুল হল।

'অজান্তে' গল্পটি বাড়তি মাশুলের মত আকারে খুবই চোট, মাত্র দুশো কুড়ি শব্দের গল্প। এখানে এক ভদ্রলোক অফিসে মাহিনা পেয়ে স্ত্রীর জন্য 'বডিস' কিনে নেয়। গলিতে ঢুকে রাতের অন্ধকারে নিজেরই অন্যমনস্কতার জন্য একজনের গায়ে ধাক্কা লেগে নতুন জামাটি কাদায় মাখামাখি। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে দেখেন অন্য লোকটি এখনো উঠতে পারে নি। ভদ্রলোক রেগে গিয়ে ঐ লোককে এক লাথি মারলেন আর বললেন– 'রাস্তা দেখে চলতে পারো না শুয়ার!'[১৯] পরে দেখা গেল লোকটি অন্ধ এবং বোবা। এবং শেষে অন্ধলোকটি প্রহারকের দিকে কাতর মুখে চেয়ে হাত দুটি জোড় করে আছে। বনফুলের গল্পের শেষে বিদ্যুৎ বিকাশের মত গল্প সত্য স্ফুরিত হয়। এখানেই লেখকের শিল্পকৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। 'ট্রেনে' ও 'বুধনী' বিহারের পটভূমিকায় লেখা। 'ট্রেনে' গল্পটি দানাপুরের দুই ট্রেনযাত্রীর এক অপূর্ব গল্প। 'বুধনী' হাজারিবাগের দুই আদিবাসী সাঁওতাল তরুণ-তরুণীর জান্তব আবেদনের গল্প। 'চোখ গেল' ট্রাজিক প্রেমের গল্প। আর 'অদ্বিতীয়া' দাম্পত্য জীবনের ট্রাজেডি। এক পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ অন্যপক্ষে আছে হাস্যরস। দুয়ের সংমিশ্রণে, সমাজের বাস্তবচিত্র এগল্পে তুলে ধরা হয়। 'বনফুলের গল্প' গ্রন্থের পর প্রকাশ পায় বনফুলের আরো গল্প (১৯৩৮)। এ বইয়ের গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ঐরাবত, খড়মের দৌরাত্ম, বিদ্যাসাগর, পাশাপাশি, পাঠকের মৃত্যু, মুহূর্তের মহিমা ইত্যাদি। 'বনফুলের আরো গল্প'তে বিশেষভাবে পরিহাস রসের আস্বাদন পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের গল্পগুলো পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন–

"বর্তমান যুগ সাহিত্যের যুগ। সাহিত্যের উপরে বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায় থেকে মুক্তি পেয়েছে, তার কাজ হচ্ছে মনোযোগ

Dhaka University Institutional Repository

করানো। আগাছা পরগাছা বনস্পতি সবকিছুতেই যে দৃষ্টি সে টানে সে কৌতূহলের দৃষ্টি। পদে পদে সে বলিয়ে নিচ্ছে। তাইতো এতো আমি দেখি নি কিংবা ঠিকটি দেখলুম। আগেকার সাহিত্য চোখভোলানো সামগ্রী নিয়ে। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে উপেক্ষিত অনতিগোচরের দিকে। তাতেও রস আছে, সে হচ্ছে কৌতূহলের রস। সাজপরানো কনে দেখানোর মতো করে প্রকৃতিকে দেখাতে গেলে ঐ রসটি থেকে বঞ্চিত করা হয়; ঠিকটি দেখা গেল বলে হাতছানি দিয়ে ওঠার উৎসাহ চলে যায়। জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যারা, তুচ্ছতার মূল্যেই তাদের মূল্যবান করে দেখার কাজে কোমর বেঁধে বেড়িয়েছে তোমাদের মত বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক। তোমাদের সন্ধান জগতের অভাজন মহলে– তোমাদের ভয় পাছে তার অকিঞ্চিৎকরত্বের বিশিষ্টতাকে ভদ্র চাদর পরিয়ে অস্পষ্ট করে ফেলো।"[২০]

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে বনফুলের গল্পে অভিনবতার তিনটি মূল বিষয় বেরিয়ে আসে– (ক) তাঁর রচনায় বিষয়বস্তুর সঞ্চয়ভাণ্ডার দৃষ্টির অগোচরের সামগ্রী নিয়ে গড়া দৈনন্দিন জীবনের অলিতে গলিতে ধূলিমালিন্যের তুচ্ছতায় তারা আবৃত। (খ) শিল্পীর গঠন-শৈলীতে আত্মসংবরণের বৈজ্ঞানিক চেতনার সন্তর্পণ প্রয়াস– পাছে বস্তুর 'অকিঞ্চিৎকরত্বের' বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার ব্যক্তিগত মনমানসিকতার সুশীল আবরণে আবৃত হয়ে পড়ে। (গ) রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য– বনফুলের বিজ্ঞানী মেজাজে গড়া গল্প চোখ ভোলায় না, কৌতূহলের কৌতুক রসে হাততালির উৎসাহকে উৎসারিত ও প্রসারিত করে তোলে। 'বনফুলের আরো গল্পে'র গল্পে আছে তাঁর পরিমিতি বোধ, আখ্যানধর্মী সহজ সরল বর্ণনা। অতি অল্প কথায় উদ্ভূত চরিত্র সৃষ্টি। ব্যাঙ্গাত্মক সরস দৃষ্টিভঙ্গি, গল্পশেষে আকস্মিকতা এবং প্রাণখোলা হাস্য ও কৌতুক রস। এখানে ঐরাবত, অলকানন্দা, উৎসবের ইতিহাস, মানুষ, শ্রীপতি সামন্ত, যুগান্তর প্রভৃতি তাঁর সার্থক সৃষ্টি। এখানে– বহুগল্পে বিহারের পরিবেশ, মানুষ ও পারিপার্শ্বিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। বিহারের নীচু তলার মানুষ মানবিকতাবোধে মহান হয়ে ধরা দিয়েছে 'থিওরি অব রিলেটিভ' গল্পে। গল্পের অত্যন্ত কদর্য, দুর্গন্ধবাহী রুকমিনিয়া যখন অসুস্থ, মালিক মাসিমার জন্য মহাবীরজীর কাছে পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে আসার সংবাদ দেয়, তখন গল্পকথকের আর তাকে দুগর্ন্ধবাহী মনে হয় না।[২১]

১৯৪৩ সালে বনফুলের 'বাহুল্য' ছোটগল্প সংকলনটি প্রকাশ পায়। গল্প সংখ্যা মোট ২৬টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে– বাঘা, চিঠি পাওয়ার পর, পরিবর্তন, হাসির গল্প, ব্যতিক্রম, দর্জি, সামান্য ঘটনা ইত্যাদি। বনফুলের গল্পে কারিগরির চেয়ে জীবনের দিকে ঝোঁক বেশি, জীবনের বহু বিচিত্র দিক তিনি গল্পের মধ্যে মানুষের মাঝে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'হাসির গল্প'– এখানে নামেই হাসির গল্প– অন্তরালে জীবনের বাস্তব ট্রাজেডির প্রকাশ পেয়েছে। 'ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হরিহরবাবু একটি হাসির গল্পের প্লট

Dhaka University Institutional Repository

ভাবিতে লাগিলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁহার নাম।'[২২] ঘরেতে অভাব, ছেলে অসুস্থ, ঐ গল্প লিখে টাকা দিয়ে পাওয়া পরিশোধ। গল্পটি বাস্তবকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে লেখক দেখিয়ে দিয়েছেন। 'হাসির গল্প' সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন–

> "আর যাই হোক, 'হাসির গল্পকে' হাস্যরসের গল্প কথা বলে কেউ মনে করবেন না। করুণ রসের কুহরে কুহরে প্রবহমান হাস্যরসের অন্তপ্রবাহ মানব-জীবনের সেই নিয়তিকে পরিস্ফুট করেছে যাকে বিদগ্ধ লেখক বলেছেন, 'mingled heritage of tears and laughter that is our lot on earth.'[২৩]

গল্পে মানুষের জীবনের নির্মম পরিহাস ফুটে উঠেছে। তাঁর গল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যঙ্গরস বহিরাবরণ মাত্র। ভিতরে করুণ রসটি গোপন করার জন্য। ১৯৪৪ সালে প্রকাশ পায় 'বিন্দু-বিসর্গ' নামের ছোট গল্প সংকলন। এতে মোট ২০টি গল্প– কবচ, পাকারুই, নাথুনির মা, গদ্য কবিতা, কাকের কাণ্ড, খেলা, ক খ গ (জ্যামিতিক গল্প), লাল বনাত, ছোটলোক, তিলোত্তমা, চান্দ্রায়ণ ইত্যাদি। এ গল্পগুলোতে আছে স্যাটায়ার। নকল ভদ্রতার মুখোশ খুলে তিনি এখানে বিদ্রূপের কষাঘাত হেনেছেন। 'চান্দ্রায়ণ' গল্পে আ. এম. এস-এর শর্টার চন্দ্রবাবু তার কাজে উপযুক্ত ফল পেয়েছেন। চন্দ্রবাবুর প্রায়শ্চিত্তটিও কবি বিধাতার চরম দণ্ড বিধানেরই উদাহরণ। চাকরির সুযোগে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যের একান্ত গোপনীয় প্রেমপত্র খুলে পড়ার দুষ্প্রবৃত্তি একেবারে মাথার ওপর যেন বজ্রপাত হল। শেষ পর্যন্ত নিজের স্ত্রীর প্রেমপত্র–এর চেয়ে নির্মম আর কি থাকতে পারে।[২৪] চান্দ্রায়ণ নামকরণের শ্লেষার্থটিও বড়ই নির্মম। চন্দ্রচরিত্রই চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। অবশ্য আর্টিস্ট হিসাবে স্যাটায়ারিস্টের শিল্পভাষণ এখানে 'কান্তাসম্মতি' নয়, একেবারে 'প্রভূ সম্মিত'। কবি প্রজাপতির চেয়ে কবি বিধাতাই এক্ষেত্রে অধিক সক্রিয়। ১৯৪৬ সালে বনফুলের 'অদৃশ্যলোকে' গল্প গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। এর গল্প সংখ্যা বিশটি। এর মধ্যে বেশ কিছু গল্প অদৃশ্যলোকের রহস্যময় ভৌতিক, অতিলৌকিক ঘটনা নিয়ে এ সংকলনের গল্পগুলো রচিত হয়েছে। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, যেমন– 'অধরা', 'প্রজাপতি', 'তাজমহল', 'নিমগাছ' ইত্যাদি। 'প্রজাপতি' গল্প সম্পর্কে শ্রীভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য স্মরণীয়– "আবার সেই রহস্য– একি পরলোকবাদ, অতীন্দ্রিয় প্রেমবাদ, না আর কিছু। বনফুলের গল্পে এ সব কিছুই নেই, কোন 'বাদ' যদি তাঁর রচনায় থাকে তাহলে সে জীবন রহস্যবাদ, বিজ্ঞানীর কৌতূহল উৎকণ্ঠার সঙ্গে শিল্পীর আত্মীকতার সহযোগে যার নিত্য অনুসন্ধান করে ফিরছেন লেখক। মাঝে মাঝে সেই প্রগাঢ় সন্ধিৎসা বিজ্ঞানীর আবিষ্কারকে যেন উপলব্ধিময় ব্যঞ্জনা দিয়েছে অনতি তীব্র সাংকেতিকতার ভাষায়।"[২৫] এ আলোচনা প্রসঙ্গে বনফুল বলেছিলেন– 'স্পিরিট ওয়ারলড' বা ভৌতিক জগত বলে একটা রহস্যময় যে কিছু আছে তাতে তিনি বিশ্বাসী। তাঁর মত প্রায় প্রতিটি হিন্দুই পরলোকে বিশ্বাসী।'[২৬] 'প্রজাপতি' গল্পের শেষে দেখা গেল– "হঠাৎ আশার কণ্ঠস্বরে কে যেন বলে উঠল– 'তাহলে আমার

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বও ফুরোল– আমিও চললাম'। প্রজাপতিটা উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।"[২৭] এখানে 'প্রজাপতি' মৃত স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছিল। যখন ভদ্রলোক দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি নিলেন তখন প্রজাপতি উড়ে চলে গেল। এখানেই গল্পের মূল রহস্য।

১৯৪৭ সালে প্রকাশ পায় 'আরো কয়েকটি'। এর গল্প সংখ্যা ১৬। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে– স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, অর্জুন মণ্ডল, অশ্রুর উৎস, ভক্তি-ভাজন ইত্যাদি। ১৯৪৯ সালে 'তন্বী' গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পায়। 'তন্বী' গ্রন্থে মোট ৪৮টি গল্প আছে– এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে– রাজাধিরাজ, দেশদরদী, কেনারামের রোজনামা, দেশী ও বিলাতী, সত্য ইত্যাদী। গল্পগুলোতে সমাজের বাস্তব চিত্র এবং বাঙালির চরিত্র সম্পর্কে বনফুল কটাক্ষ করেছেন। 'নবমঞ্জরী' প্রকাশ পায় ১৯৫৪ সালে। এখানে মোট গল্প সংখ্যা ৩০টি। এ গ্রন্থের গল্পের মধ্যে আছে– দুইনারী, ভূতের প্রেম, মন্মথ, পক্ষীবদল, চতুরীলাল, বাল্মীকি, দুইছবি, অজ-প্রসঙ্গ, চঞ্চলা ইত্যাদি। এ গ্রন্থের গল্পে বনফুলের বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বচক্ষে দেখা ছবি, ঘটনা এবং চারিত্রিক অসঙ্গতিকে অন্যের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে– যাতে পাঠকসমাজ গল্পকে লেখকের দৃষ্টিতে দেখতে পায়। বনফুল জীবনকে দেখেছেন চলচ্চিত্রের মতো। তিনি ছিলেন একধারে বিজ্ঞানী ও কবি। এ দুটি গুণই তাঁর গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। শিল্পীর নিস্পৃহতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতা মিলে বনফুলের দৃষ্টি ভঙ্গিকে করেছে স্বতন্ত্র। 'ঊর্মিমালা' প্রকাশ পায় ১৯৫৬ সালে। এ গ্রন্থের গল্পের সংখ্যা মোট ২৪টি। 'রঙ্গনা' গল্প গ্রন্থটিও এ বছরেই প্রকাশ পায়। 'রঙ্গনা'র গল্প সংখ্যা মোট ১৮টি। 'ঊর্মিমালা'র উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে– শূন্যের দান, ভ্রাতৃপ্রেম, বীরেন্দ্রনারায়ণ, নীলকণ্ঠ, পালোয়ান, কাক-চরিত্র, ছবি, রূপান্তর, চুনোপুঁটি, নারীর মন ইত্যাদি। এ গল্পগুলোতে সমাজের নানা সঙ্গতি অসঙ্গতির চিত্র তুলে ধরেছেন। 'রঙ্গনা'র গল্পের মধ্যে আছে– অসম্ভব গল্প, স্বাধীনতা, একালের রূপকথা। অসম্ভব গল্প ও স্বাধীনতা গল্প দুটো ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে। 'অসম্ভব' গল্পে বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে যে স্বাধীনতা এল তাকে বনফুল ভুলতে পারে নি। এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন তাঁর শিল্পীসত্তাকে বিচলিত করেছিল।[২৮] দ্বিতীয় গল্প 'স্বাধীনতা'র মূল কথা– যা খুশি তা করার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে না। সত্যিকারের আনন্দের মাঝেই স্বাধীনতা।[২৯] 'অনুগামিনী', 'করবী', এবং 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প'– এই ৩টি গল্পগ্রন্থ ১৯৫৮ সালে প্রকাশ পায়। অনুগামিনীর গল্প সংখ্যা ২৮টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– 'অতি ছোট গল্প', 'চম্পা মিশির', 'চম্পা', 'ফাও', 'উচিত-অনুচিত' প্রভৃতি। প্রায় প্রতিটি গল্পেই হঠাৎ আলোর-ঝলকানির মত সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। 'অতি ছোট গল্প' আকারে এক পাতাও নয়, কিন্তু ঐ স্বল্প পরিসরে আছে যুগ-যুগান্তরের মানুষের আদিম কামনার

Dhaka University Institutional Repository
স্বরূপ। দীপ শিখা এবং হাওয়ার সম্পর্ককে নারী-পুরুষের চিরন্তন সম্পর্কে আভাসিত করে পাঠককুলকে হঠাৎ করে চমকে দিয়েছেন, আর সাথে সাথে বিস্ময় মাখানো অনাবিল আনন্দেরও আস্বাদন প্রদান করেছেন।[৩০] 'সপ্তমী' প্রকাশ পায় ১৯৬০ সালে। এ সংকলনে মোট ২৫টি গল্প আছে। উল্লেখযোগ্য গল্পসমূহ হচ্ছে– সতী, কৃতজ্ঞতা, বুড়িটা, দুধের দাম, অদ্ভুত গল্প, ছবি, আর এক দিক, বেহুলা ইত্যাদি। গ্রন্থের নিবেদনে বনফুল লিখেছেন–

> "এইটি আমার সপ্তম গল্পগ্রন্থ। আমার গল্পের অন্য সংকলনগুলি আমার আগেকার ছটি গল্পগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। সপ্তমীতে যে গল্পগুলি সংগৃহীত হল সেগুলির প্রকাশ কাল মাঘ, ১৩৬৪ সালের পর থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ সাল পর্যন্ত। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় গল্পগুলি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।"[৩১]

'সপ্তমী'র 'দুধের দাম' ও 'বুড়িটা' গল্প দুটি বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। 'দুধের দাম' গল্পের বিহারী-কুলির মানবিকতা আমাদেরকে বিস্মিত করে। গয়াপানী বৃদ্ধা যাত্রীকে আমাদের সুশীল সমাজ অবজ্ঞার চোখে দেখলেও তখন শ্রমজীবী কুলির কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা ও মনুষ্যত্ববোধ আমাদের বিস্মিত করে। সে এই কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরী নিতেও অস্বীকার করল। সে বলল– "আমি ধর্ম বিক্রি করি না।"[৩২] ভাগলপুরের পটভূমিকায় 'বুড়িটা' গল্পটি রচিত। ভিখারিনী এক দেহাতী বুড়ির গল্প নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। ঐ বুড়িটা তো আমাদের সমাজ ও দেশের শীতার্ত-ক্ষুধার্ত নিপীড়িত এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতীক। এটা আরো ব্যঞ্জনাময় রূপ ধারণ করে গল্পের শেষ লাইনে– "শুকনো ভাল হাতে বুড়ী আমাদের দেশে অনেক আছে।"[৩৩] এখানে আর প্রকাশ পেয়েছে প্রবাসী বাঙালি জীবনে শূন্যগর্ব আত্মম্ভরিতার কথা। এ গ্রন্থের গল্পে কেবল আঙ্গিক চেতনা নয়, বনফুলের সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধও চমৎকারভাবে বিকাশ পেয়েছে।

'দূরবীন' ও 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' গ্রন্থ দুটি ১৯৬১ সালে প্রকাশ পায়। 'দূরবীনে' মোট ৩০টি গল্প আছে। এর উল্লেখযোগ্য গল্প সমূহ হচ্ছে– খগার মা, জবর দখল, ক্ষীর, পালানো যায় না, কেন এমন, নদী ইত্যাদি। গল্পগুলোতে বনফুলের গল্পের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই তৈরি কল্পনা, বাস্তব, সঙ্গতি অসঙ্গতি সব মিলে স্বভাবতই রূপে, রসে, বর্ণে, স্বাদে ও গন্ধে ছোটগল্পের বৈচিত্র্য বজায় রেখেছে। 'মণিহারী' গল্প গ্রন্থটি ১৯৬৩ সালে প্রকাশ পায়। এখানে মোট ২৭টি গল্প আছে। 'মণিহারী' গল্প বনফুলের অন্য গল্পগুলোর মতো হলেও এগুলোর একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। তাহলো মণিহারী শুধু গ্রন্থেরই নাম নয়, মণিহারী পূর্ণিয়া জেলার একটি গ্রাম। গঙ্গা ও কোশী নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত মণিহারীতেই বনফুলের জন্ম। স্বভাবতই গ্রাম ও গ্রামের মানুষজন স্কুলের সহপাঠি, বাড়ির চাকর-বাকর, আত্মীয়-স্বজনদের নানা স্মৃতি বনফুলের হৃদয়ে রেখাপাত

Dhaka University Institutional Repository

করে। 'মণিহারী'র গল্পে সেইসব খণ্ড খণ্ড চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থের রচনায় গল্পরসের চেয়ে বাল্যস্মৃতির স্পর্শ অনেক বেশি মধুর। গল্পগুলো হচ্ছে– সর্বণ গোয়ালা, চাচী, শ্রীনাথপণ্ডিত, রামু ঠাকুর, কুতুবুদ্দিন, চুলুহা, হর্ষডাক্তার, বিরজুমা। এরা সকলেই মণিহারীর লোকজন। 'ছিটমহল' গল্প সংকলনটি প্রকাশ পায় ১৯৬৫ সালে। এ গ্রন্থে মোট ২৯টি গল্প আছে। এর প্রধান প্রধান গল্পগুলো হচ্ছে– পোস্টকার্ডের গল্প, তিনমুণ্ড, পাত্তালীর হাসি, উপেনের ছেলে, ক্ষতের গভীরতা, শেষ ছবি, মহামানব কেনারাম ওক ইত্যাদি। বনফুলের 'ছিটমহল' এক স্বতন্ত্র মহল, বনফুলের গল্প সমগ্র'র চতুর্থ খণ্ডও এক ধরনের সমগ্রতা। 'পোস্টকার্ডের গল্প'-এ আমরা দেখতে পাই সমাজে বাস্তব রূঢ় সত্য ধরা পড়েছে। স্ত্রীর মনের বাসনা স্বামী তার কাছে রঙিন খামে রঙিন কাগজে অনেক অনেক বড় করে চিঠি লিখুক, কিন্তু স্বামীর সে আর্থিক সঙ্গতি ছিল না, তবুও পয়সা বাঁচিয়ে স্ত্রীর শখের জিনিস কিনেছে, কিন্তু স্ত্রী তাতে খুশি হয় নি। এখানে তারা দুজনকে দুজন সঠিকভাবে বুঝতে পারে নি। গল্পটিতে মনস্তাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক দুটো দিক একত্রে ধরা পড়েছে বনফুলের স্বল্পায়তনের লেখনীর মধ্যে। 'একঝাঁক খঞ্জন' গ্রন্থটি প্রকাশের কাল ১৯৬৭ সাল। এ গ্রন্থের গল্প সংখ্যা মোট ৩০টি। এ গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে– প্রমাণ, দুর্বা, অদ্ভুত কাণ্ড, মানসী, দেশ, ছোট্ট লেখা, পরিস্থিতি ইত্যাদি। গল্পগুলো পড়লে বোঝা যায়– 'লেখক বনফুলের আছে জীবন সম্বন্ধে সদাজাগ্রত কৌতূহল বিশিষ্ট 'খেয়ালি ও ওরিজিন্যাল' মানসিকতা। সজাগ দৃষ্টিভঙ্গী জীবনে সকল অনুপুঙ্খকেই (ডিটেল) স্বীকার করে আর 'দুর্দান্ত প্রাণশক্তি' সমস্ত অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে দুঃসাহসিক ব্যঙ্গের সাহায্যে উল্টে দিতে পারে। বনফুল এ দুয়েরই অধিকারী। আত্মপ্রত্যয়ী সামগ্রিক জীবনদর্শী ধ্রুপদী ভাবনাশ্রিত ছোটগল্প লেখক বনফুল মুহুর্মুহু প্রকরণবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অগ্রসর ও জীবনের বিচিত্র রূপদর্শনে কৌতূহলী।'[৩৪] বনফুলের পরবর্তী গ্রন্থগুলোও তাঁর স্বভাব সুলভ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নানা বৈচিত্র্যে রচিত হয়েছে। 'বহুবর্ণ' গল্পগ্রন্থটি ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত। মোট ৬০টি গল্প নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এর গল্পগুলো হল– ভোটার সাবিত্র বালা, ফুল ও মানুষ, যা হয়েছিল, অসম্ভব গল্প ইত্যাদি। এখানে 'শঙ্করীর ঘরেই' গল্পে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে মানবিকতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। পূর্ববঙ্গের লাঞ্ছিতা হিন্দু নারী শঙ্করীর গৃহে আশ্রয় পেয়েছে পাঞ্জাবের ধর্ষিতা মুসলিম নারী ফাতিমা।[৩৫] সকল ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে মানবিকতাবোধ প্রাধান্য পায় এ গল্পে। বনফুলের আরেকটি গল্প সংকলন– 'বনফুলের নূতন গল্প' ঐ একই বছর ১৯৭৬ সালেই প্রকাশ পায়। এ গ্রন্থে মোট ৪৪টি গল্প রয়েছে। প্রধান প্রধান গল্প সমূহ হচ্ছে– রাম সেবক, শতাব্দীর ব্যবধান, ব্যবধান, আটকে গেল, বিশু আর ননী, হাবি আর নবু, মিনির চিঠি, খড়ের টুকরা, সুরমা, রাবারের হাতী ইত্যাদি। এ গল্পগুলোতে লেখক রহস্য, বাস্তব, কল্পনা, মানবিকতা এবং সমাজের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করেছেন। 'বিশু আর ননী' গল্পে দেখতে পাই যখন বিশুর

Dhaka University Institutional Repository

ছেলে হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে– তখন "স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন– এবার দেশের লোকের সুচিকিৎসার জন্য নাকি কয়েক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার।"[৩৬] এখানে লেখকের কৃতিত্ব গল্পের শেষ লাইনে। কারণ গল্পের শেষে বনফুল বিদ্যুৎ বাণ নিক্ষেপ করেন।

'বনফুলের শেষ লেখা' গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পায় ১৯৭৯ সালে। এ গ্রন্থে বনফুলের গল্প ও ১টি প্রবন্ধ আছে। ২৬টি গল্পের মধ্যে 'বাঁশি' নামে ১টি নাটিকাও আছে। এ গ্রন্থের গল্পগুলো হচ্ছে– 'কাঁচা রং খারাপ স্প্রিং', 'প্রয়োজন', 'খোকনের প্রথম ছবি', 'ফরেন মানি', 'গল্প নয়', 'সেকালের এক খোকনের গল্প', 'আধো ঘুম' ইত্যাদি। এ গল্পগুলোতে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এবং প্রতিটি গল্প স্বাদে, বর্ণে, বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র। ১৯৭৯ সাল বনফুলের জীবনের শেষ বছর। উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গ-রচনা, নাটক– সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে যে কজন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, বনফুলের স্থান তাঁদের শীর্ষে। তাঁর সাহিত্য কর্ম বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বিষয় বৈচিত্র্যে, নব নব আঙ্গিকের অভিনবত্বে বনফুল স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল । এই স্বাতন্ত্র্যই বনফুলকে করেছে অনন্য। বস্তুত বহু বিচিত্ররূপ কারুশিল্পী হিসেবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বনফুলের অবদান অতুলনীয়।

তথ্যনির্দেশ :

১। ড. সরোজমোহন মিত্র : বনফুল : সাহিত্য ও জীবন (কলকাতা, ১৯৯৯), উদ্ধৃত, পৃ: ২৭-২৮

২। জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (কলকাতা, ১৯৯৯), ভূমিকা।

৩। ড. সরোজমোহন মিত্র : পূর্বোক্ত, পৃ: ২১

৪। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : বাস্তব ও কল্পমায়া বিচূর্ণ সীমা : বনফুলের উপন্যাস : বনফুল: শতবর্ষের আলোয় (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ: ১৯৮

৫। অলোক রায় : বনফুলের 'জঙ্গম' : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বনফুল সংখ্যা (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ: ৩৫

৬। ড. সরোজমোহন মিত্র : পূর্বোক্ত, পৃ: ২৯

৭। শেখর সমাদ্দার : বনফুলের নাটক : পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৩৯

৮। ড. সরোজমোহন মিত্র : পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৪

৯। পূর্বোক্ত, পৃ: ২১১

১০। নিশীথ মুখোপাধ্যায় : বনফুলের কবিতা : কোরক সাহিত্য পত্রিকা পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৭

১১। প্রমথনাথ বিশী : বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা : বনফুল শতবর্ষের আলোয় পূর্বোক্ত, পৃ: ৮০

১২। পূর্বোক্ত, পৃ: ৭৯-৮০

১৩। সুজিত ঘোষ : বনফুলের প্রবন্ধ : কোরক সাহিত্য পত্রিকা (পূর্বোক্ত), পৃ: ১১৩

১৪। সুনীলকুমার দত্ত : বনফুলের প্রবন্ধ : বনফুল শতবর্ষের আলোয় পূর্বোক্ত, পৃ: ২১২

Dhaka University Institutional Repository

১৫। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-স্মৃতি, পৃ: ১

১৬। শ্রীভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার (কলকাতা, ১৯৮৯), পৃ: ৫৪৮

১৭। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় : 'পশ্চাৎপট : 'বনফুল রচনাবলী : ষোড়শ খণ্ড (কলকাতা ১৩৮৯), পৃ: ৩৯

১৮। ড. সরোজমোহন মিত্র : পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩-১৪

১৯। অজান্তে : বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় : বনফুলের গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড (কলকাতা ১৩৯৮), পৃ: ৯

২০। শ্রীভূদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৫৪

২১। থিওরি অব রিলেটিভ : বনফুলের গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৯৮), পৃ: ১৭১

২২। হাসির গল্প : পূর্বোক্ত, পৃ: ৩৭৭

২৩। জগদীশ ভট্টাচার্য : উন্মেষ পর্বের বনফুল : স্রষ্টা ও সৃষ্টি : বনফুল শতবর্ষের আলোয় (পূর্বোক্ত), পৃ: ১১৬

২৪। চান্দ্রায়ণ : বনফুলের গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড (পূর্বোক্ত), পৃ: ৩৪৪

২৫। শ্রীভূদেব চৌধুরী :পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৬১

২৬। ড. সরোজমোহন মিত্র : বনফুল : সাহিত্য ও জীবন (পূর্বোক্ত), পৃ: ৭০

২৭। প্রজাপতি : অদৃশ্যলোকে : পূর্বোক্ত, পৃ: ৫১৬

২৮। অসম্ভব গল্প : ঊর্মিমালা : বনফুলের গল্প সমগ্র, ৪র্থ খণ্ড (১৩৯৩/১৯৮৬), পৃ: ১৩

২৯। স্বাধীনতা : ঊর্মিমালা : পূর্বোক্ত, পৃ: ২১

৩০। অতি ছোট গল্প : অনুগামিনী : বনফুলের গল্প সমগ্র, ৩য় খণ্ড (১৪০৫)

৩১। বনফুল : সপ্তমী : (কলকাতা, ১৩৬৭), নিবেদন

৩২। দুধের দাম : সপ্তমী : বনফুলের গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড (পূর্বোক্ত), পৃ: ১৪০

৩৩। বুড়ীটা : পূর্বোক্ত, পৃ: ১৩৪

৩৪। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা : (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ: ২৭৬

৩৫। শঙ্করীর ঘরেই : বহুবর্ণ : বনফুলের গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড (কলকাতা, ১৪০২), পৃ: ২৫০

৩৬। বিশু ও ননী : বনফুলের নূতন গল্প : পূর্বোক্ত, পৃ; ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
সমাজবাস্তবতার তাত্ত্বিক ধারণা : সাহিত্যে তার প্রতিফলন

সাহিত্য সমাজের দর্পণ স্বরূপ। সুতরাং সাহিত্য এবং সমাজের সম্পর্ক চিরন্তন। সাহিত্যের মাঝেই সমাজের প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করা যায়। সাহিত্যে সমাজবাস্তবতা বলতে বোঝায়– সমাজ, সমাজের মানুষ, মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না ইত্যাদি অনুভূতি, তার জীবনপ্রবাহ অর্থে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ, ধর্মীয় ও আদর্শিক বিশ্বাস, নীতিবোধ ইত্যাদি। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় সমাজের এ বাস্তব চিত্রগুলোর প্রতিফলন ঘটছে। তেমনি ছোটগল্পেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। ছোটগল্প যেহেতু জীবনের খণ্ডচিত্র সেহেতু জীবনের এইসব সাধারণ অভিব্যক্তি ছোটগল্পের অবশ্যম্ভাবী অবলম্বন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষাযাপন' কবিতাটি প্রণিধানযোগ্য–

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।[১]

আসলে ছোটগল্প আমাদের সমাজের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবনের এবং সমসাময়িক কালের ছোট ছোট বাস্তব ঘটনার খণ্ডচিত্র।

সামাজিক ছোটগাল্পিক মাত্রই জীবনের নানা সমস্যা, সংস্কার ইত্যাদিকে তাঁর গল্পে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তিনি সচেতন থাকেন তাঁর সমসাময়িক জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে। যেমন মানুষের জীবন তথা সমসাময়িক রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁকে সচেতন থাকতে হবে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি হবেন

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক। এ কারণে শিল্পের প্রকাশভঙ্গি ও তার বৈশিষ্ট্য সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। এক যুগের সাহিত্যকর্ম অন্য যুগে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েও ফেলতে পারে। আবার একই ধরনের সাহিত্যকর্ম বিষয় ও প্রকাশ প্রকরণের মাত্রা ভেদে একই যুগে দুরকম মূল্য পায়। "সময়-বদলের সঙ্গে সঙ্গে আসছেন নতুন লেখক, দেখছেন পরিবর্তিত সমাজবাস্তবতাকে, তিনি তো সেই নতুন সমাজবাস্তবতাকেই শিল্পিত করবেন। তাই পুশকিনের সময়ের উপন্যাসিক বাস্তবতাকে নিয়ে ম্যাক্সিম গোর্কি খুশি হতে পারেন নি; গোর্কির দায়বদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ব্যস্তবতা অঙ্গীকার করেও ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধের সময়ে আলেস্কি তলস্তয়কে জীবন শিল্পায়নে নতুন বাস্তবতার মানদণ্ডে পৌঁছাতে হয়েছে।[২] আসলে লেখকের মানস লোকে সমাজ জীবন কল্পনারূপ প্রভৃতি বোধ জাগরিত হয় এবং নানা ভাবে উপাদান সংগ্রহ করে এবং সাহিত্য কর্ম সৃষ্টি হয়। পাঠক শিল্পের আনন্দ পেতে চায়। জীবন জিজ্ঞাসা, কল্পনার রঙ ও মোহ, ইতিহাসের সত্য, সমাজ বাস্তবতার অনুভূতির স্পন্দন পেতে চায়।– "কোনো লেখক স্পষ্ট ভাবনায় হয়ত শিল্পের তাড়নায়ই কাজ করে। ধরে নেওয়া যাক তার পুরোটাই আন্তরিক। এবং তিনি লোক খাঁটি হলে, সেই তাড়নার সঙ্গে জড়িয়ে যাবেই ঐ সব কিছু– অন্তত ইতিহাস এবং সমাজ এবং জীবন।"[৩] একজন সাহিত্যিক সমাজকে বাদ দিয়ে সার্থকভাবে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করতে পারে না। একজন সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে সাহিত্যিকরাও একান্ত হৃদয়ের টানে সামাজিক আবর্তেই তাঁর সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করে থাকেন। সমাজ, পরিবার, সংগঠন, সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে পরিস্ফুটিত হয় সাহিত্যিকদের জীবনবোধ ও মানসলোক। আর এর প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যিকের শিল্পকর্মে। তাই সমাজতাত্ত্বিক অভিনিবেশ সহকারে কোন বিশেষ যুগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে ঐ যুগের সাহিত্য পাঠের মাধ্যমেই তা জানতে পারা যায়। এ সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক ড. নীলিমা ইব্রাহিমের অভিমত স্মরণীয়–

> "Man is social animal and consequently society is reflected in every branch of literature. ..... So if we go deep into the literary works of an age, we are sure to have the social manners and customs and various problems of that age reflected therein."[৪]

যে কোন যুগের সাহিত্য কর্মে সেই যুগের সমাজ ও সংগঠনের সামাজিক স্তর বিন্যাস, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রথা ও জীবিকার উৎস ও নানাবিধ সামাজিক সমস্যার পরিচয় পাওয়া যায়। "শিল্পী ও শিল্পকর্মের এই ইতিহাস ও সমাজ আপেক্ষিক থাকে এবং এর ফলে শিল্প ও শিল্পীর আন্তরবৈশিষ্ট্য, কখনোও বহির্বৈশিষ্ট্য অবশ্যম্ভাবীভাবেই পরিবর্তিত হয়।"[৫] আর এ কারণেই "শিল্পীকে প্রত্যেক ঐতিহাসিক পর্যায়ের সঙ্গে, অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যা, সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক শক্তির সঙ্গে তুলনা করে বিচার"[৬] আবশ্যক।

একজন সমাজ সচেতন সাহিত্যিক সমাজের নানা বাধা-বিপত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে আপন শিল্পী সত্তার স্বাধীন বিকাশের লক্ষ্যে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য প্রতীকী ব্যঞ্জনার

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই প্রতীকী রূপ সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হলেও সমাজের আন্তঃপ্রবাহের ফলে তা 'সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্বজনীনরূপ' পরিগ্রহ করে থাকে। সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে সমন্বয় সাধন, কখনো প্রথার বিরুদ্ধে কটাক্ষ– সেই সাথে লেখকের ব্যক্তিত্ব, বাস্তবতাবোধ ও জীবনমুখী আকর্ষণের সমন্বয় সাধনের ফলে কোন শিল্পীর রচনাশৈলী তথা শিল্পরীতির অন্তরকাঠামো গড়ে ওঠে। আঁদ্রে মোরোয়া বলেছেন–

> "ভাষা ব্যবহার রীতিতে বৈশিষ্ট্য আনয়ন এবং লেখার মধ্যে, লেখকের জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলার সার্থক প্রয়াসই হচ্ছে, স্টাইল বা রচনাশৈলী।"[৭]

সাহিত্যকর্মের মধ্যে লেখকের বাস্তবতাবোধ ও জীবনবোধ সময়ময় ফুটে ওঠে। কারণ শিল্পী যেমন সমাজ বহির্ভূত নন, তেমনি শিল্পীর কর্মও সমাজের বাইরে মূল্যহীন। সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির পিছনে সমাজ ও যুগ বিবর্তনের প্রক্রিয়া এবং মানুষের নিরন্তর শ্রেণি সংগ্রাম সংগঠনের সামাজিক প্রয়োজনই মুখ্য ভূমিকা রাখে। সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে উপমহাদেশের স্বনামধন্য সমাজবিজ্ঞানী এ, কে, নাজমূল করিম তাঁর "সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন–

> "সত্যিকারের সাহিত্য সৃজন করতে হলে সাহিত্যিককে সমাজ-সচেতন হতে হবে। সমাজ-সচেতনতার অর্থ এই নয় যে, সাহিত্যিক কেবল সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই তাঁর সাহিত্যে পরিবেশন করবেন। যেমন বলা হয়েছে যে, এত বড় মহাসমর, দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ সংগঠিত হল, কিন্তু অনেক নামজাদা বনেদী সাহিত্যিক তাঁদের কলম এসব ঘটার আগে যেভাবে চালাতেন সেভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের লেখায় তাই সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ছাপ নাই এবং ছাপ নাই বলে তাঁদের লেখা বাস্তবতা বর্জিত; তাই তাঁদের লেখা সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না। কতক, আধুনিক, সাহিত্যিক সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু লিখে কতক মহলের বাহবা পেলেন। আবার আজকাল সাহিত্যিক মহলে রেওয়াজ চলছে, সত্যিকারের সাহিত্যিকদের মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র না এঁকে নিম্নশ্রেণীর চিত্র আঁকতে হবে– তা হলেই সাহিত্যিক সমাজ সচেতন হলেন। তা মোটেই নয়। সমাজ সচেতনতার অর্থ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে সাহিত্য মানুষকে, ঘটনাকে, জীবন জিজ্ঞাসাকে সমাজ বিবর্তন ও সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করেছে, তাই হল প্রকৃত সাহিত্য।"[৮]

আসলে একজন সচেতন লেখককে সমসাময়িক ঘটনাবলী অনুপ্রেরণাই যোগায় না তা তাঁকে অনুধাবন করে তবে সাহিত্যে প্রকাশ করতে হয়। সাহিত্যের মাঝেই সমাজের বিকাশ। আর সমাজ বিকাশের প্রবহমান ধারাতেই সাহিত্যের মূল উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সাহিত্যিক যদি কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টকর্মে সরাসরি প্রকাশ নাও করেন, তথাপি বাস্তব জীবন চিত্রণের জন্য তাঁর রচনা ঐ সময়কালের তথ্য পাঠকের কাছে তুলে ধরতে সহযোগিতা করবে। এ প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের বক্তব্য স্মরণীয়–

> "I think that the bias should flow by itself from the situation and action, without particular indications, and that the writer is not obliged to obtrude on the reader the future historical solutions of the social conflicts pictured ..... therefore, a socialist-baised novel fully achieves its purpose, in my view, if by conscientiously describing the real mutual relations, breaking down conventional illusions about them, it shatters the optimism of the bourgeois world, instills doubt as to the eternal character of the existing order, although the author does not offer any definite solution or does not even line up openly on any particular side."[৯]

বুর্জোয়া সমাজের সাহিত্য সম্পর্কে এ মত যদিও বা এঙ্গেলস করেছিলেন, কিন্তু এমত সকল যুগের সাহিত্য সম্পর্কেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। সেই আদি যুগ থেকে শিল্প-সাহিত্যের সাথে সমাজের একটা মৌলিক সম্পর্ক সভ্যতার বিবর্তনে রূপান্তরিত হয়েছে। সমাজের শৈল্পিক প্রতিফলনের বিকাশ সাহিত্যেই ঘটে থাকে, যা সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ক্রমবিকাশকে শিল্পরূপ প্রদান করে। এ বিষয়ে বিখ্যাত সমালোচক ক্রিস্টোফার কডওয়েল-এর বাণী স্মরণযোগ্য–

> Art is the product of society, as the pearl is the product of oyster, and to stand outside art is to stand inside society.[১০]

সমাজের সাথে সাহিত্যের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কারণেই সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতার ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে। সাহিত্যের সাথে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য–

> "ইতিহাসের যে কোন বিন্দুতে সাংস্কৃতিক হাওয়া বদলের পশ্চাতে যেমন কালের আন্তর গরজ সংগোপনে ক্রিয়াশীল থাকে, তেমনি ব্যক্তিক ভাবনা-চিন্তা, অনুসন্ধিৎসা, শ্রেয়সের ধ্যান এবং সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিতে ও কালের মর্মবাণী ও অনুশাসনটি আবিষ্কার করা কঠিন নয়। এই একটি সূত্রের মধ্যেই একটি বিশেষ ঐতিহাসিক কালের সঙ্গে আরেকটির, একযুগের মানুষের সঙ্গে আর এক যুগের মানুষের পার্থক্য, মনোভঙ্গিতে ব্যবধান এবং বাচনভঙ্গিগত স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করা সম্ভব।"[১১]

সামাজিক মানুষ হিসেবে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা একটি বিশেষ সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তর বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন।

বর্তমান যুগের সাহিত্যিকগণ তাঁদের রচনায় সামাজিক-রাজনৈতিক বিন্যাস, আন্দোলন, অগ্রগতি ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। "সমাজতত্ত্ব এবং সাহিত্যের সম্পর্ক আবিষ্কারের

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যা আরও অনেক পুরনো হলেও, মার্কসবাদীরাই বাংলা সমালোচনায় দাপটের সঙ্গে এবং একটা বিশেষ শৃঙ্খলা হিসেবে এর ব্যাপক প্রচলন করেন। তাঁদের প্রভাবে আরও অনেকে যাঁদের সঙ্গে মার্কসীয় ভাবধারার কোন যোগ নেই, তাঁরাও সমকালীন সমাজের ভূমিকায় সাহিত্যিককে ও সাহিত্যকে বিচার করতে শুরু করেন। আজ এই পদ্ধতি একটা সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছে।"[১২]

পূর্বেকার সমাজতাত্ত্বিকদের সমাজ-ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদীদের সমাজ-ব্যাখ্যার একটি পার্থক্য বর্তমান। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন :

(১) অর্থনীতিকে ভিত্তি হিসেবে এবং সমাজ-রাজনীতি সংস্কৃতিকে উপরের সৌধরূপে গণ্য করার সম্পূর্ণ ভাবনা একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পায়– যার পারিভাষিক নাম বেস– সুপারস্ট্রাকচার সম্পর্ক। অর্থনৈতিক বিন্যাস অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং উৎপাদন সম্পর্ক [বা শ্রেণী সম্বন্ধ] দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে গোটা সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটায়। একেই বলা হয় দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। অমার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিকরা এই সম্বন্ধগুলোকে গুরুত্ব দিতে চান না অথবা এ বিষয়ে অবহিতই নন।

(২) মার্কসবাদ পরিবর্তমান ইতিহাসকে শুধু ব্যাখ্যাই করে না, ইতিহাস নির্দেশিত পথে সমাজকে বদলাতে চায়। সে কারণে মনে করে সাহিত্যে আর্থ-সামাজিক পটভূমির প্রতিফলন বিশ্লেষণ যেমন জরুরী, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ সাহিত্য যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার বিচার। লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাস মার্কসবাদী সাহিত্য-ভাবনার একটি বিশিষ্ট দিক।[১৩]

যুদ্ধোত্তর পটভূমিতে বিশ শতকের দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দশকে ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশে এক সঙ্কটময় আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় মার্কসবাদী আদর্শ-ভাবনার প্রকাশ ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মন্বন্তর কালোবাজারি প্রভৃতি কঠিন অভিজ্ঞতা, তুঙ্গচারা স্বরাজ আন্দোলন, দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি; একদিকে রাষ্ট্রীয় নব্য আদর্শবাদ আর একদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য। সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি নয়, অর্থনৈতিক পটভূমিতেও পরিবর্তন সাধিত হয়। সহজ কথায়– ঔপনিবেশিক সামন্ততন্ত্র থেকে দেশি পুঁজি ও সামন্তবাদের নতুন আঁতাত এবং ক্রমে সম্পূর্ণ পুঁজিবাদের দিকে তার গতি নিশ্চিতভাবে ধাবিত হয়।

এই যুদ্ধোত্তরকাল লেখকের মানসপটে গভীর রেখাপাত করে। সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটে। তারাশঙ্করের সাহিত্যকর্মে লক্ষ করা যায়– সামন্ত সমাজের ক্রমিক ভাঙ্গন তথা গ্রামীণ শ্রমজীবী ও অন্ত্যজ গোষ্ঠীগুলোর জীবন ও আচরণের বিশিষ্ট রূপকার তারাশঙ্কর ক্রমে অধ্যাত্ম সত্যের ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নিলেন। জীবন সন্ধানী তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পে অতিমানুষিক আত্মরক্ষণের মধ্যেও জীবনের জয়ই ঘোষিত হয়েছে। এও এক প্রকার সামাজিক বাস্তবতার ইঙ্গিত।

Dhaka University Institutional Repository

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মে লক্ষণীয়– মানিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জট ও অভ্যন্তরীণ বিকার, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের অবক্ষয়, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে পৌঁছলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে দেখতে পাই জীবনের সেই তীব্র সংকট–

> "পঙ্গু নায়ক নীলমণির প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার গভীরে আত্মহননের সূচি-তীক্ষ্ণ বিবরণ দিতে দিতে লেখক বলেন, তার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে; পেটের ক্ষুধা, শীত বর্ষা, রোগ বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান,– সে কোন দিক সামলাইবে? সকাল যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখ মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কিসের জোরে'?"[১৪]

সামাজিক পরিবেশে এই বাস্তব জীবনের সংকটবোধই শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌল জিজ্ঞাসা। বিভূতিভূষণ– কোমল পল্লীপ্রাণতা, প্রকৃতি আশ্রয় এবং সহজ সরল বাস্তব জীবন চিত্রণেই তাঁর রচনাকে করেছেন সমৃদ্ধ। সমাজ বাস্তবতা এড়িয়ে সার্থক শিল্পী হওয়া সম্ভব নয়।

সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে যে চিরন্তন সম্পর্ক, ক্ষেত্র গুপ্ত তা ছকের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন–[১৫]

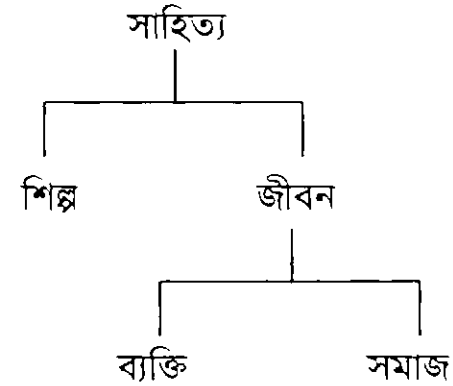

উপরের ছকের সাহায্যে সাহিত্যের সাথে সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

কথাসাহিত্য– উপন্যাস বা ছোটগল্প যাই হোক না কেন সেখানে কোন সাহিত্যিক বাস্তব জীবনের সামাজিক সম্পর্ককেই প্রকাশ করতে চান। তা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো-বা পরোক্ষভাবে। কারণ কথাশিল্পী সমাজ থেকে যে বাস্তবচিত্র মানসলোকে ধারণ করেন, তা কখনোই তিনি হুবহু তাঁর সাহিত্যকর্মে তুলে ধরেন না। সেখানে শিল্পীসত্তা তাঁর কল্পনার রং তুলি দিয়ে সমাজের বহুবধি বাস্তব চিত্রকে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে চিত্রিত করেন। সুতরাং সেখানে সমাজ সত্যের নানাদিকের প্রতিফলন ঘটে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস মোগলযুগের ইতিহাসনির্ভর একটি রোমান্সধর্মী উপন্যাস। বইটিতে প্রত্যক্ষভাবে যদিও সামাজিক বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেয়া হয় নি। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

পরোক্ষভাবে সেখানে সমকালীন সমাজ এসেই গেছে। এখানে বঙ্কিমের কল্পকাহিনীতে দূর অতীতের বর্ণীল বিবরণের মাঝেও সমকালীন সমাজ থাকবেই। তবে এ উপন্যাসে আছে সামাজিক রীতি ও বন্ধন-অতিক্রমী প্রেম, যার বোধ মানসিংহের কালের নয়, বঙ্কিমের সমসাময়িক কালের। এছাড়াও নারী ভাবনা বিশেষ করে নারীর সতীত্ব নিয়ে ভাবনা। মুসলমান রমণীর অন্য বর্ণের বিশেষ করে হিন্দু যুবকের প্রতি প্রণয়, অসবর্ণ বিয়ে। সন্ন্যাসীর পদস্খলন– এ সামাজিক সমস্যাগুলো হয়তো মোগল আমলে ছিল, কিন্তু এসব সমস্যার গুরুত্ব বা মূল্য বঙ্কিমযুগেই প্রাধান্য পেয়েছিল তা সুনিশ্চিত। এ সমস্যাকে বঙ্কিমচন্দ্র একান্তভবে নবযুগের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। বাংলার প্রাচীন গ্রন্থ চর্যাপদে ওই কালের সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র চিত্রিত হয়েছে। যদিও এখনে পদ রচয়িতাগণ অতিলৌকিকতাকে কৌশল করে বাস্তব জগতে বিচরণ করেছেন। এখানে "পদ রচয়িতাগণ তত্ত্ব প্রকাশে কখনো প্রতিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, কখনো আবার বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনা করেছেন সাঁকো রচনার। এই কারণে, পদসমূহ যদিও অন্ধভাষা ও ভাবে রচিত, তবু সাধারণ মানুষের বোধে আঙ্গিনায়, খানিকটা হলেও ধরা দেয়।"[১৬] দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডোম্বী পাদের ১৪নং পদ–

পাঞ্চ কেড়ু আল পড়ন্তে মাঙ্গে পীঠত কাছী বান্ধী।
গঅন দুখোলে সিঞ্চহু পানি ন পইসই সান্ধি॥
চান্দ সূজ্জ দুই চাকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিন দুই মাগ ন চেবই বাহ তু ছন্দা॥[১৭]

এখানে পদনির্মাতা ধর্মতত্ত্বের সিঁউতি দিয়ে বোধি চিত্ত থেকে বিষয় তরঙ্গের জল সেচন করতে বলেছেন। চন্দ্র ও সূর্যকে প্রজ্ঞা ও অদ্বয়জ্ঞান হিসেবে ভেবেছেন। আর সৃষ্টি সংসারের রূপক হল মাস্তুল। এখানে এই কল্পনার মাঝে আছে বাস্তবতার প্রক্ষেপ, আছে নির্বাণ লাভের ইচ্ছে। আসলে একজন লেখক বা সাহিত্যিক যা বাস্তবে দেখেন তা কখনোই সরাসরি সাহিত্যকর্মে উপস্থান করেন না। তিনি তাঁর কল্পনার রং দিয়ে বাস্তবকে উপস্থাপন করেন। এখানে শিল্পী কখনো রূপক বা অতিলৌকিক পন্থায় কৌশলে বাস্তবের দিকে অগ্রসর হন। সে বিচারে অতিলৌকিক অবাস্তবও আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে ধরা দেয়। "শিল্প স্রষ্ট ও ভোক্তার কাছে এই আপাত অবাস্তব, আপাত বাস্তব অর্থাৎ সৃষ্ট মায়া-প্রপঞ্চ বিষয়টি আসলে 'ইচ্ছে পূরণ' এর চিরসহায়ক ছাড়া আর কিছু নয়।"[১৮] সুতরাং এক সমাজ সচেতন সাহিত্যিক সব সময়ই তাঁর শিল্পকর্মে বাস্তবে কোন না কোন ভাবে প্রকাশ করে থাকেন। তা বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে বর্তমান সাহিত্যেও প্রবহমান।

সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে যে সাহিত্যিক সচেতন নন, যাঁর শিল্পকর্মে নেই সমাজ বিকাশেরও বাস্তবতার নির্ভরযোগ্য বিবরণ, তাঁকে কখনো সার্থক শিল্পী বলা চলে না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক নাজমূল করিমের মন্তব্য স্মরণযোগ্য–

Dhaka University Institutional Repository

"সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন এ ধরনের সাহিত্যিকের রচনাকে আমরা আজ মর্যাদা দিতে অপারগ।

সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্পর্ক এখানেই। সমাজবিজ্ঞান সাহিত্য নয়। সমাজ বৈজ্ঞানিক যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক ততক্ষণ সে সাহিত্যিক হতে অপারগ। সাহিত্যিক সমাজ বৈজ্ঞানিক না হলেও, সমাজ বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল হতে হবে, তা না হলে তার সৃজনশীল প্রতিভা ব্যর্থ হবে।"[১৯]

নাজমূল করিমের বক্তব্য থেকেই আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি, সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতার গুরুত্ব কতখানি। একজন সুসাহিত্যিককে কখনোই সমাজ বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য জগতে বিচরণ করা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে তাঁর পথটা কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ। সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক ধারণা এবং শিল্পকর্মে এর প্রতিফলন সম্পর্কে আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা এবার বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী প্রতিভাধর সার্থক ছোটগল্পকার বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, বনফুলের ছোটগল্পের সমাজবাস্তবতা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব। বনফুলের ছোটগল্পে বহুবিধভাবে এবং নানা আঙ্গিকে সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন ঘটেছে। বনফুল তাঁর লেখায় সমাজের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন বিশাল ক্যানভাসে তেল রঙের সমাহারে নয়, বরং নিপুণ শিল্পীর এক রৈখিক স্কেচে। পরবর্তী অধ্যায়ে বনফুলের গল্পগুলোকে সমাজ বাস্তবতার আলোকে বিশ্লেষণ করব।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বর্ষাযাপন : রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯০৮), পৃ: ২৫-২৬

২। রবীন্দ্র গুপ্ত : উপন্যাসে বাস্তবতা : রবীন্দ্রনাথ, (কলকাতা, ১৯৮৭), পৃ: ১০

৩। ক্ষেত্র গুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ– ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব (কলকাতা, ১৯৮৬), পৃ: ১

৪। Neelima Ibrahim : "Society Reflected in 19th Century Bengali Literature", Pierre Bessaignet (ed), Social Research in East Pakistan (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1964), P. 66

৫। সৌমিত্র শেখর : গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ (কলকাতা, ১৯৯৫), পৃ: ১৩-১৪

৬। বিনয় ঘোষ : শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ (কলকাতা, ১৯৮০), পৃ: ৪৩

৭। আঁদ্রে মোরোয়া, লেখকের শিল্প কৌশল, অনুবাদ : আবু জাফর শামসুদ্দীন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৮।

৮। এ, কে, নাজমূল করিম, "সাহিত্য ও সমাজ বিজ্ঞান" এ, কে, নাজমূল করিম স্মারক গ্রন্থ (সম্পাদক মুহম্মদ আফসারউদ্দীন), ঢাকা : সমাজবিজ্ঞন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ: ৩০-৩১

৯। Marx-Engels, On literature and Art (Moscow : Progress Publishers 1976), P. 37

১০। Christopher Caudwell : Illusion and Reality (Bombay : People's publishing House, 1947), P. 12

১১। অরবিন্দ পোদ্দার : রেনেসাঁস ও সমাজ মানস (কলকাতা, উচ্চারণ ১৯৮৩), পৃ: ৯৩

১২। ক্ষেত্র গুপ্ত : পূর্বোক্ত, পৃ: ২

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ: ২-৩

১৪। ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার (কলকাতা ১৯৮৯), পৃ: ৪৭৫

১৫। ক্ষেত্র গুপ্ত : পূর্বোক্ত, পৃ: ৮

১৬। সৌমিত্র শেখর : যাদুবাস্তববাদ, মায়া-প্রপঞ্চ এবং বাংলা সাহিত্যে ইচ্ছে পূরণ; ('নিসর্গ' বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১) সম্পাদক : সরকার আশরাফ, বগুড়া, প্রকাশকাল ২০০৩, পৃ: ৫৪

১৭। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদক) : বুড্ডিস্ট মিস্টিক সঙ্গস্, (১৯৬৬, ঢাকা); ডোম্বীপাদ রচিত পদ, পৃ: ৪৩

১৮। সৌমিত্র শেখর : পূর্বোক্ত, পৃ: ৫৯

১৯। এ, কে, নাজমূল করিম : পূর্বোক্ত, পৃ: ৩১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজবাস্তবতার আলোকে বনফুলের ছোট গল্প-বিশ্লেষণ

সমাজবাস্তবতা আমাদের মধ্যে কতগুলো ধারণার জন্ম দেয়। যেমন, সমাজ মাত্রই শ্রেণীবিভক্ত। সেখানে সবল আর দুর্বলের লড়াই। স্বভাবতই সবলের হাতে দুর্বল ক্রমাগত লাঞ্ছিত। আর অত্যাচার যেখানে থাকবে সেখানে প্রতিরোধের একটা দিক থাকবে। এই লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর প্রতিরোধের চিত্র নিয়েই মূলত সমাজ সচেতন রচনা তৈরি হয়, আর এর রচয়িতারা হলেন যথার্থ প্রগতিশীল। কিন্তু এই কথিত প্রগতিশীলতা বনফুলের রচনায় নেই। তিনি সমাজবাস্তবতার কোন ছকবাঁধা নিয়ম দিয়ে গল্প লেখেন নি। তাঁর জানা ছিল যে মানুষকে নিয়েই সমাজ; তাই নানারকম মানুষের ছবি আঁকা মানেই সমাজকে তুলে ধরা। তিনি নিজেই এই দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমাদের জানিয়েছেন : 'মানুষই আমার বিষয় এবং প্রেরণা। আমার লেখায় একটা মেসেজ বা বলবার কথা আছে। সেটা হল মানুষ বহু বিচিত্র। মানুষকে অনুসরণ করে আমি আমার লেখার নিত্য নতুন বিষয় ও ভঙ্গি আবিষ্কার করেছি।'[১] তাই বনফুলের রচনায় সমাজের শ্রেণিবিভক্তি, শ্রমিক শ্রেণির ঐক্যবদ্ধতা কিংবা তাদের প্রতিরোধ স্পৃহা তথা শ্রেণিসংগ্রাম এসব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাঁর গল্পগুলোতে রয়েছে সমাজের বাস্তব জীবনের বহুবিচিত্র দিকের সমাহার। সমাজবাস্তবতার আলোকে গল্প বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রথমে 'মানুষ' গল্পটি আলোচনা করা যায়। 'মানুষ' গল্পটি বনফুলের জীবনাদর্শকে বোঝাবার জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে। গঙ্গাবক্ষে অস্তায়মান সূর্যের রশ্মিচ্ছটায় ভাবাবিষ্ট চোখে পৃথিবীটাকে একটি স্বপ্নলোক বলে মনে হয়। তৃণাঞ্চিত শ্যামল তীরে দেবালয়, রোমন্থনরত নধর দেহ গাভী, মুদিত নয়ন মার্জার, নহবতে পূরবীর আলাপ– সবকিছু মিলিয়ে কি সুন্দর এই পৃথিবী! কিন্তু বাস্তবতার আঘাতে এই স্বপ্নের ঘোর কাটলে জীবনের আরেকটি রূপ চোখে পড়ে। দেবালয়ের স্বর্গীয় পরিবেশের পাশেই কুষ্টব্যাধিগ্রস্ত একটি লোক আর স্বাস্থ্যবতী এক যুবতী– ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে– একই উদ্দেশ্যে। ক্ষুধার অন্ন চাই,

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষা তাদের ব্যবসা। সে ব্যবসায়ে একজন মূলধন করেছে ব্যাধিটাকে, আরেকজন যৌবনকে। দেখা গেল মুদিত নয়ন মার্জারটি তপস্যায় রত ছিল না, ছিল ওৎপেতে। ওটা তার ইঁদুর ধরার ছলমাত্র। মাতৃস্তনাভিমুখী গোবৎসটিকে বঞ্চিত করে নধরদেহ গভীর দুগ্ধ দোহন করছে মানুষ নিজের প্রয়োজনে। ইঁদুরের চিৎকারে আর গোবৎসের আকুতিতে সন্ধ্যাকাশের শান্তি বিঘ্নিত হল। কিন্তু ওটাও প্রকৃতির একটা দিক মাত্র। সদ্যমৃতবৎসা জননী অন্যের নবজাত সন্তানের কল্যাণ কামনা করছে। বহুবাধা সত্ত্বেও সতী মৃত-স্বামীর চিতায় পুড়ে মরছে। বহুবার বিফল হয়েও এভারেস্টে দুঃসাহসীর অভিযান বন্ধ হচ্ছে না। কিন্তু ওখানেও শেষ নয়, স্বার্থপর মানুষের কাছে ন্যায়-অন্যায়ের চেয়ে তার স্বার্থসিদ্ধিই বড়। আর সৌন্দর্য-চেতনাকেও উপভোগের আনুকূল্যের জন্যে নেমে যেতে হয় গলির মোড়ে। এই আকাশ ও গলি; এই সুন্দর ও কুৎসতি, এই দুঃসাহ-সী মহৎ প্রেরণা ও আত্মরত প্রাণ ধারণের গ্লানি,—এরই নাম মানবজীবন, স্বর্গ নরক একই সঙ্গে বুকে ধরে এই যে নিত্য প্রকাশমান প্রকৃতি— এরই নাম মানুষের পৃথিবীর। আর এই মানুষের সমাজ, আচার-আচরণের মাঝেই সমাজবাস্তবতার প্রকাশ। বনফুলের গল্পে নানাভাবে সমাজের বাস্তবচিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। নিচে এসবের ক্রম উল্লেখ করা হল :

মধ্যবিত্ত জীবন

বনফুলের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের জীবনযাপন বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। যে সমাজে এই শ্রেণীর বসবাস, সেই সমাজকে হিসেবে রেখে এই মানুষগুলোকে চলতে হয় প্রতিনিয়ত। এখানে তাই ব্যক্তিক হৃদয়াবেগ প্রায়শ তুচ্ছ হয়ে যায় অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে। পিতার কাছে পুত্র হারানো বেদনার চেয়েও অর্থ অপচয়ের পরিতাপ মুখ্য হয়ে ওঠে। এ রকম একটি গল্প 'বাড়তি মাশুল'। এই গল্পে আমরা দেখি এক পুত্রহারা পিতাকে, যে পুত্র হারানোর বেদনার চেয়েও অর্থ অপচয়ের পরিতাপে দগ্ধ হয়। সে ট্রেনের ডেলি প্যাসেঞ্জার। বহুদিন আগে তার এক ছেলে তারকেশ্বরে মেলা দেখতে গিয়ে ভীড়ে হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাকে পাওয়া গেল না। আজ হঠাৎ মনে হল বম্বে মেলে তার মুখখানি দেখা গেল। তাড়াতাড়ি বম্বে মেলে উঠে পড়লেন তিনি। ট্রেন ছেড়ে দিল। ছেলেটির পাশে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'এতদিন কোথায় ছিলি— আমাকে চিনতে পারিস?' (১খ, ৩পৃ)[২] ছেলেটি হিন্দি উত্তর দিল— "হামরা নাম পুঁচতে হেঁ?" পাশে এক বৃদ্ধ বসা ছিল। তিনি বললেন— "হামারা লেড়কা হ্যায় বাবুজি, আপ কেয়া মাঙতে হেঁ।"—ভদ্রলোকের সমস্ত মনটা ভেঙে গেল— মনে হল তিনি দ্বিতীয় বার পুত্রহারা হলেন। যে আশা নিয়ে বম্বে মেলে উঠেছিলেন সে আশা গেল ভেঙে। এরপর

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বর্ধমানে নেমে গেলেন। তাকে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হল। লেখক এখানে দেখাতে চেয়েছেন মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, যা আসলে ওই সমাজেরই বাস্তবতা।

'অজান্তে' গল্পটিতে ফুটে উঠেছে সমাজজীবনে মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের সংসারে মানুষের সামান্য সুখের ছন্দপতন ঘটলে কতটা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। নিজের অজান্তেই সে অনেক অন্যায় করে বসে। এ গল্পটিতে দেখতে পাই অফিস ফেরত ভদ্রলোক মাস শেষে মাইনে পেয়ে বউ এর জন্য নতুন জামা কিনে বাড়ি ফিরছে। মনে আনন্দ বউ খুব খুশী হবে। অন্য মনস্ক হয়ে হাঁটছেন। গলিটা ছিল অন্ধকার। এমন সময় একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। জামাটা পড়ে গেল কাঁদায়– আর দুজনই পড়ে গেল– অফিস ফেরত ভদ্রলোক জামাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রাগে অন্য লোকটিকে লাথি মারতে দ্বিধা করেনি। হৈ চৈ শুনে আলো নিয়ে লোকজন এসে বলে ব্যাপার কি মশাই? সব দেখে শুনে লোকটি বলল– ওকে আর মারবেন না। ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী, এই গলিতেই থাকে। ভদ্রলোক তাকিয়ে দেখে কাঁদা মাখা গায়ে বেচারা কাঁপছে। আর কাতর মুখে অন্ধ দৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় করে আছে। এখানে ভদ্রলোক নিজের অজান্তে একটা বড় ধরনের অপরাধ করলেন। এমন ঘটনা সমাজে চলতি পথে অহরহ ঘটছে। তাঁর কষ্টের উপার্জিত অর্থে কেনা জিনিসটি নষ্ট হয়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে অনেক সময় বড় ধরনের অন্যায় করে থাকে– যা আমরা 'ক্যানভাসার' গল্পে দেখে থাকি।

'সমাধান' গল্পে দেখতে পাই নীহাররঞ্জন বিয়ে করেছেন পল্লীবালা ক্ষান্তমণিকে। বৎসরান্তে তাদের ঘরে ১টি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে। বৌ তার নাম রাখেন বুচি। মেয়েটি দেখতে কালো তারপর একটা চোখও ছোট। তাছাড়াও কেমন বোকা হাবা ধরনের মুখে সর্বদা লালা করে। নীহাররঞ্জন মেয়েটির একটি সুন্দর নাম রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সবার আপত্তি। অমন মেয়ের সুন্দর নাম হয় নাকি? বুচিকে নিয়ে সবার চিন্তা বড় হলে বিয়ে দিতে অনেক কষ্ট হবে, অনেক টাকার যৌতুক দিতে হবে। দুবছর পর ক্ষান্তমণি বুচিকে নিয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। রবিবার ছুটির দিন তাই জমেছে আড্ডা। নানার কথার ফাঁকে বুচিকে নিয়ে সেই একই আলোচনা। সকলেরই ঘোরতর দুশ্চিন্তা। এমন সময় পিওন এসে নীহারকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। নৃপেন বলল "কার চিঠি হে?" (১খ, ১২ পৃ:) চিঠি পড়ে নীহার বললেন, বউ লিখেছে–" বুচি মারা গেছে।" (১খ, ১২ পৃ:) মেয়েটি মরে যেন সকলকে দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository
শোকের মাঝে যেন স্বস্তির ছোঁয়া। আমাদের সমাজে এমন ঘটনা মাঝে মাঝে সকলের চোখে পড়ে।

'ক্যানভাসার' গল্পে সমাজের করুণ বাস্তব চিত্র হাস্যরসের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। বাস্তব কত কঠিন তা এই গল্পটিতে লেখক সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। কর্তা বেকার ভৈরব স্ত্রী কাত্যায়নীর শৌখিন শাড়ির শখ মেটাতে অক্ষম। মেজাজ মর্জি ভীষণভাবে বিগড়ে আছে। এমন সময় আবির্ভাব ক্যানভাসার হীরালালের। 'মাজন আছে– ভাল দাঁতের মাজন'– হীরালালের কথা শুনে আরো মেজাজ বিগড়ে গেল ভৈরবের। দীন দরিদ্র পল্লীর মানুষগুলোকেও এরা রেহাই দিবে না। হীরালাল কিছু বিসনেসের আশায় ঘুর ঘুর করতে লাগল। তাঁর দাঁতগুলো বেশ ঝকঝকে, বার বার হেসে মাজনের গুণ কীর্তন করছে। বিরক্ত হয়ে ভৈরব হীরালালের গালে এক চড় বসাল এবং হীরার নকল দাঁত এক পাটি মাটিতে ছিটকে পড়ল। এখানেই শেষ নয়; প্রহারের পরেও মুখে হাসি টেনে ক্যানভাসার করুণ সুরে বলছে,– "কেন মারধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ এই করে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে।" (১খ, ১৬৪ পৃ.)

'পাশাপাশি' গল্পটিতে সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরে। দারিদ্র্যের জ্বালা, বেকারত্বের কষ্ট সব এড়াতে বিকাশ বাবু প্রতিদিন সকালে তাড়াহুড়ো করে বেড়িয়ে পড়ে। সন্তান ও স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে। গ্রাম থেকে আগত গল্পের মূল চরিত্র বিকাশ বাবুর বাসায় উঠেছেন একটা চাকরির সন্ধানে। কিন্তু কথা বলার অবকাশ পাচ্ছিলেন না, বিকাশ বাবু বড় ব্যস্ত, সকালে নাকে মুখে খেয়েই অফিসে, ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। সুতরাং সকাল বেলা তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়তে হয়, রাস্তায় পথ চলতে চলতে কথা বলা যাবে। তখন জানা গেল তিনি অফিসে যাচ্ছেন না। যাচ্ছেন ইডেনগার্ডেন, তবুও তাড়াহুড়ো। সেথার খালি বেঞ্চিটা দখল হয়ে যাবে। বিকাশ বাবু এম.এতে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েও চাকরি যোগাড় করতে পারেন নি। বাবার রেখে যাওয়া কিছু টাকা সুধে খাটিয়ে সংসার চলে। ঘরে সবাই জানেন একটা অফিসে বিনা বেতনে কাজ করছেন, কিছুদিন পর চাকরি পার্মানেন্ট হবে। গ্রাম থেকে আসা ভদ্রলোক আর নিজের কথা বলতে পারলেন না। দুজনে পাশাপাশি দ্রুত হেঁটে চলছেন– ইডেন গার্ডেনের খালি বেঞ্চিটা না হাতছাড়া হয়ে যায়। সমাজের বাস্তব চিত্র গল্পটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

'হাসির গল্প' নামক গল্পটিতে বনফুল এই পৃথিবীতে মানুষের নিয়তিকে তুলে ধরেছেন। 'হাসির গল্পে'র নায়ক হরিহরের জীবনটিতে করুন রস মূর্ত হয়ে উঠেছে। নিজের অসুস্থ অসুন্দর দেহটি ব্যাধি জর্জর; পাশেই একটি মেয়ে রোগশয্যায় শায়িত, বারান্দায় আর

Dhaka University Institutional Repository

একটি শিশু ক্রন্দনরত, গৃহিণী রণচণ্ডী, দ্বারে পাওনাদার মুদির অশ্রাব্য কটূক্তি। এই পরিবেশে হাতলভাঙ্গা চেয়ারে বসে গরম জলে পা দুটি ডুবিয়ে 'ফুটবাথ' নিতে নিতে হরিহর কাগজ কলম নিয়ে গল্প লিখতে বসেছেন। অসম্ভব মাথা ধরেছে। বাঁ হাতে রগ দুটি টিপে ধরে হরিহর নির্মীলিত লোচনে চিন্তা করতে লাগলেন। আজই লিখে দিতে হবে। সম্পাদক মহাশয় তাগিদ দিয়েছেন। নিজের তাগিদও প্রবলতর। ভ্রুকুঞ্চিত করে হরিহর একটি গল্পের প্লট ভাবতে লাগলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁর নাম। যে ব্যক্তিটি নিজে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। আনন্দের লেশমাত্র নেই যার জীবনে তাকে লিখতে হয় হাসির গল্প; যা অন্যকে আনন্দ দেবে, নিয়তির কি পরিহাস– লেখক এ গল্পে তারই বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। এ গল্প প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন– "আর যাই হোক, 'হাসির গল্প'কে হাস্যরসের গল্প কথা বলে কেউ মনে করবেন না। করুণ রসের কুহরে কুহরে প্রবহমান হাস্যরসের অন্তপ্রবাহ মানবজীবনের সেই নিয়তিকে পরিস্ফুট করেছে যাকে বিদগ্ধ লেখক বলেছেন- 'mingled heritage of tears and laughter that is our lot on earth.'[৩] এখানে মধ্যবিত্ত জীবনের নির্মম পরিহাসই প্রাধান্য পেয়েছে।

'ঋণশোধ' গল্পে আমাদের বাঙালির চরিত্রই ফুটে উঠেছে। গল্পে ছকুর একটি ঘড়ির দোকান আছে, তার দোকানে এক ভদ্রলোক প্রায়ই আসেন তার পাওনা টাকা আদায়ের জন্য। কিন্তু ছকু দিচ্ছে না, আর তিনি চাইতে পারছেন না। তাঁর বুদ্ধি এবং টাকাতেই ছকুর দোকান এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বছর পাঁচেক আগে ছকুকে পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন দোকানের জন্য। কিন্তু তা সে ফেরত দেয় নি। যেটুকু পাওয়ার আশা ছিল তাও শেষ হল সেদিন এক কাস্টোমারের সাথে ব্যবহার দেখে। এক লোক একটি ঘড়ি কিনে নিল– পরে সে ফিরে এল ঘড়ির পিছনে একটি দাগ, বিয়েতে দেবে বলেই পাল্টানো। কিন্তু ছকু বলল, সে বদলে দিতে পারবে না। নেবার সময় দেখে নেন নি কেন, শেষে ভদ্রলোক বাধ্য হয়ে আরেকটি ঘড়ি কিনল। পরে ছকু বলল, একটি বিদেশী ঘড়ির দোকানে সে একটি ঘড়ি কিনেছিল বিয়েতে উপহার দেয়ার জন্য কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি এল ঘড়িটা হাতে পরে বেড়াতে গেল এবং ফ্যানের সাথে লেগে কাঁচ ভেঙে গেল– সন্ধ্যায় দোকানে গিয়ে বলল নেয়ার সময় দেখে নি যে কাঁচ ভাঙা তখন সে দোকান থেকে ঘড়ি বদলে দিল। তখন সে বুঝেছে, বিদেশীদের দিন শেষ, ছকুর এ কথায় বোঝা গেল– তার কাছ থেকে টাকা পাওয়ার আশা নেই। একদিন ছকুর বাসায় গিয়ে দেখে বাদল স্যাকরা বসে আছে। কি ব্যাপার বলতে বলল– ছকুর স্ত্রীর জন্য পাঁচশত টাকা দিয়ে গয়না গড়েছে, তখন ভদ্রলোক বলল টাকা পেয়ে গেছতো? 'আজ্ঞে হ্যাঁ'। শুনে ভদ্রলোক সান্ত্বনা পেলেন। তার পাঁচশত টাকা পাওয়া হয়ে গেছে। কারণ ছকু তার জামাই। আর তার মেয়েকেই গয়না গড়ে দিয়েছে। বাবা চিরকাল সন্তানের সুখেই সুখী হন। গল্পে আছে এ সমাজের একটি খণ্ডচিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

'ফরেন মানি' গল্পটি দেখতে পাই গোবর্ধন বেকার; ঘরে তার সুন্দরী বউ। বউটি তার কাছে নানা রকম জিনিসের বায়না করে। কিন্তু আবদার মেটাতে পারে না। একদিন চিংড়ি মাছ খেতে চাইল। বন্ধু যোগেনের কাছ থেকে দশ টাকা ধার করে বাজারে গিয়ে চিংড়ি মাছ পেল না। সব বিদেশে চালান হয়ে গেছে ফরেন মানি আর্ন করতে। এখন এদেশের ভাল সব কিছুই বিদেশে গিয়ে ফরেন মানি আর্ন করছে। ভালো ভালো ছেলে মেয়েরাও বিদেশে গিয়ে 'ফরেন মানি' রোজগার করছে। গোবর্ধন বাজার থেকে ছোট মাছ এনে বিষয়টা বউকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। বউ ছোট মাছ খেতে পারে না গলায় কাটা বেঁধে। এর মাস খানেক পর গোবর্ধন বাড়ি ফিরে দেখে বউ বাড়িতে নেই। একখান চিঠি লিখে রেখে গেছে– 'আমিও ফরেন মানি আর্ন করতে চললাম' (৩খ, ৮ পৃ.)। লেখক এখানে বুঝাতে চেয়েছেন দেশের মানুষের এখন স্বদেশ প্রীতি কমে গিয়েছে, তারা এখন বিদেশের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।

'কুমার সম্ভব' গল্পটিতে আছে আমাদের সমাজের মানুষের পরিকল্পনা বিহীন কাজের নমুনা। যেখানে জনসংখ্যা একটা প্রধান সমস্যা। সেখানে পরিকল্পনা করে ঘর না সাজালে, সংসারে অভাব অনটনের শেষ থাকে না। আর অভাব মানুষ হীন করে তোলে। গল্পে এক ভদ্রলোক লেখকের কাছে এসে তার লেখার খুব প্রশংসা করলেন। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও বেশ মনমুগ্ধকর কথা বললেন। এর মধ্যে রোগী এসে পড়ায় কথা জমল না। তখন ডা. বাবুর বাড়ির ঠিকানা চেয়ে নিলেন। এরপর সন্ধ্যায় তিনি যখন ডাক্তারের বাড়ি এলেন তখন ডাক্তার বাবু কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' পড়ছিলেন। ডাক্তার ভাবলেন ভালই হল, আলোচনা জমবে। তিনি বললেন "কালিদাসের উপমা সত্যিই অপূর্ব। শুনবেন একটু।" (৪খ, ২৮৮ পৃ.) পড়তে লাগলেন। কিন্তু ভদ্রলোক মুখ সুচালো করে বাইরে চেয়ে আছেন। পরে বাংলা অর্থ করে বললেন, তাও কোন ভাবান্তর নেই। তখন বললেন–'কুমার সম্ভব' ভাল লাগছে না। উত্তরে ভদ্রলোক বললেন– 'ও পড়ে আর কি করব। আমি কুমার সম্ভবের চূড়ান্ত করেছি। আর ভাল লাগে না।' (৪খ, ২৮৮ পৃ.) 'কালিদাস তো একটি কুমার সম্ভব করেছেন। আমি করেছি এগারটি। এগারটি ছেলে আমার। গৃহিণী দ্বাদশ গর্ভভার বহন করছেন, জানি না, এবার কুমার না কুমারী কে আসছেন।' (৪খ, ২৮৯ পৃ.) এবার ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর বদলে গেল। বলল– "বড়ই বিপদে পড়েছি মশাই। দুবেলা খোরাক জোটাতে পারি না। শুনেছি, আপনি সদাশয় লোক, যদি কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারেন বড়ই উপকৃত হব।" (৪খ, ২৮৯ পৃ.), এ আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র। ঘরে যখন এক গাদা ছেলে-মেয়ে, তখন তাদের খাবার যোগাড়ের জন্য মানুষের কাছে নানা কৌশল করে হাত পাততে দেখা যায় পরিকল্পনাহীন মানুষকে।

'শ্রীনাথ পণ্ডিত' গল্পে আপাত দৃষ্টিতে এক গ্রামীণ স্কুলের শিক্ষকের চিত্র ফুটে উঠলেও তার পিছনে লুকিয়ে আছে মানুষের জীবনের উত্থান পতন, অনেক সময় মৃত্যুর কারণ

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে। গল্পে মণিহারী স্কুলের নতুন হেড পণ্ডিত শ্রীনাথ বাবু। ভদ্রলোককে দেখলে মনে হয় এককালে বেশ মোটাসোটা ছিলেন, এখন গায়ের চামড়া ঝুলে গেছে। যদিও স্কুলের বেতন কুড়ি টাকা কিন্তু তাকে দেয়া হয় ষোল টাকা। শ্রীনাথ বাবুর পড়ানোর বিশেষ দিক– তিনি কোথায় ভাল খাবার পাওয়া যায়, কখন ভাল কোন ফলের সময়– এটাই যেন মুখ্য বিষয়। তাতে বোঝায় পণ্ডিত মশায় ভোজন রসিক লোক। কিন্তু তিনি ভাল খেতেন না কারণ তিনি বেতন পেয়ে পুরো বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। এবং খগেন মৌয়ারের বাড়িতে জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্র লেখার বিনিময়ে খেতেন। ডাল, ভাত, একটা ভাজা, কখনো তরকারি। একদিন অবশ্য খাওয়ার সুযোগ এল নবাবগঞ্জের জমিদার ফুয়াদি সিংয়ের বাড়িতে। পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে নিমন্ত্রণ। আয়োজনও প্রচুর। সকলের সাথে শ্রীনাথ বাবু গেলেন মহাউৎসাহে। তার খাওয়া দেখে সকলের তাক লেগে গেল। কিন্তু ফিরলেন তিনি চারজনের কাঁধে করে। আহারের পর ভেদবমি শুরু হয়েছিল। অনেকদিন পর ভাল খাবার দেখে তিনি যেন দিশেহারা হয়েছিলেন। যার পরিণামে তাকে প্রাণ দিত হল। পরে জানা গেল শ্রীনাথ বাবু এককালে বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। বাড়িতে খাওয়ার কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ ব্যাংক ফেল করায় সর্বস্বান্ত হন। তখন বাধ্য হয়ে চাকরিটা নিয়েছিলেন। কার ভাগ্যে কখন কি ঘটে তা বলা মুশকিল।

'পোস্টকার্ডের গল্প'টি অতি ক্ষুদ্র পরিসরে লেখা। তবু এর মাঝে লুকিয়ে আছে জীবনের কঠিন বাস্তব। গল্পে এক ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী গভীর রাতে ঘরে কথা বলছিল। স্ত্রী তার স্বামীকে বলল– "তুমি আমাকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখেছ কেন। আমার বড় লজ্জা করে।" (৪খ, ৩৭৩ পৃ) সাথে এও বলল, পাশের বাড়ির রানীর স্বামী খামে বড় চিঠি লেখে। তখন স্বামী স্ত্রীকে তার চিঠি বের করতে বলল। সেখানে তার আবেগের কথা আছে; ভালবাসার কথা আছে। কিন্তু সংক্ষেপে। সে আসার সময় স্ত্রীর জন্য কুলো এবং চুপরি নিয়ে এসেছে। যদিও এখনো তার চাকরি হয় নি। সে স্ত্রীকে আসল কথাই বলে নি– কুলো আর চুপরি কিনে বাস ভাড়া রেখে আর খাম কেনার পয়সা ছিল না তাই পোস্টকার্ড কিনেছে। এরপর তার একটা বিড়ি কেনার পয়সাও ছিল না। তাদের সমাজে বেশির ভাগ মানুষই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তবু সে কষ্ট করে ভালবাসার মানুষের জন্য শখের জিনিস কিনেছে। তাই তাকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখতে হয়েছে। এ গল্পে বনফুল সমাজের বাস্তব সত্য সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। 'পোস্টকার্ডের গল্প' প্রসঙ্গে বীতশোক ভট্টাচার্য বলেছেন–

> "এ ছোটগল্পের স্বামী-স্ত্রী দরিদ্র অনতিশিক্ষিত অনভিজাত রুচির (রঙিন কাগজে সবুজ কালির লেখা সুন্দর মনে করে এমন) মানুষ, আধুনিক উচ্চবিত্ত উচ্চশিক্ষিত নাগরিক দম্পতির মতো তারা বিচ্ছিন্নতার শিকার নয়, অথচ তারাও পরস্পরকে

Dhaka University Institutional Repository

বুঝতে চায় কিন্তু একে অপরকে বুঝতে পারে না, একজন আরেকজনের কাছ থেকে মনের কথা লুকিয়ে রাখতে চায়, মনে হয় যেন পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অন্য নাম দাম্পত্য সংলাপ।"[৪]

আসলে মধ্যবিত্ত জীবনের এই অর্থনৈতিক টানাপোড়েন সংসারে ভুলবোঝার প্রধান কারণ; সাথে অবশ্যই একটা মনোস্তাত্ত্বিক দিক লুকানো থাকে।

'পুনর্মিলন' গল্পে আমাদের সমাজের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে এক কেরানীর বাল্যবন্ধুর সাথে পুনর্মিলনের কথা বলা হলেও– গল্পে আছে দরিদ্র কেরানীর জীবনচিত্র– অভাব, অনটন, ঘরে বিবাহ যোগ্য মেয়ে। এতো আমাদের চার পাশের নিত্য নৈমিত্তিক চিত্র। গল্পে দরিদ্র কেরানীর সাথে হঠাৎ দেখা হল তার বন্ধু ছবির সাথে। ছবি তার চেহারার হাল দেখে তার মধুপুরের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গেল, এবং একমাস ভাল খাওয়াল। ছবি একজন ডাক্তার, তবে সে বিয়ে করে নি। একাকি জীবন যাপন করে। এ একমাস বন্ধুর সঙ্গ পেয়ে তার জীবন ভরে উঠল। ছবির বাগানে নানা জাতের ও রঙের ফুল আছে। একটা অদ্ভুত সুন্দর জংলি ফুল ফুটেছে। সেখান থেকে আসার সময় ছবি তাকে এক তোড়া টাকা হাতে গুঁজে দিল এবং বলল "ভাল করে খাবি। তুই বেঁচে থাকলে আমারও জীবনের একটা সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আমার কেউ নেই, আমি একা।" (৪খ, ৩৮১ পৃ.) ছবি আর্তনাদ করে উঠল। আর প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা সে পাঠাবে তার ভাল খাওয়ার জন্য। ছবির চাকর টুকরা–তাকে সেই অদ্ভুত ফুলের বিচি দিল একটা। কিন্তু বাড়ি ফিরে পরিবারে নানা সমস্যায় ভুলে গেল বিচির কথা। দিন পনের পর খুঁজে পেল না। এরপর আর মধুপুরে যাওয়া হয় নি। ছবি টাকা পাঠাত। ভাল খাওয়া রোজ হত। এভাবে একবছর কেটে গেল– হঠাৎ খবর এল ছবি আত্মহত্যা করেছে। ছুটে গিয়ে দেখে– দাহ হয়ে গেছে। সে লিখে গেছে– "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমি সুখী ছিলাম না, তাই আত্মহত্যা করেছি।" চিঠি খানা পুলিশের কাছে আছে। এর মাস দুই পরে ছবির উকিলের পত্র এল– ছবি তাকে দশ হাজার টাকা ও একটি চিঠি দিয়ে গেছেন। "ভাই, সতু, আর ভাল লাগছে না। এবার চললুম। তোর জন্য দশ হাজার টাকা রেখে গেলুম, ভাল করে খাওয়া দাওয়া করিস। ইতি–ছবি।" টাকা দিয়ে দরিদ্র কেরানী তার মেয়ের বিয়ে দিলেন। হঠৎ একদিন মেজ ছেলে এসে বলল– ওদিককার ওই আস্তাকুঁড়টায় কি সুন্দর একটা ফুলের গাছ হয়েছে দেখবে চল। গাছটি দেখে কেরানীর মন হল ছবির সাথে তার আবার দেখা হল। ছবির চরিত্রটা ফুলের মত। যার সৌরভ অন্যকে বিলিয়ে দেয়। যদিও এখানে এক মধ্যবিত্ত কেরানীর টানাপোড়েনের সংসার জীবনের চিত্র আমরা দেখতে পাই। তার মধ্যে দিয়ে আর দেখতে পাই সমাজের একজন নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনচিত্র।

'বিলাস প্রসঙ্গ' গল্পে দেখতে পাই একজন চাকরিচ্যুত মানুষের বিড়ম্বনা। ঘরে বাইরে যাকে বলে উভয় সঙ্কট। 'বিলাস' গল্পের প্রধান চরিত্র বিলাস বাবু উচ্চপদে চাকরি

Dhaka University Institutional Repository

করেন। চাকরির কাজে তাকে পশ্চিমের একটি শহরে প্রায়ই আসতে হয়। সেখানে তার তিন বন্ধু আছেন। একজন সহধর্মী, একজন সহপাঠী আর একজন সহকর্মী। ভাগ্য দোষে চাকরিটি গেছে। সহকর্মী সতীশ বাবুর স্ত্রীর ধারণা বিলাস বাবু চেষ্টা করলে চাকরিটি আবার পাওয়া যায়। বিলাস বাবু মুক্ত হস্ত, ভুলোমন, হুজগপ্রিয় সামাজিক মানুষ। তিনি এ শহরে ট্যুরে এসে ওঠেন তার সহপাঠী অতুলের বাসায়। সেখানে সুটকেশটা রেখে গাড়ি যোগাড় করে বেরিয়ে পড়েন সবার সাথে দেখা করতে। প্রথম যান সহধর্মী নিমাই বাবুর বাসায়। দুজনেই পক্ষী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে ভালবাসেন। সুতরাং গঙ্গার চরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মনে পড়ল চারটায় সতীশের বাসায় নিমন্ত্রণ। তাড়াতাড়ি ছুটবেন। গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। ঠেলে স্টার্ট নিল কিন্তু বাসায় ফেরার পথে ডা. নিতাইকে তার বাসায় নামিয়ে অতুলের বাসায় এসে দেখেন সতীশ অজ্ঞান। আবার ছুটলেন নিমাইয়ের কাছে যে সতীশ হার্টফেল করেছে। নিমাই গিয়ে একটা ইনজেকশন দেবার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হলেন। তখন তিনি আসল কথা বললেন। যখন দেখলেন সাড়ে চারটায় বিলাস আসছে না তখন তার স্ত্রী তাকে অতুল বাবুর বাসায় পাঠান। অতুল বাবু বললেন– বিলাস এলে তিনি নিয়ে বের হবেন। সুতরাং বাসায় যান। বাসায় গেলে স্ত্রী আবার পাঠালেন সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। আবারও অতুল বাবুর এক কথা। তিনি তার বাসায় অপেক্ষা করতে দিতে চান না। এতটা পথ এ আসা যাওয়া করে কেমন মাথাটা ঘুরে গেল। সবাই মিলে সতীশের বাসায় গিয়ে দেখেন তখনও সিংগারা, কচুরী সব গরম আছে। এখানে চাকরিচ্যুত লোকের সে কি বিড়ম্বনা, স্ত্রীও কথা শুনতে চায় না, বন্ধু চায় না। রাতে অতুলের বাড়ি ফিরে এলেন– বিলাসের স্টেনো কয়েকটি ফাইল নিয়ে হাজির। এগুলো জরুরি ভিত্তিতে আজই পাঠাবার কথা। ডাকের সময় চলে গেছে। বিলাস বাবু বললেন চিন্তা নেই শেষ ট্রেন কটায়। জানা গেল রাত দুইটায়। বিলাস বাবু বসে গেলেন কাজে। রাত সাড়ে বারটায় কাজ শেষ করে বললেন– ওয়াইলড গুজের সন্ধানে বেরিয়ে ছিলাম। তার দেখা পেলাম না। আসলে গল্পে আছে একজন আমোদপ্রিয় মানুষের কথা আর সাথে আছে সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তব পরিস্থিতি প্রসঙ্গ।

'ক্ষীর' গল্পে আছে আমাদের এ সমাজের একটি খণ্ডচিত্র। আমাদের চারপাশের পরিবেশ এত অস্বাস্থ্যকর থাকে যার কারণে রোগব্যাধি-জরা লেগেই থাকে। তখন ক্ষীরের মত সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর খাবারও খাওয়ার মত পরিস্থিতি থাকে না। 'ক্ষীর' গল্পে পাড়াগাঁয়ের এক চাষা পীতাম্বর। সে মুক্ত পরিবেশে সুস্থ জীবন যাপন করে। হঠাৎ তার মন অধীর হল ছোট ভাই নীলাম্বরের জন্য, দশ বছর তাকে দেখে নি। নীলু কলকাতায় থাকে। কলেজে পড়েছে। এখন কেরানী। বিয়ের পর তিনটে ছেলে-মেয়ে হয়েছে, কিন্তু দশ বছরে বাড়িতে আসে নি। কলকাতার এক এঁদো গলিতে থাকে। চিঠিতে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ। পীতাম্বর ঠিক করল ভাইকে দেখতে যাবে। দশ সের দুধ দিয়ে সে ক্ষীর

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তুত করল। খাঁটি দুধের ক্ষীর। পেয়ে ভাইয়ের ছেলে-মেয়েরা খুব খুশী হবে। অনেক ঝক্কি করে, ট্রেনে, তারপর ক্ষীরের ঝড়ির জন্য ট্যাক্সিতে উঠতে হল। প্রায় রাত সাড়ে দশটায় নীলুর বাসায় পৌছল। কিন্তু নীলুর চেহারা দেখে পীতাম্বর অবাক। চক্ষু কোটরাগত, জীর্ণ, শীর্ণ চেহারা, ছেলে-মেয়ে বউরাও রোগা। ক্ষীরের ঝুড়ি দেখে নীলু বলল– "ওটা কি?"– ক্ষীর। ক্ষীর না এনে কিছু কাঁচকলা আনলেই পারতে। পীতাম্বর ভাবল–কাঁচকলার বড় অভাব। যা হোক ক্ষীরটা তাড়াতাড়ি খেতে বলল। তখন নীলু বলল– এখন খাওয়া যাবে না। চৌবাচ্চায় এক ফোটা জল নেই। পীতাম্বরের এ কষ্টের খাঁটি ক্ষীর। কলকাতায় এ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেমানান হয়ে গেল। মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের জীবনে এর চেয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকাও সম্ভব নয়।

'টিয়া-চন্দনা' গল্পটিতে সমাজের উচ্চশ্রেণি এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 'টিয়া-চন্দনা' গল্পে টিয়া ও চন্দনা দুবোন। তারা একসাথে বড় হয়েছে। ওদের দুজনের চেহারাও একরকম শুধু তফাৎ চন্দনা ফরসা আর টিয়া কাল। সুতরাং রূপকথার মত চন্দনার বিয়ে হয়ে গেল এক রাজ পরিবারের সন্তানের সাথে। কিন্তু টিয়াকে নিয়ে তার বাবা নিবারণ বাবুর চিন্তার শেষ নেই। একে তো কাল, তার উপরে আবার হয়েছে বসন্ত– মুখে দাগ পড়ে গেছে। যাহোক অবশেষে তার বিয়ে হয় সুশীল নামে এক ছেলের সাথে। পাত্র হিসেবে খুবই ভাল, শুধু টাকা-পয়সা নেই। তবে সে রেলওয়েতে চাকরি করে, খুবই সৎ। আর চন্দনাকে যে বিয়ে দিয়েছে রাজ পরিবারে; তারা লুকিয়েছিল চন্দনার স্বামী অসুস্থ। চন্দনাকে তারা নিয়েছে ঔষধ হিসেবে। দু-মেয়ের বিয়ের পরে নিবারণ বাবু সস্ত্রীক কলেরায় মারা যান। দু-বোনে যোগসূত্র ছিঁড়ে যায়। কেউ কারো খোঁজ রাখার অবকাশ পায় না। একদিন সুশীল এসে টিয়াকে বলল তোমার দিদি এখানে এসেছেন– ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে টিকিট কেটেছেন। টিয়া তার দিদিকে দেখতে গিয়ে অবাক হয়। চন্দনার কপালে সিঁদুর নেই, পরনে সাদা শাড়ি। কবে যে চন্দনা দিদি বিধবা হল সে খবর সে রাখে নি, একটি ছেলে সেও রুগ্ন, কিন্তু চারদিকে ঐশ্বর্যের ছাড়ছড়ি। টিয়ার ছেলেটির স্বাস্থ্য বেশ ভাল। চন্দনা টিয়ার বাড়িতে যেতে চাইল। টিয়া নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে টিয়ার ছেলে মরে আছে। রোজ দুধে একটু আফিং মিলিয়ে ঘুম পাড়ায়। আজ দিদির কাছে যাবে তাড়াহুড়ায় মাত্রা একটু বেশি হয়েছিল। ছেলে ঘুমের ঘোরেই মরে আছে। এদৃশ্যে সুশীল স্তম্ভ। দু-বোনের দূরত্ব যেন হঠাৎ করে কমে গেল। চন্দনা সুশীলকে বলে আমি এখানে থেকে যাব। এরপর চন্দনার অসুস্থ ছেলেকে দু-বোন মিলে পালে। এখন ছেলে সুস্থ। চন্দনা আর তার রাজ প্রাসাদে ফিরে যায় নি। আসলে সবসময় ঐশ্বর্যের মাঝে সুখী হওয়া যায় না। 'টিয়া-চন্দনা' এবং 'ক্ষীর' গল্প দুটি প্রসঙ্গে ভবেশ দাশের উক্তি–

Dhaka University Institutional Repository

"টিয়া-চন্দনা' গল্পে দুই বোনের দুই রূপ– দুই সংসার দুই পরিণতিকে যেভাবে মেলান, 'ক্ষীর' গল্পে পিতাম্বর আর নীলাম্বর দীর্ঘদিন পর ঘটনার বিক্ষেপে যেভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়– তখন বুঝতে পারি সামাজিক সত্যের নিরিখ বনফুলের কাছে ভিন্নমাত্রায় ধরা পড়েছে।"[৫]

বনফুল সামাজিক বাস্তবতাকে মধ্যবিত্তের জীবনের আনন্দ-বেদনাকে বহুবিচিত্র দিক থেকে অবলোকন করেছেন।

'আর এক দিক' গল্পে মানুষের দুর্বল একটা দিক থাকে, লেখক সে কথাই বলতে চেয়েছেন। এ গল্পে অতুল বাবু তার ওপরওয়ালাকে চটাতে চান না। কারণ চাকরি পাওয়া বড় দুর্লভ। সুতরাং এ জায়গাটাও মানুষের কাছে বেশ দুর্বল। চাকরি হারাতে কেউ রাজি নয়। তাই মানুষ অন্যায় বুঝেও তার প্রতিবাদ করতে পারে না। এ গল্পের মূল চরিত্র অতুল বাবু, বয়স হয়েছে– কিছুদিন পর রিটায়ার করবেন। ছেলে-মেয়ে অনেকগুলো। বড় ছেলে দুবার ম্যাট্রিকুলেশন দিয়ে পাশ জোটে নি। এজন্য তিনি ছেলের দোষ ধরেন না। তার মতে প্রতিটি মাস্টার টিউশনী করে বেড়াচ্ছে পড়াচ্ছে হিন্দিতে। ছাত্ররা অর্ধেকই বোঝে না। বাঙালি ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের বিষদৃষ্টি। ওদিকে ছেলের চাকরির জন্য ওপরওয়ালাকে তেল দিচ্ছেন। তিনি বলেন– ছেলের বাঙালি নাম পাল্টে দিতে? মেয়েটি নাচে গানে ভাল। ম্যাজিস্ট্রেট খুশি রেখে স্থানীয় বিদ্যালয়ে নাচ গানের শিক্ষয়ত্রী হয়েছেন। অন্য ছেলে মেয়েরা সবই অসুস্থ। এদেশে বাঙালিদের বড় দুর্দশা। কদিন আগে রাজেন্দ্র প্রসাদ হায়দারাবাদে বলেছেন– জোর করে কারো উপর হিন্দি চাপানো হবে না। অথচ, তার প্রদেশে বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে নোটিশ জারি করেছে– 'এইবার সকলকে হিন্দির মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে হবে। মাতৃভাষা চলিবে না।' সংবিধান বিরোধী একাণ্ডে গল্পকথক ডা: সাহেবের রক্ত গরম হল। তিনি একটা দরখাস্ত লিখে সকলের সই সংগ্রহ করতে লাগলেন। কিন্তু অতুল বাবু সব সময় হিন্দির বিরুদ্ধে কথা বলেন– তিনি ঐ দরখাস্তে সই করেন নি। কারণ তাতে তার আখের নষ্ট হবে। যারা খেতে পরতে দেয় তাদের মন যুগিয়ে চলতে হয়। আগে ইংরেজদের সালাম করেছেন এবং এখন এদের করেন। সুতরাং তিনি সই করতে পারবেন না। তবে সিকি পয়সা চাঁদা দিলেন এ কাজের জন্য। ডা. সাহেব বুঝতে পারলেন– বাংলার বাইরে যারা কাজ করে তাদের একটা দিক। তবে সর্বত্রই চাকরি রক্ষা মানুষ এমন প্রতিবাদহীন হয়ে পড়ে।

সমাজমানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক

বনফুল তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে মানব মনের রহস্যকে উন্মোচন করেছেন। "রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে এই ক্রমশ-উদ্ভিন্নমান জীবনসত্যের স্বীকৃতিই তাঁর শিল্পী-মানসের বৈশিষ্ট্য। এমন কি তিনি তাঁর মনকে চিরমুক্ত রেখেছেন বলেই ব্যবহারবাদে নির্ভরশীল

Dhaka University Institutional Repository

হয়েও মানুষের মনোলোকের রহস্যানুভূতির অভিজ্ঞতাকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর সাহিত্যে জীবনরহস্য তথা মানব প্রকৃতির এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেখে তাঁকে Naturalist বা প্রকৃতিবাদী বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।"[৬] আসলে মনের আলো-আঁধারি জীবনে যে রহস্য প্রকাশ পায় তিনি তাঁকে পূর্ণ-স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর গল্পে। অন্তর ও বাহির জগতের মনের লুকোচুরি খেলায় জীবনের জয়-পরাজয়ের আনন্দ-বেদনা তিনি নিরপেক্ষ রসিক দর্শকের মতই প্রত্যক্ষ করেছেন। মানুষের বাইরের মন ও ভিতরের মনের চেতন অবচেতন লোকের চাওয়া-পাওয়া ও সংস্কার, বুদ্ধি ও ব্যবহারের মাঝে যে ঘাত-প্রতিঘাত, সংঘাত এবং তার ফলে জীবনের সুখ-দুঃখের যে লীলা বৈচিত্র্য তার রহস্য উন্মোচনেও বনফুলের শিল্পদৃষ্টি অব্যর্থ। মানব মনের রহস্য প্রসঙ্গে 'ভিতর-বাহির', 'মানুষের মন', 'পাঠকের মৃত্যু', 'অভিজ্ঞতা', 'মুহূর্তের মহিমা' ইত্যাদি গল্প উল্লেখ করা যায়। আমাদের মন সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ বাইরের—অন্যভাগ ভিতরের। দুই চিন্তা চেতনা দু'রকম। সমাজে চলতে গেলে যা বলা ও করা হয় ভিতর মন কিন্তু সব সময় সায় দেয় না। তবু মানুষ অনেক কিছু করে। 'ভিতর-বাহির' গল্পে উকিল রাম কিশোর বাবুর বাইরের মনের অত্যাচারে ভিতরের মন জরজর— তা প্রায় মৃত। তিনি সর্বদা মিথ্যা সাক্ষী, গরিব প্রজার সর্বনাশ, জাল-উইল সৃষ্টির পরামর্শ দান ইত্যাদি কাজে বাইরের ব্যবহারিক মনের সাহায্য নিতেন।

তিনি আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দিতে বত্রিশ টাকা ফি নেন। একদিন এক আগন্তুক তাকে নিছক ফি দিয়ে কিছু পরামর্শ চাইলেন— আগন্তুক বললেন তাঁর এক আত্মীয়ের ছেলের বিবাহ হয়েছে দশ বছর। আজও কোন সন্তান হয় নি। ডাক্তারি মতে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। ছেলেটির স্বাস্থ্য ভাল, কোন রোগ নেই। এখন কথা হল এই বংশে সম্পত্তি কে পাবে?

তখন রাম কিশোর বাবু বললেন "ছেলেকে আবার বিয়ে দিন মশাই, বাজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কিন্তু?" (১খ, ৫৬ পৃ.) এবং আইনেও এরকম বিয়েতে বাধা নেই। রাম কিশোর বলেন— তিনি যা উচিত মনে করেছেন তা বলেছেন— এছাড়াও বলেন এই সব বাজে সেন্টিমেন্টের কারণে আমরা ডুবতে বসেছি। আগন্তুক বললেন— সত্যিই আপনি মক্কেলের হিতৈষী। কয়েকদিন পর রাম কিশোর কোর্ট থেকে ফিরে একমাত্র মেয়ে সরোজিনীকে দেখে অবাক, কোন খবর না দিয়ে কেন সে হঠাৎ করে চলে এসেছে। তখন সরো বলল, বাবা তুমি ওদের নাকি আবার বিয়ে করার মত দিয়েছ। 'সত্যি বাবা তুমি বলেছ বাবা।' তখন রাম কিশোর তার অসহায় একমাত্র মেয়ের দিকে চেয়ে তার বাইরের মনটার টুঁটি চেপে ধরল। আসলে আমাদের সব দিকে ভেবেই কাজ করা উচিত। মানবতাকে বিসর্জন দেয়া ঠিক নয়। অবশ্য নিজের কাঁধে না পড়লে কেউ এ বিষয়টা বুঝতে চায় না।

Dhaka University Institutional Repository

'মানুষের মন' গল্পটিতে মানসরহস্যের চরম শিল্প প্রকাশ ঘটেছে। এখানে নরেশ ও পরেশ সহোদর ভাই। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক, অন্যজন গোঁড়া বৈষ্ণব। উভয়ের জীবন পন্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু এক জায়গায় দুজনের মিল। ভাইয়ের ছেলে পল্টুর প্রতি স্নেহে উভয়ই সমান দুর্বল। সেই পল্টুর টাইফয়েড হয়েছে। স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক নরেশ গেলেন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে। বৈষ্ণব পরেশ ধরলেন কবিরাজকে। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হচ্ছে না দেখে সবশেষে জ্যোতিষ এবং তারকেশ্বরের দৈব ঔষধ পর্যন্ত ধাওয়া করতে হল। বৈজ্ঞানিকের শেষ অস্ত্র ইনজেকশন, বৈষ্ণবের স্বপ্নাদেশ লব্ধ বাবা তারকেশ্বরের চরণামৃত। কিন্তু কিছুতেই যখন কোন ফল হল না, পল্টুর যখন শেষ অবস্থা, তখন উভয়েই জ্ঞান-বিশ্বাস হারিয়ে অসহায় এবং সেই চরম অগ্নিপরীক্ষায় দেখা গেল, মৃত্যুর হাত থেকে স্নেহের ধনকে আঁকড়ে রাখার জন্য বৈষ্ণব ভক্ত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাতেই শেষ আশ্রয় খুঁজছেন, আর বৈজ্ঞানিক চরম ভরসা স্থাপন করতে চাইছেন চরণামৃতের মাহাত্ম্যের ওপর। আসলে মানুষের মন বড় বিচিত্র। সময়ের সাথে মনের পরিবর্তন ঘটে। আজ যা প্রিয় কাল তা অপ্রিয় হয়ে যেতে পারে।

'পাঠকের মৃত্যু' গল্পটিতে লেখক এক পাঠকের কথা বলেছেন– দশ বছর আগে একটি বই সে সমাপ্ত করতে পারে নি বলে খুব কষ্ট পেয়েছিল। আজ বইটি হাতে পেয়ে তার কাছে 'রাবিস' মনে হচ্ছে। আসানসোলের স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসেছিল পাঠক ভদ্রলোক। পাশেই বসেছিল অন্য একভদ্রলোক। তাঁর হাতে বেশ মোটা একখানি উপন্যাস। জানা গেল ঐ ভদ্রলোকও ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন। সুতরাং কথার ছলে বইখানি চেয়ে দখল করা যেতে পারে। দুঃসহ গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহর। কিন্তু দারুণ উদ্ভট উপন্যাসের ভিতরে পাঠক তলিয়ে গেলেন। বই এর মালিক ভ্রুকুঞ্চিত করলেন। আর পাঠক ভদ্রলোক রুদ্ধশ্বাসে বই পড়ে চললেন। চমৎকার বই। এত ভাল বই পাঠক আগে পড়েন নি। ট্রেন এসে পড়ল, বই অনেকটা বাকি। সুতরাং ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। বই এর মালিক নির্বাক হয়ে রইলেন। কিন্তু বই শেষ করা গেল না। বই এর শেষের অনেকগুলো পাতা নেই। বই এর মালিককে পাঠক বলল, "আগে বলেন নি কেন? ছি ছি– এর উত্তরে ভদ্রলোক নিষ্পলক নেত্রে পাঠকের দিকে চেয়ে রইলেন।" (১খ, ১৫৩ পৃ.) শিরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠছে। দশ বছর পর এক আত্মীয়ের বাড়িতে বই পেয়ে সংগ্রহ করে পড়া শুরু করা গেল। খাপছাড়াভাবে না পড়ে প্রথম থেকে জমিয়ে পড়া যাবে বলে ঠিক করল পাঠক। কিন্তু না এবার আর সেই আগের মত মন কাড়ছে না বইটি। আসলে বয়সের সাথে পাঠকের মনের পরিবর্তন হয় এবং হয় পাঠকের মৃত্যু। সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে পাঠক মনেরও যে পরিবর্তন হয়, গল্পকার এখানে তাই ব্যক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'দামোদর' গল্পটিতে দেখতে পাই যে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা থাকলেও সেখানে ভালবাসা থাকে না। হয়তো ভয় থাকতে পারে। ভালবাসা জন্ম হয় তখন যখন মানুষ মনের দিক থেকে কাছাকাছি আসে। গল্পটিতে দেখা যায় লেখক চিন্তিত এবং শঙ্কিত। কাল দামোদর বাবু আসছেন। দামোদর বাবু পুলিশে চাকরি করেন, কিন্তু ঘুষ গ্রহণ করেন না, মিথ্যা কথা বলেন না। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু, ত্রিসন্ধ্যা করেন। মস্তকে টাক এবং টিকি দুই-ই আছে। অর্থাৎ চরিত্রবান উন্নত মস্তক নিষ্কলঙ্ক লোক বর্তমান যুগে দুর্লভ। এহেন দামোদর বাবু লেখকের অতিথি হবেন শুনে ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। ভয়ে দূরে দূরে থাকলেন। ছেলে পাঠালেন স্টেশনে। দামোদর বাবু যখন লেখকের গৃহে এসে পৌছিলেন– তখন লেখক ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করলেন। বয়সে কিন্তু লেখকের চেয়ে অধিক হবেন না। দামোদার বাবু প্রণামের উত্তরে বললেন, 'থাক থাক বড় আনন্দিত হলাম বাবা তোমাদের সব দেখে।' তাঁকে বাইরের দিকে আলাদা ঘরে দেয়া হল। সন্ধ্যার পর লেখক খোঁজ নেয়ার জন্য দামোদার বাবুর ঘরে গিয়ে দেখেন কপাট বন্ধ। কোন সাড়া শব্দ নেই। ঠেলে দেখতে গেলে কপাট খুলে গেল। তাঁকে দেখে সোচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন- 'এস, দাদা, এস'। শুনে লেখক স্তম্ভিত হলেন– কারণ সকালে বাবা এখন দাদা। এরপর নজরে পড়ল। টুলের উপর ছোট বোতলটি। তখন লেখকের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। লেখক দামোদর বাবুকে আলাদা জগতের লোক ভেবেছিলেন। কিন্তু এখন দেখলেন খুব সাধারণ এবং কাছের মানুষ। অকস্মাৎ দামোদর বাবু হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন– ঋণে তার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে। এখন বিবাহযোগ্যা দুটি অনুঢ়া কন্যা তাঁর মাথায় খড়্গের মত ঝুলছে। এখন লেখকের কাছে কিছু অর্থ সাহায্যের জন্য এসেছেন। আর কিছু না বলে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। দামোদর বাবু চলে গেছেন। কিন্তু লোকটিকে লেখক ভালবেসে ফেলেছেন। তাঁর কাছে টাকা থাকলে ঐ মুহূর্তে দিতেন। এখন বন্ধুর কাছ থেকে ঋণ করে দেয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন। এই দামোদর বাবু যখন শ্রদ্ধার ব্যক্তি ছিলেন তখন তাকে ভয় হত। কিন্তু যখন জানলেন তিনি সাধারণ তখন তাকে লেখক ভালবেসে ফেললেন। তার অনেক খারাপ অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও। আসলে মানব মনের রহস্য বোঝা দায়। 'অভিজ্ঞতা' গল্পটিতে দেখতে পাই লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা। ডাক্তার হিসেবে তিনি অনেক লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। অনেক রোগী দেখেছেন, অনেক অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। একবার দুই টাইফয়েডের রোগী নিয়ে সমস্যায় পড়েন। একজন লেখকের পূর্ব পরিচিত– পার্শ্ববর্তী শহরের ডাক্তারের ছেলে, অন্যজন এক আগন্তুকের ছেলে। ডাক্তার সাহেব নিজের মত চিকিৎসা করাচ্ছেন। কলকাতা থেকে সব ঔষধপত্র আনাচ্ছেন। আর অন্য রোগীর পিতা পুরোপরি হাসপাতালের ডাক্তারের উপর নির্ভরশীল। এত বেশি নির্ভরশীল যে ডাক্তার সাহেব বিব্রত বোধ করতেন। কোন ক্রমে রোগীদ্বয়ের উন্নতি ঘটছিল না। গভীর রাতে ডাক পড়ল শিগগির চলুন– ডাক্তার বাবু নিজেই এসেছেন আলুথালু বেশে। ছেলের অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

ভাল নয়। সমস্ত চিকিৎসা আগেই করেছেন– এখন তিনি মটর বাইকে ছুটছেন– কংগোরেডের খোঁজে। মৃত্যুকালে পুত্রের সাথে দেখা হল না। আর ছেলেটির মা শিয়রে বসে শুধু হাহাকার করল, একটা আশ্বাস বাণীও শুনল না। পরদিন একটি ধন্যবাদও না জানিয়ে বিদায় নিলেন। যেন হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবই অপরাধী। অন্যদিকে আগন্তুক পুত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তখন বৃদ্ধটি ডাক্তারকে বলছেন– আপনি অনেক করেছেন– আপনার পদধূলি দিন মাথায়, আপনি তো ব্রাহ্মণ। এ সময়ে আপনার পদধূলি দরকার। স্ত্রী বললেন–"কাঁদবার সময় অনেক পাবে। এখন নাম শোনাও। ছেলে যাচ্ছে, ওর পাথেয় দিয়ে দাও।" (১খ, ৪৬৮ পৃ.) ছেলেটি চির বিদায় নিল। পরদিন বৃদ্ধ হাসপাতালে এক হাজার টাকা দান করে চলে গেলেন। চেক ভাঙ্গাতে গিয়ে আবিষ্কার হল, তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রিধারী রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন। লেখক এখানে সুন্দর ভাবে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন বড় ব্যক্তিদের মনও বড় হয়। মানুষের মন বড় বিচিত্র। বহু সাধনার ধন হাতে পেয়েও তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। আবার অন্যের জিনিস জোর পূর্বক ছিনিয়ে এনে তাও ফিরিয়ে দেয়। মানব মনের গভীর রহস্য মানুষ নিজেও জানে না, মুহূর্তের মহিমায় মানুষ অনেক বড় হয়ে যায়। এ গল্পে গুরগন খাঁ মূল কালীকান্ত জমিদার বিপত্নীক। একমাত্র শ্যালিকা শ্রীমতী নান্নী যুবতীটিকে তাঁর পছন্দ হয়ে যায়। শ্রীমতীর প্রেম কিন্তু ভিন্নমুখী। সে ভালবাসে গরিব গোছের ছোকরা তিনুকে। কিন্তু গুরগন খাঁর শ্রীমতীকে চাই, চাই-ই। ড্রয়ার থেকে রিভলবার বের করল শ্রীমতীকে তার আজই এবং এখনই চাই। শ্রীমতী হাস্যদীপ্ত চক্ষে গুরগনের দিকে চেয়ে বলল– "আমাকে যদি না পান, কি করবেন আপনি?" ভীম গর্জনে গুরগন বললেন– তিনুকে খুন করব। শ্রীমতী দশ মিনিট সময় নিল চিন্তা করার জন্য। এরপর সে রাজি হল আজ রাত দশটায় যেন গাড়ি পাঠানো হয়। সে গুরগুনের কাছে আসবে। দশটা বাজে গাড়ি চলে গিয়েছে। গুরগুনের মনের অবস্থা কেৎলিতে ফুটন্ত জল। সহসা গলির মোড়ে গাড়ির শব্দ। গাড়ি থামল। শ্রীমতী সিঁড়ি বেয়ে উপড়ে উঠে পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। শ্রীমতীর মুখ দেখে গুরগনের উদ্যত প্রেম স্তম্ভিত হয়ে গেল। সজল কণ্ঠে শ্রীমতী বলল– "আপনার কথার উপর নির্ভর করে এলাম। তিনুকে কিছু বলবেন নাতো?" (১খ, ১৭৮ পৃ.) কয়েক মুহূর্ত– কি যে ঘটে গেল জানি না। গুরগন শ্রীমতীকে বলল– "আচ্ছা তুমি যাও।" (১খণ্ড, ১৭৯ পৃ.) শ্রীমতী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল একি করলাম! হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলাম। আসলেই মানুষের মন বড় বিচিত্র।

'আটকে গেল' গল্পে সমাজের সাধারণ সৎ ও সরল জীবনের কাছে রং চটা, অসৎ পথে অর্জিত জীবন পরাজয় ঘটে– লেখক এটা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। 'আটকে গেল' গল্পে অতুল নাগ সাধারণ ছেলে, বি.এ পাশ করেছে। মা-বাবা নেই, পিসির কাছে মানুষ। পিসি লোক দেখানো ঝি-গিরি করে। আসলে সে চোরদের সাহায্যকারিণী, সে সব খবর পাচার করে প্রচুর টাকা উপার্জন করত। নিঃসন্তান পিসির সব ভালবাসা

Dhaka University Institutional Repository

অতুলকে ঘিরে। তাকে ধনীর দুলালের মত পোশাক-আসাকে জৌলষে ভরা জীবন দিয়েছে। বাড়িতে মাস্টার। কিন্তু বুলু পিসি মাস্টারকে প্রায় বকতেন। অতুলকে মাস্টার মারতে পারবেন না। সুতরাং কোন ক্লাসে সে একবারে প্রমোশন পায় নি। টাকার জোরে বি.এ পাশ করেছে। ওদিকে ছট্টু তাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। পরনে সাধারণ পাঞ্জাবি, চটি জুতো। হঠাৎ করে রাস্তায় ছট্টুর সাথে তার দেখা হল। ছট্টু বলল পাশেই তাদের বাড়ি, সে নিয়ে গেল। ঘরে তেমন জাঁকজমক নেই, সাধারণ তক্তপোষে বসল অতুল। ছট্টুর মা এল সাধারণ শাড়ি পরনে। অতুলকে ঘরে তৈরি নারকেলের নাড়ু খাওয়াল। আর তার পিসি সব সময় চটকদার শাড়ি পরে। ঘরে তৈরি খাবার তারা খায় না। অতুলের হঠাৎ মনে হল যত দামী পোশাক পরুক ও খাবার খাক, তারা ছট্টুদের কাছে কিছুই নয়। ছট্টুর মায়ের ভদ্রতার কাছে অতুল দমে গেল। আসলে অসৎ পথের উপার্জনে কখনো সত্যিকারের মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না।

'দুই নারী' গল্পে বাঙালি নারীর মনোজগতকে লেখক জনসম্মুখে তুলে ধরেছেন। একই নারীর সময়ের সাথে মনের পরিবর্তন ঘটে এবং সে বিপরীতধর্মী হয়ে যায়। তারই উদাহরণ এ 'দুই নারী' গল্পটি। গল্প কথক পুজোর ছুটিতে দাদার কাছে তিন পাহাড়ে বেড়াতে যায়। যতীনদা মাস ছয় আগে বিয়ে করেছে। যদিও গল্পকথক তার বৌদিটিকে আগে দেখে নি। প্রথম সাক্ষাতে দুজনেই দুজনের দিকে চেয়ে নির্নিমেষ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। বৌদি অপরূপা সুন্দরীও নয়, যেন একটা চুম্বক। আর যতীনদা ছিলেন শিব তুল্য। বৌদি তার দেবরটিকে আকর্ষণের চেষ্টা করছে, তা হয়তো দাদা বুঝতে পারেন নি। দেবরটি সব সময় অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' সঙ্গে রাখতেন। তাই সে বৌদির আচরণে বিব্রত বোধ করতেন। দাদার অনুরোধে বৌদিকে নিয়ে মতি ঝরণা দেখতে যায়। সেখানে বৌদির স্নানের দৃশ্য তাকে আকৃষ্ট করলে নিজেকে সংযত রাখে। রাতে বৌদির উষ্ণ স্পর্শ। সুতরাং পরদিন তিন পাহাড় ত্যাগ করল ঠাকুর পো।
কিন্তু স্বস্তি পেল না। সেই উষ্ণ স্পর্শ যেন সঙ্গে এল। তার সংযমের হিমালয় গলতে লাগল ধীরে ধীরে। তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাল। সে পড়ল– 'নষ্টনীড়', 'নানা', 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার', 'মাস্টার প্যাশন', 'রেন্‌স'। বৌদিকে নিয়ে কবিতা লিখে পত্রিকায় ছাপাল, তার কপি বৌদিকে পাঠাল। আবার সুযোগ এল দুই বছর পরে দাদা যখন জামালপুরে। তিনি আমন্ত্রণ করলেন, গল্পকথক ঠাকুর পো গিয়ে হাজির। রাতে খাওয়ার পর বৌদিকে বলল– "বসনা একটু এই খানটায়। আমার কবিতাগুলো পড়েছিলে?" (৩খ, ১২২ পৃ.) উত্তরে বৌদি বললে, "পড়েছি কিন্তু যার উদ্দেশ্যে তুমি ওগুলো লিখেছো সে চলে গেছে। মরে গেছে। তোমার দাদাটিকে চেন না? অমন পরশ পাথরের কাছে লোহাও সোনা হয়ে যায়।" (৩খ, ১২২ পৃ.) 'আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি, তুমি

Dhaka University Institutional Repository

ঘুমোও।' সময়ের সাথে বয়সের সাথে নারীর মনের পরিবর্তন ঘটে। এবং হয়ে ওঠে স্বামী সেবাব্রতী নারী। 'চঞ্চলা' গল্পের চঞ্চলা আসলেই চঞ্চলা। সে কিছুতেই যেন তার মনকে স্থির করতে পারে না। এখানে লেখক বাস্তব জীবনের একটি খণ্ড চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে চঞ্চলা ধনীর দুলালী– সে কলেজের অধ্যাপক অনিমেষকে পছন্দ করে, অনিমেষও তাকে পছন্দ করে। তবে চঞ্চলার বাবা চান ম্যাজিস্ট্রেট চূড়ামণি চৌধুরীর সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে। তাতে তার জমিদারীর সমস্যাও মেটে, মেয়ের ভবিষ্যৎও ভাল হয়। চঞ্চলাও ভেবে দেখে অনিমেষকে বিয়ে করে কি পাবে। গরিব শ্রমিকের দুঃখ দেখে তার মন বিগলিত হয়, কিন্তু ধনী বাবার অগাধ ঐশ্বর্যকেও সে তুচ্ছ করতে পারে না। সে চূড়ামণির দেয়া শাড়ি পরে– নিজেকে আয়নায় দেখে আর ভাবে। নিচতলায় সবাই বসে আছে– চূড়ামণি তার বোন শিবানী আরো অনেকে– সে চূড়ামণিকে বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচে নামে। কিন্তু এমন সময় অনিমেষ এসে প্রবেশ করে। এবং চঞ্চলাকে বলে– "তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে" (৩খ, ১৯৯ পৃ.)। চঞ্চলা অনিমেষের সাথে বের হয়ে গেল আর ফিরল না। এমন চঞ্চল মতির মেয়ে সমাজে অহরহ দেখা যায়। যার বাস্তব প্রতিফলন চঞ্চলা গল্পটিতে ঘটেছে। মানব হৃদয়ের গভীর রহস্য বোঝা দায়। 'ভ্রাতৃপ্রেম' গল্পে আছে– দুই ভাইয়ের কর্মকাণ্ড। কথায় বলে শিশু এবং বৃদ্ধ এক সমান। এ গল্পে তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। প্রৌঢ় ভবানন্দ সেন নিজের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছেন। তখন কালজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার হয় নি। তবু ডা: ব্রহ্মচারী চিকিৎসার ভার নিলেন। ভবানন্দের পুত্র শ্যামানন্দ মেডিকেল কলেজে পড়ছে। সুতরাং আরো বেশ কিছু ডা: জুটল। ডাক্তার বলেছেন– রোগীর খাবারের দিকে লক্ষ্য রাখতে, কারণ এ সময় খাবারের প্রতি খুব লোভ হয়। কিন্তু খাওয়া যাবে না। কারণ পেট ভাঙ্গলেই সর্বনাশ হবে। সুতরাং ভবানন্দের স্ত্রী মৃন্ময়ীও তাকে দশ বছরের পুরানো চাল আর মৌরলা মাছের মশলাহীন ঝোল ছাড়া অন্য কোন পথ্য দিতেন না। তারপরও ডাক্তার বলে দুধে বেশি করে জল মিশিয়ে খাওয়াতে। এত কিছুর পরও পেটের সমস্যা যাচ্ছিল না। এর মধ্যে ভবানন্দ গো ধরলেন– লুচি না দিলে খাওয়া বন্ধ করে দিবেন। অনেক অনুরোধের পর মৃন্ময়ী যখন লুচি করে থালায় দিলে এমন সময় শ্যামানন্দ হাজির। সে বাবার সামনে থেকে থালা সরিয়ে নিল। ভবানন্দ সেদিন কিছু খেলেন না– চিঠি লিখল ভাইয়ের কাছে। চিঠি পেয়ে ভাই ছুটে এল। শ্যামানন্দও স্বস্তি পেলে– নিশ্চিত মনে কলেজে গেল– বিকেলের দিকে ভাই পরমানন্দ–ভবানন্দকে নিয়ে বের হয়– হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেখাবেন বলে। রাতে দুভাই শুয়ে পড়ল। হঠাৎ পরমানন্দ মশারির দড়ি ছিঁড়ে মশারি জড়িয়ে নিচে পড়ে গেলেন– ভেবেছেন হয়ত আগুন লেগেছে। শ্যামানন্দ শব্দ শুনে এসে দেখে খুড়ো নিচে, বাথরুমে ভবানন্দ বলছে সে উঠে আসতে পারছে না। পরে জানা গেল তারা বিকেলে খাবার দোকানে লুচি, তরকারী খেয়েছে। তারা কাজটি করে বাচ্চাদের মত

Dhaka University Institutional Repository

অথচ ভবানন্দ নিজে একজন প্রবীণ ডাক্তার আর পরমানন্দ প্রবীণ শিক্ষক। 'ভেক' গল্পে মানুষের সাধারণ চরিত্র ফুটে উঠেছে। টাকার কাছে মানুষ কত সহজে বিকিয়ে যায়। মানুষের চরিত্র ঐ ভেকের মত, তারা কুয়োর গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না। এই কথাই গল্পে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গল্পে দেখা যায় শ্রীমান রাইমোহন মাইতি লেখকের এক স্নেহভাজন ব্যক্তি, সে নানা সময় নানা দিক থেকে লেখককে নানা তথ্য এবং নানা লেখা সংগ্রহ করে দেয়। এবার দুটো কবিতা পাঠিয়েছে। কিছু পূর্বে লেখকের প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষ তার মেয়ের বিয়ের কার্ড দিয়ে গেছেন। রাইমোহন লিখেছেন– এ কবিতা দুটো ছাপানোর ব্যবস্থা করতে। একটা কবিতা– 'সাগরের প্রতি', আর একটি– 'কূপের প্রতি'। ভেক নাম দিয়ে লিখেছে। পরদিন রাইমোহন হন্তদন্ত হয়ে বলল কবিতা প্রকাশের দরকার নেই। কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলুন। ঐ ভেক শেষে কুয়োর ভেতরেই লাফিয়ে পড়ল। আপনার পাশেরই বাড়ির বিনোদিনী। এম.এ পাস মার্জিত রুচির, কিন্তু বিয়ে করছে, একটা নন ম্যাট্রিক জরদগরকে। নিমন্ত্রণপত্র পান নি? বিশাল অর্থের মালিক। ছিছি, এতটা সে আশা করে নি বলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। লেখক এতক্ষণ কূপের খবর শুনলেন। রাইমোহনের কান্নায় ভেঙে পড়া দেখে সাগরের খবর পেলেন। এবং এও বুঝলেন এ প্রশান্ত মহাসাগর নয়, বঙ্গোপসাগর। আসলে মানুষ অর্থের কাছে সহজেই বিকিয়ে যায়। আর একটা দিক হল বাঙালি ছেলে বড়ই আবেগ প্রবণ। লেখক দুটি চিত্রই এখানে সফলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 'নারীর মন' গল্পে লেখক নারীদের মানসিক অবস্থা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। নারীর মন এতই জটিল যে সৃষ্টিকর্তাও হয়তো এর নাগাল পান না। এমনকি নারী নিজেও হয়তো জানে না সে কি চায়। গল্পে মূল চরিত্র সুমিতা, তার ঘর অন্ধকার, বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে, হাতে একটি টাকাও নেই যে আরেকটি বাল্ব কেনে। দুপুরে লক্ষ্য করলে নবেন্দু খুশি হয়ে কিনে দিত। তবে নবেন্দুর কাছে চাইবে কেন– সে ত তাকে বিয়ে করবে বলে নি। সুরেনও আসে তার কাছে, সে মুখ ফুটে তাকে কিছু বলে নি। সুমিতা কাকে পছন্দ করে। সে নিজেই সঠিকভাবে জানে না। এমন সময় সুরেন এল, সে বলল, এখন সে বেরুবে, সুরেন তার সাথে যেতে চায়, সুমিতা বলল তার টাকা নেই সে হেঁটে বেড়াবে। দুজনে বেরিয়ে পড়ল– শেষে সুরেনের টাকার ট্রামে উঠে গড়ের মাঠে যায়। পাশাপাশি বসে বাদাম খেতে খেতে সুরেন বিয়ের প্রস্তাব দেয়– 'সুমিতার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে গেল। তবু স্থির হয়ে বসে রইল সে। তার আত্মসম্বরণ করে ধীর কণ্ঠে বলল– "আমি যতদিন পর্যন্ত ভালভাবে রোজগার করতে না পারি ততদিন বিয়ে করব না ঠিক করেছি। কারো গলগ্রহ হবার ইচ্ছে আমার নেই।" শেষে সে হেঁটে বাড়ি ফিরে অন্ধকার ঘরে শুয়ে পড়ল। রাতে নবেন্দু এল, সে বলল ঘরে আলো নেই। নবেন্দু বলল– "কপাট খোল আমি বাল্ব এনেছি।" (৩খ, ২৭৭ পৃ.) সুমিতা আশ্চর্য হল। তখন নবেন্দু বলল– সে বাল্ব পাল্টে দিয়েছে। কারণ সুরেনকে ঠকাবার জন্য। অন্ধকার দেখলে হয়তো সে

Dhaka University Institutional Repository

বসবে না। নবেন্দু বাল্ব লাগিয়ে দিল। সুমিতা বলল, সুরেনের সাথে মাঠে গিয়েছিল। বিয়ের প্রস্তাবও সে দিয়েছে। তাকে কি বলেছে তাও বলল। নবেন্দু বলল বেশ বলছ। কিন্তু তাকেও এক কথা বলবে। তখন সুমিতা বলল 'তা জানি না। রাত হয়েছে, বাড়ি যাও তুমি।' তারপর হেসে ফেলল। আসলেই নারীর মন বোঝা যায় না। সে কাকে নির্বাচন করবে তা সে বলতে পারে না। তবে আজ আর নারী পরনির্ভরশীল হতে চায় না, গল্পে একথাও কিন্তু এসেছে স্পষ্টভাবে।

'নবজীবন স্রোত' গল্পে লেখক সুন্দরভাবে আমাদের পারিবারিক জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। লেখক সাহিত্যিক সকলে ঘরোয়া পরিবেশে একেবারে সাধারণ। গল্পে সাধারণ মানুষের মতো তারা পরনিন্দা পরচর্চা করে। 'নবজীবন স্রোত' গল্পে পাশাপাশি দুটি পরিবার– শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সিং এবং কমলকুমার মিত্র বাস করে। দু বাড়িতে কাজ করে একই কাজের মহিলা। সুতরাং তাদের স্বভাব অনুযায়ী দু ঘরে কথা চালাচালি করতে লাগল। সুতরাং দু বাড়ির মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ল। বিহারী ভদ্রলোক কড়মড় করে বলত, বাঙাল 'শালা মছলিখোর'। আর বাঙালি ভদ্রলোক বলত, "ব্যাটা বেহারী ভূত।" কিন্তু সব শত্রুতার অবসান ঘটল সেদিন, যেদিন কমল কুমারের বাড়ির সামনে সামিয়ানা চেয়ার টেবিল, ফুলের মালা দেখে রামকৃষ্ণ সিং এক বাঙালি যুবককে জিজ্ঞেস করল– কি হচ্ছে? সে বলল বিখ্যাত সাহিত্যিক নবজীবনের আজ জন্মদিন। তাকে সম্বর্ধনা দেয়া হচ্ছে। "তিনি তো আপনার বাড়ির পাশেই আছেন।" (৩খ, ৩৪৮পৃ.) সম্বর্ধনা শেষে রামকৃষ্ণ কমলকুমারের কাছে গিয়ে করজোড়ে মাফ চাইলেন। এবং বললেন তিনি তার খুব ভক্ত। তিনি বাংলা বলতে না পারলেও বুঝেন। তখন কমলকুমার হাত জোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। এবং বললেন 'স্রোত' নাম দিয়ে একজন লোক তাঁর লেখা অনুবাদ করেছেন। তখন রামকৃষ্ণ বলল– তিনি 'স্রোত'। দু'জন গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হলেন। মানুষের স্বভাব তৃতীয় পক্ষের দ্বারা পরিচালিত হওয়া এটা লেখক সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিনোদ একজন মোটামুটি খ্যাতিমান ডাক্তার। ও অঞ্চলে তাঁর চেয়ে ভাল ডাক্তার নেই। এছাড়া গরিবের তিনি মা-বাপ। সব মিলিয়ে চমৎকার লোক। বয়স ৩৫– চেহারায় সুপুরুষ। গল্প কথকের ছোট বোনটিরও বিয়ে হয় নি। পাল্টি ঘর। ভেবে চিন্তে বোনের চিকিৎসক হিসাবে বিনোদ ডাক্তারকে নিযুক্ত করা হল। বাড়িতে আসা যাওয়া ভালই হচ্ছিল। এবার বিয়ের কথা পাড়তেই ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, আমি বিয়ে করব না। কেন? এ প্রশ্ন করতে তিনি এমন গম্ভীর হলেন আর বিয়ের কথা বলা গেল না। এ বাড়িতে আসাও বন্ধ করে দিলেন। পরে একদিন তার বাড়িতে গিয়ে দেখলেন এক লোক বসে আছে– সে কোন রোগীর জন্য ডাক্তারকে রোগীর বাসায় যেতে বলছেন এবং বিনোদ ডাক্তারকে ছাড়া অন্য কাউকে সে দেখাবে না। কাগজে ঠিকানাও দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেছেন। এর কিছুদিন পর দেখা গেল বিনোদ ডাক্তার কোথা থেকে একটা রুগ্ন মেয়েকে নিয়ে এলেন। এরপর শোনা গেল তাকে নিয়ে ধরমপুর স্যানিটিরিয়মে যাচ্ছে। এর কিছুদিন পর ভদ্রলোক কলকাতায় সেই ঠিকানায় বিনোদ ডাক্তারের খোঁজ নিয়ে জানলেন– এই বাড়ির মালিক বিনোদ ডাক্তারের স্ত্রীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছেন। সেই থেকে বিনোদ আর বিয়ে করেন নি। আর পাপের শাস্তি পেয়েছে তার স্ত্রী, সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছে। এরপর বিনোদ ডাক্তার এসে তার স্ত্রী নিয়ে গেছে। এর পরের খবর কেউ জানে না। ফেরার পথে একখানা খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে একটি খবর চোখে পড়ল– তা হল একজন লোক তার বিশ্বাস ঘাতিনী অসতী স্ত্রীকে গুলি করে মেরে নিজে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কত রকম মানুষ আছে এই পৃথিবীতে।

'রামু ঠাকুর' গল্পটিতে একজন কুষ্ঠরোগীর মনঃকষ্ট তুলে ধরেছেন লেখক এবং তা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। মণিহারীতে গঙ্গার তীরে রামু ঠাকুরের দোকান। সেখানে আছে খেয়াঘাট। দিনে দুবার খেয়াঘাটে খেয়া পারাপার হয়। এছাড়া জায়গাটা বড়ই নির্জন। রামু ঠাকুরের দোকান মূলত খাবারের দোকান। চিড়া, মুড়ি, ছাতু, গুড় ইত্যাদি। দইও মাঝে মাঝে রাখে। খেয়াঘাটের লোকজন এ খাবার খায়। দিরা থেকে লছমনিয়া গোয়ালিনী মাঝে মধ্য দই দিয়ে যায়। এই মেয়েটির প্রতি রামু ঠাকুরের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। কারণ মেয়েটি তার মেয়ের বয়সি হবে হয়তো। এতদিনে তার মেয়েটিও এত বড় হয়েছে হয়তো। দশ বছর আগে কুষ্টরোগ দেখা দিলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে। কারণ ডাক্তার বলেছে বাচ্চাদের কাছে আসতে দিও না। একজন সাধু বলেছিল নিষ্ঠাভাবে গায়ে প্রত্যহ গঙ্গামাটি মেখে সূর্য পূজা করে গঙ্গাস্নান করলে এ রোগ সারবে। তাই সে এ নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছে। হঠাৎ এখানে এক সাধু এসে তার কাছে কিছু খেতে চাইল। সে তার দোকানের সব খাবার দিল– তখন সাধু তাকে একটা শাঁখ দিল এবং পাঁচ টাকা চাইল– রামু আট আনা দিল। এতে সব অসুখ সারে। পরদিন দ্বিপ্রহরে রামু প্রতিদিনের মত উলঙ্গ হয়ে গায়ে কাদা মাটি মাখার পর সেই পঞ্চমুখ শাঁখটা উরুর উপর প্রাণপণে ঘষতে লাগল এবং রক্ত বের হল তবু ঘষতে থাকল। এখানেই গল্পের শেষ। এর মধ্যে দিয়ে লেখক একজন কুষ্ঠ রোগীর মনঃকষ্ট ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। 'ভিখারীটা' গল্পে এক দরিদ্র পিতার চিত্র পাঠকের সম্মুখে লেখক সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। 'ভিখারীটা' গল্পের ভিখারী দুপুর রোদে হাঁকাহাঁকি করে মানুষ বিরক্ত করে লাভ নেই ভেবে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল। মাত্র ছটি নয়া পয়সা রোজগার হয়েছে। দুমুঠো ছাতু খেতে হলেও চার আনা দরকার। ভিখারীর গায়ে শত ছিন্ন কাপড় ভাল করে উরু দুটোও ঢাকে না। বুড়ো ভিখারীর মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। কোটর-গত চোখ। সবকিছুর সাথে বেমানান তার পায়ে জুতো দুটো যদিও ছেঁড়া তবু বেশ দামী। কোন ধনী যুবক দিয়েছিল। বুড়ো ভিখারী ঢুলছিল। হঠাৎ পৌলিশ, পৌলিশ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। রাস্তায় কেউ নেই। ছেলেটা

Dhaka University Institutional Repository

বোকার মত হাঁকছে। ভিখারী হাসল। তারপর ডাকল। ছোঁড়াটি এগিয়ে আসাতে ভিখারী একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড করল। ছেলেটাকে তার জুতো পালিশ করতে বলল। ছেলেটি ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বলল। চার পয়সা লাগবে।– বুড়ো তার ছ'নয়া থেকে চারটি পয়সা আগেই দিয়ে বলল– হ্যাঁ কর। ছেলেটি জুতো পালিশ করতে লাগল। বুড়ো অর্ধনিমীলিত নয়নে ছোঁড়ার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ছেলেটি মুচকি মুচকি হাসছিল। বছর খানেক আগে ভিখারীর ছোট ছেলে নুলিয়া পালিয়ে গিয়েছিল। সে নাকি কলকাতার রাস্তায় জুতো পালিশ করে। যদিও ছেলের সঙ্গে এ ছোঁড়ার মিল নেই, তবু সে এক দৃষ্টে ছোঁড়ার দিকে চেয়ে রইল। নুলিয়াও এমন মুচকি মুচকি হাসত। এখানে এক শোকাহত পিতৃ হৃদয় চিত্র লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

মণিহারীর নিত্য চৌধুরী লেখকের কৈশোরের সহপাঠি। এখন যারা তাকে দেখছেন, তারা তার ছেলের সঙ্গে আদৌ কোন মিল খুঁজে পাবেন না। যে বাড়িতে মাছ মাংসের সংস্রব আছে সে বাড়িতে জলস্পর্শ করেন না তিনি। তিনি কৈশোরে লেখকের বাড়িতে এসে মুরগির ডিম খেতেন। নিত্যর বাবা ছিলেন জমিদারের কর্মচারী। সে পরবর্তীতে জমিদারের সেরেস্তায় পাটোয়ারি হয়েছে। ছোটবেলায় নিত্য চৌধুরীর স্বভাব ছিল খবর সংগ্রহ করে বেড়ানো। যার কারণে লেখক তার সাথে মিশত। এর জন্য অনেক বকা খেতে হয়েছে ছেলেবেলা। কয়লা ঠাকুর, আলোর সাপ, কুকুরের বাচ্চা ইত্যাদি খবর ছিল তার ভাণ্ডারে। বয়সের সাথে সাথে নিত্য চৌধুরীর খবরের ধরন পাল্টেছে। মধ্য বয়সে জমিজমা সংক্রান্ত খবর সংগ্রহ করে বেড়ানো তার কাজ। এ খবর সংগ্রহের নেশা তার শেষ বয়সেও যায় নি। তখন তার খবরের ধরন অন্য রকম। তাহল কে কবে মারা গিয়েছে, কে অসুস্থ ইত্যাদি। সে দূর দূরান্তের মৃত্যু সংবাদও সংগ্রহ করেছে। কিন্তু সে যখন অসুস্থ কেউ তার খবরটা ডাক্তার বাবুকে দেয় নি। যে লোকটি সকলের জন্য মাথা ঘামিয়েছে। শেষ মুহূর্তে তার ভাই এসে বলল পক্ষাঘাতে পনের দিন ধরে অসুস্থ। শনিবার অমাবস্যায় মারা গেলে পাড়াটা খারাপ হবে। তাই ভাই এসে বলছে তাকে আজকের রাতটা বাঁচিয়ে রাখতে। যে কারণে হোক সে রাতটা সে বেঁচে রবিবার সকালে মারা গেল। শ্মশানে তার চিতার দিকে চেয়ে আছেন– ডাক্তার বাবুকে তখন তার কানের কাছে কে যেন বলল– "এসব খবর যদি না আনতাম, তুমি কি আমার কাছে আসতে?" (৪খ, ৩২৯পৃ) গল্পটিতে লেখক সমাজের এক শ্রেণীর লোকের চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা শুধু পাড়া বেড়িয়ে মানুষের খবর খুঁজে বেড়ায়। 'ফ্লু' গল্পে একজন অসুস্থ মানুষের মন মানসিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে। 'ফ্লু' গল্পের মূল চরিত্র সমর। তার হঠাৎ মাথা ব্যথা, হাঁচি এবং এরপর জ্বর এল। বাড়ি বেড়াতে এসেছে বন্ধুর বোন তপতী। এসে দেখল ১০৩ ডিগ্রি জ্বর। সে মাথা টিপে দিল। ফ্লুর কারণে তপতীকে বেশ কাছে পাওয়া গেল। জ্বর বেশি দেখে তপতী ডাক্তারকে ফোন করল। ডাক্তার ঔষধ দিয়ে গেল। তপতী নিয়ম মত খাওয়াল। সমরের মনে হল ডাক্তার হয়তো ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিতে তপতীর

Dhaka University Institutional Repository

দিকে তাকিয়ে ছিল। সমর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল– বন্ধু নরেন তার কাছে চিঠি লিখেছে– তার বোন তপতীকে পছন্দ হয় কিনা। উঠে ভাবল এমন স্বপ্ন দেখার কোন মানে আছে। গলাটাও ব্যথা করছে, তপতীকে ডেকে গলার ভেতরটা দেখাল। এবং মেওলস্ পিগমেন্ট লাগিয়ে দিতে বলে। সে পরম যত্নে তুলি বানিয়ে নিয়ে এল, সে বলল লাল জায়গায় লাগাবে। উত্তরে সমর বলে, ভিতরের দিকে। সেখানে খুশি লাগাও। মনে হল কথাগুলো বড় অসংলগ্ন। তপতী পিগমেন্ট ভাল করে লাগিয়ে দিল। পরদিন সত্যিই নরেনের চিঠি এল। লিখেছে– "তপতীতে পাঠিয়ে দাও। তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। জামা কাপড় গয়না কেনার জন্য তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। (৪খ, ৩৪৩পৃ.) পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল। তপতী যাওয়ার সময় প্রণাম করতে এল– বলল, "আশীর্বাদ করি সুখী হও।" (৪খ, ৩৪৩পৃ) আসলে জ্বরের ঘোরে মানুষ অনেক আবোল তাবোল ভাবে। একজন অসুস্থ মানুষকে সেবার জন্য কাছে যে কেউ আসতে পারে এতে আবেগ প্রবণ হওয়ার কারণ নেই। 'প্রেমের গল্প ১৯৬৪' তে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সামাজিকভাবে কুষ্টি মিলিয়ে মেয়েদের বিয়ে দেয়া এযুগে খুবই কঠিন। একে তো বিশাল অঙ্কের পন তার উপর পছন্দসই পত্রও মেলে না। আর মেয়েকে পড়াশুনা করিয়ে একটা চাকরি জুটিয়ে দেয়া সেও কঠিন, চাকরির বাজার বড়ই মন্দ। সস্তায় কিন্তু একজন প্রেমিক জোটে, সুতরাং শেষে তার হাত ধরেই পলায়ন। "প্রেমের গল্প ১৯৬৪' লেখককে পূজা সংখ্যায় একটা প্রেমের গল্প লিখে দিতে বলা হয়েছে। তিনি লেখার জন্য উপরের ঘরে বসে ভাবছেন। এমন সময় দুজন পুরুষ এবং এক মহিলা এসে হাজির। তারা বলল তার ঘরটি সাত দিনের জন্য দিতে। এর মধ্যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, এরা তার মেয়ে এবং মেয়ে জামাই। আজই রেজিস্ট্রি মতে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু হিন্দুর বিয়েতে সিঁদুর দান, ফুলশয্যা এসব না হলে মন ভরে না। তার একটা বাড়ি আছে। কিন্তু সেখানে উদ্বাস্তুতে ভরতি। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সুতরাং লেখককে ঘর ছাড়তে হল। সাতদিন পরে তারা একটি খামে একশ' টাকা রেখে চলে গেল। গল্প লিখলে এর চেয়ে বেশি পেতেন না। কিন্তু তিনি টাকার জন্য ঘর ভাড়া দেন নি। তাঁর মেয়ে শীলার কথা ভেবে তাদের থাকতে দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর শিক্ষিত মেয়ে শীলাকে কালো বলে পাল্টি ঘরে বিয়ে দিতে পারেন নি, চাকরি হয় নি। শেষে ব্রাহ্মণ কন্যা, নাপিত নন্দনের সাথে পলায়ন করেছিল। তাদের ফুলশয্যা বাসর হয়েছিল কিনা কে জানে? সে কথা ভেবে তাঁর চোখে জল এল। গল্পে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র সুনিপুণভাবে অঙ্কিত করতে বনফুল সক্ষম হয়েছেন। 'খগার মা' গল্পে এক মায়ের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মা তার সন্তানদের কখনোই খাট করতে পারে না। সন্তানের সুনাম, মায়ের গর্ব। মা সব সময় সন্তানের অন্যায়কে ক্ষমার চোখে দেখে। এমনি এক মা 'খগার মা'। তার দুটি ছেলে, খগা এবং ভগা। তাদের বাবা নগা সুর একজন ভাল স্বর্ণের কারিগর ছিলেন। দুটো গুণ দু ছেলে পেয়েছে। একজন ভাল মিস্ত্রী আর একজন ভগা মানে স্বচ্ছন্দ সুর ভাল নামকরা

Dhaka University Institutional Repository

আর্টিস্ট। খগা কোনদিন ভাইয়ের ছবি দেখে নি। দুভাইয়ে কোন মিল নেই। একজন অতি সাধারণ, একজন অতি আধুনিক। সমস্যা হল একদিন এক আর্ট প্রদর্শনীর বাল্ব ঠিক করছিল খগা। সেখানে ভগার ছবি ছিল। উকিল সাহেবের কথায় খগা ভিতরে প্রবেশ করে ভগার আঁকা ছবি দেখে। ছবির নাম মা। ছবিটিতে সে এঁকেছে একটি গালের উপরে আব। নাক, মুখ, চোখ কিছুই ছিল না। ছবি বেশ ভাল এঁকেছে। কিন্তু খগা পকেট থেকে ছুরি বের করে ক্যানভাস কেটে দিয়ে বলল– "ওই মায়ের ছবি হয়েছে। মায়ের মুখের ওই আবটা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও নি তুমি শুয়োর।" (৪খ, ২১৯পৃ.) এরপর স্বচ্ছন্দ এগিয়ে আসতেই নাকের উপর ঘুষি। রক্তারক্তি কাণ্ড। এরপর পুলিশ খগাকে অ্যারেস্ট করেছে। খগার মা স্বচ্ছন্দের সৎ মা। কেসে খগাকে কি বলা যায় সে কথাই উকিল সাহেব ভাবছেন। এখানে খগা সুপুত্র এবং ভগা (স্বচ্ছন্দ) পাজির পা-ঝাড়া, কিন্তু শেষে উকিল সাহেব কেসে হেরে গেলেন। খগার সাজা হল, পঁচিশ টাকা জরিমানা। হারার কারণ খগার মা ভগার হয়ে সাক্ষী দিয়েছে। সে বলেছে– সেই ভগাকে তার গালের আবের ছবি আঁকতে বলেছিল। এ ছবি ভগা তাকে অপমান করবার জন্য আঁকে নি। সুতরাং কেসে হারতে হল। পরে খগার মাকে প্রশ্ন করা হল কেন এমন করল, তখন সে বলল– "ভগা (স্বচ্ছন্দ) বংশের মুখোজ্জ্বল করেছে, খগা নয়। দশ জনের সামনে তার মাথা নিচু হয়ে যাবে সেটা কি ভাল? তাই আমি ওকেই জিতিয়ে দিলুম।" (৪খ, ২২০পৃ) আর শাস্তি তো খগাই ওকে দিয়েছে। খগার জরিমানার টাকা খগার মাই দিয়েছিলেন। আর ভগাকে নাকের প্লাস্টিক সার্জারি করতে আমেরিকা যেতে হল। মায়েরা কখনোই সন্তানকে ছোট করতে চান না। এই মায়েদের ধর্ম। 'তিমির সেতু' গল্পে দেখতে পাই দু ডাক্তারের জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটা অদ্ভুত মিল। এক সময় এরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। গোপাল সেন এক মফস্বল শহরের ডাক্তার। তবে তার অপারেশনের হাত ভাল হওয়ায় তিনি মফস্বলেই চোখ এবং হার্নিয়ার অপারেশন করছেন এবং রোগীরাও মহাখুশী। কিন্তু সিভিল সার্জন ক্যাপ্টেন সর্দার সিং সার্জারির 'স' জানেন না, কিন্তু তার অপারেশনের শখ। তাই গোপাল সেনকে লিখে দিলেন– অপারেশন কেস শহরে তার কাছে পাঠাতে। ডাক্তার সেন তার কোয়ার্টারে দশটি বেডের ব্যবস্থা করেন। এমন সময় একদিন হাসপাতালে সেক্রেটারির ছেলে ঘোড়া থেকে পড়ে হাঁটুর হাড় ভেঙে বেরিয়ে গেল। তখন ডাক্তার সেন তাকে ফার্স্ট এড দিয়ে সদরে নিয়ে যেতে বললেন এবং ক্যাপ্টেন সিং এর অর্ডারটা দেখালেন। সদরে গিয়ে ছেলেটি মারা গেল। সেক্রেটারি মকদ্দমা রুজু করে দিলেন এবং উপরওয়ালার কাছে বহু লোকের সই সহ দীর্ঘ দরখাস্ত গেল। আই,জি এলেন তদন্তে, যিনি খাঁটি সাহেব। তিনি ডাক্তার গোপালের কাছে গেলেন, সব শুনলেন, অর্ডারটি দেখলেন। ক্যাপ্টেন সিং সাথে ছিলেন। তিনি সেনের বাসায় রোগীর অপারেশন দেখলেন এবং সিংকে বললেন– তাঁর চোখে ছানি হলে তিনি ডাক্তার গোপালের কাছেই কাটাতেন, সিং এর কাছে নয়। ক্যাপ্টেন সিংকে বদলী করা

Dhaka University Institutional Repository

হল। কিন্তু সিং অপারেশন ছাড়ে নি। তার ভাল হওয়া রোগীদের সেনের কাছে পাঠাতেন। তবে এখন তিনি ভালই অপারেশন করেন। এরপর অনেকদিন যোগাযোগ নেই। ডাক্তার সেনের চোখে ছানি পড়েছে। তিনি মনে মনে ক্যাপ্টেন সিংকে খুঁজছেন ছানি কাটানোর জন্য। এমন সময় একদিন ক্যাপ্টেন সিং হাজির। তিনি এসেছেন ডাক্তার সেনের কাছে ছানি কাটাতে। এক সময় দুজন ছিলেন দুজনের প্রতিদ্বন্দ্বী আজ দুজনের মধ্যে এই অন্ধত্ব একটা সেতু তৈরি করে দিয়েছে। সমাজজীবনে এমন ঘটনা অহরহ ঘটে। ঘোর শত্রুও অনেক সময় এক পথের পথিক হয়ে যায়। মানুষের মন বড়ই বিচিত্র। আর মানবমনের এই রহস্যানুভূতিকে বনফুল তাঁর গল্পে নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন।

সামাজিক অসঙ্গতি

'চান্দ্রায়ণ' গল্পে আর,এম,এস-এর শর্টার চন্দ্রবাবুর প্রায়শ্চিত্তটিও কবি বিধাতার চরম দণ্ড বিধানের উদাহরণ। চাকরির সুযোগ গ্রহণ করে লুকিয়ে লুকিয়ে পরের প্রেমপত্র খুলে পড়ার দুষ্প্রবৃত্তি একেবারে মাথার ওপর বজ্রই ডেকে আনল। চান্দ্রায়ণ নামকরণের শ্লেষার্থটিও বড়ই নির্মম। চন্দ্র চরিতই চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্তকে অনিবার্য করে তুলেছে। চন্দ্র বাবু অন্যের প্রেমপত্র লুকিয়ে পড়তে গিয়ে একদিন নিজের স্ত্রী মাধুরীর প্রেমপত্র তার হাত পড়ে– তাতে মাধুরী লিখেছে– তার পালিয়ে যাওয়ার কথা। এ চিঠি চন্দ্রবাবুর জীবনে বজ্রাঘাত হানে। এ যে তার অন্যের প্রেমপত্র লুকিয়ে পড়ার প্রায়শ্চিত্ত। অবশ্য আর্টিস্ট হিসাবে এখানে স্যাটায়ারিস্টের শিল্প ভাষণ 'কান্তাসম্মিত' নয়, একেবারে 'প্রভুসম্মিত'। কবি প্রজাপতির চেয়ে কবি বিধাতাই এখানে অধিকতর সক্রিয়। 'মন্মথ' গল্প লেখক মানুষের মনের গভীরতাকে অনেকটা রসিকতার মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। ডাক্তার বাবুর চেম্বারে মন্মথ কম্পাউন্ডারী করে। সে বিবাহিত, ছেলেমেয়েও আছে। তবু তার ভাললাগে পুরুষোত্তম বাবুর কুমারী কন্যা ফনতিকে। সে মনের আবেগ দিয়ে ফনতিকে চিঠি লিখেছে– "নিদমহলের আলোছায়ায় রজনীগন্ধার আবেশের মতো যে স্বপ্ন আমাকে উতলা করে তোলে তা কি তুমি জানো না? মর্মের মর্মর শয্যায় যে রাজকন্যা শতদলের পাপড়ির উপর ঘুমিয়ে আছে তার ঘুম ভাঙ্গাবার সোনার কাঠি কোথায় পাব। প্রাণের ফন্তু, তুমিই বলে দাও কোথাও পাব ...।" (৩খ, ১৩১পৃ.) এ ধরনের উচ্ছ্বাস পাতার পর পাতা। চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, বউ আসন্ন প্রসবা, সে নিজে লম্বা গুঁটকো গালের হাড় উঁচু; এমন লোকটা এত ভাল বাংলা জানে তাই বা কে জানত! পুরুষোত্তম বাবু নালিশ জানিয়ে গেছে, ডাক্তারকে বিচার করতে হবে। ডাক্তার বাবু পুরুষোত্তম বাবুকে ফতনির হাতের লেখা নিয়ে আসতে বললেন। মন্মথর কাছ থেকে ফতনির লেখা চিঠির সাথে মিলিয়ে দেখলো ওগুলো ফতনি লেখে নি। সন্দেহ হল, ছোট বিল্টু, সে পিতৃহীন, ডাক্তার বাবুর ফরমাস খাটে এবং সেখানে লেখাপড়া করে। বিল্টু

Dhaka University Institutional Repository

মন্মথর চিঠি আদান প্রদান করত। পরে জানা গেল– বিল্টু চিঠি লিখেছে শৈলদি, আভাদি, পুষ্পদির সহযোগিতায়। ফনতি একটিও চিঠি লেখে নি। কেন লিখেছে জানতে চাইলে বলে– চিঠি এনে দিলে কম্পাউন্ডার বাবু আট আনা দিলে সবাই মিলে রসগোল্লা কিনে খেত। বিল্টুর কথায় মন্মথর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং ডাক্তার বাবু তাকে আর বকা দিলেন না। এখানে হালকা রসিকতার মধ্যে দিয়ে দরিদ্র কম্পাউন্ডারের প্রেম কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন। এখানেও লেখক সামাজিক অসঙ্গতিকে তীব্র চাবুক হেনেছেন।

'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পটিতে সমাজের এক শ্রেণীর লোকের নকল ভদ্রতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। গল্পের নাম চরিত্র শ্রীপতি সামন্ত, "পরনে একটি আধ ময়লা থান, খালি গা, গায়ে ধূলি ধূসরিত এক জোড়া দেশী মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডান দিকে ডান্ডাটা নাই। সেদিকে সূতা বাঁধা।" (১খ, ১৮০পৃ.) এই দীন দরিদ্র চেহারা নিয়ে ট্রেনের ভিড়ে যখন প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটিতে একটু আসন পাবার জন্য করুণ আবেদন জানালেন তখন তাতে আপত্তি হল পাইপ-শোভিত-বদন সাহেবি পোশাকধারী প্রথম শ্রেণীর বাঙালি যাত্রী বাবুটির। কোথাও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। পায়দানে পর্যন্ত লোক ঝুলছে। সুতরাং সামন্ত মহাশয় স্থির করলেন ভৃত্যের রুমটিতে স্থান নিবেনই। তার ঘুমের একান্ত প্রয়োজন। যথাসময়ে পাঞ্জাবি ক্রু বলেন টিকিট কাটতে। সামন্ত মহাশয় শুধু নিজের হিসেব কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিলেন না, ঐ ভণ্ড বাঙালি সাহেবটিকে বিনা-টিকিটে ভ্রমণের লজ্জা আর অপমান থেকে রক্ষার জন্য তারও সমস্ত চার্জ পাঞ্জাবি ক্রুকে বুঝিয়ে দিলেন। তখন আর নকল প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর মুখে কথাটি নেই। বনফুল মেকি ভদ্রতার মুখেই যেন চাবুক হানলেন। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য– "বাঙালী সমাজের যথার্থ প্রতিনিধিরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীপতি সামন্তদের এখন আর দেখা যায় না। তার বদলে যারা এখন সমাজে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তারা আত্মসর্বস্বতা এবং ঐতিহ্যহীনতার মূর্ত প্রতীক।"[৭] সামজে এখন শ্রীপতি সামন্ত, চম্পা মিশিরের মত লোকের বড় প্রয়োজন। আসলে "শ্রীপতি সামন্ত নিম্নবর্গের মানুষ নন। তিনি খাঁটি বাঙালি। প্রথম শ্রেণীর বিনা টিকিটের যাত্রী, সাহেবী পোশাক পরা, সিংহচর্মাবৃত নির্লজ্জ গর্দভটি বাঙালীর কলঙ্ক, সেকথা সামন্ত তাঁর করুণা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। মেকীর ওপর বনফুল চিরদিনই খগড় হস্ত।"[৮] তিনি সর্বত্রই সমাজের মেকী ভদ্রতার মুখোশের উপর নিষ্ঠুর ভাবে অস্ত্রপ্রচার করেছেন। 'ছোটলোক' গল্পে বনফুল যে চাবুক হানলেন, তা আরও সূক্ষ্ম। 'ছোটলোক' গল্পটিতে দেখতে পাই উন্নত মস্তক রাঘব সরকারকে। তিনি যথাসাধ্য সকলের উপকার করে থাকেন, পারত পক্ষে কারও দ্বারা উপকৃত হন না। নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করে দ্বিপ্রহরে দ্রুত পথ চলছিলেন। ঠুনঠুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে এক রিক্সাওয়ালা তার পিছু নিল– রিক্সা চাই বাবু, রিক্সা, রাঘব বাবু বললেন চাই না।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি কখনো পালকি অথবা রিক্সা চড়েন নাই। তার ধারণা যারা নিতান্ত অমানুষ তারাই মানুষের কাঁধে চড়ে থাকে। অস্থি চর্মসার রিক্সাওয়ালাকে দেখে হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হল। তখন তিনি রিক্সাওয়ালাকে বললেন– "শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক'পয়সা নিবি?' 'ছ পয়সা'– আচ্ছা আয়।" (১খ, ৩২৫পৃ.) রিক্সাওয়ালা পিছু ছুটতে ছুটতে বলতে লাগল আসুন বাবু, চড়ুন। শিবতলা পৌঁছে রিক্সাওয়ালা বলল আপনি চড়লেন কই। রাঘব বাবু বলল, 'আমি রিক্সা চড়ি না। রিক্সা চড়া পাপ।' রিক্সাওয়ালা বলল, 'আগে বললেই পারতেন।' তার মুখে নীরব অবজ্ঞা। রাঘব বাবু তাকে ছ পয়সা দিতে চাইলেন। তখন সে বলল, 'আমি ভিক্ষা নেই না।' ঠুন ঠুন ঘন্টা বাজিয়ে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মানুষের অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কার

জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার মানুষকে এক রকম দুর্গতি ও দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দিতে পারে বনফুল তার স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই তা অবলোকন করেছেন এবং গল্পে সাবলিলভাবে তার প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। 'বাঘা' গল্পে সমাজের কুসংস্কার বাস্তবে যে কতটা চরমে পৌঁছতে পারে তা তুলে ধরেছেন। গল্পে তারিণীচরণ একটি কুকুর পোষে যার নাম বাঘা। হঠাৎ শিরোমনির দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে বাঘা আসলে কুকুর নয়। এক বছর পূর্বে তারিণীচরণের অগ্রজ সরজ কুকুরযোনিপ্রাপ্ত হয়ে বাঘার রূপ ধরে এসেছে। বিহ্বল তারিণীচরণ এই প্রেতলৌকিক সংবাদে অভিভূত হয়ে বাঘার বন্দনদশা মোচন করে যথাকালে স্বস্ত্যয়নাদি কৃত্য সম্পন্ন করলেন এবং কুকুরযোনিপ্রাপ্ত অগ্রজের যথাসাধ্য সেবাযত্ন করতে লাগলেন। এইভাবে কিছুদিন যাবার পর কর্মচারী ছাঁটাই এর কাটিতে তারিণীচরণের চাকরি কাটা গেল। এদিকে অগ্রজও অন্নজল ত্যাগ করলেন। শিরোমনি শুনে বললেন, "চাকরি গেছে দেখে ও অন্নজল ত্যাগ করবে না তো কে করবে? হাজার হোক দাদাতো।" (১খ, ৩৫৩ পৃ.) কাজেই দ্বিগুণ কৃতজ্ঞতায় অনুজ অন্ধকার গৃহকোনাশ্রয়ী অগ্রজকে অনশনব্রত ভাঙ্গানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ফল যা হবার তাই হল, পাগলা কুকুর তারিণীকে কামড়ে মারা গেল। দিব্যদ্রষ্টা শিরোমনিও বাদ গেলেন না, তাঁকে কামড়ালেন তারিণী নিজে। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ডাক্তার বললেন, দুজনেরই জলাতঙ্ক হয়েছে, বাঁচবার আশা নেই। সুতরাং "এখন সর্ববাদি সম্মতিক্রমে হরিসংকীর্তন হচ্ছে।" (১খ, ৩৫৪পৃ.)। অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কারের কারণে জলজ্যান্ত দুটো প্রাণকে বিসর্জন দিতে হল। 'কাকের কাণ্ড' গল্পে প্রত্যক্ষ করি, কুসংস্কার মানুষকে কিভাবে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়ায়। এ গল্পে বায়স-রব অশুভশঙ্কী– এই সংস্কার থেকেই জগত্তারিণীর কাক তাড়ানোর প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হয়ে গল্পের পরিণাম রচনা করেছে। জগত্তারিণীর মনে পড়ল– "কর্তা যে অসুখে মারা যায়, সেই অসুখটি হইবার পূর্বে ঠিক এমনিই ভাবে কাক ডাকিয়াছিল। কি অলুক্ষুণে

Dhaka University Institutional Repository

ডাক।" (১খ, ৩০৪ পৃ.) সন্তান ভাগ্যে জগত্তারিণী ভাগ্যবতী, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা সবাই বিদেশে, কার কি অমঙ্গল হবে এ আশঙ্কায় কাকের ডাক শুনে বৃদ্ধা বিচলিত হয়ে উঠলেন। কোমরের ব্যথায় প্রায় অচল হওয়া সত্ত্বেও উঠানে নেমে কাক তাড়াতে গিয়ে পিছলে পড়ে এক কাণ্ড করে বসলেন। অমনি তাঁর কঠিন অসুখের সংবাদ বহন করে চারদিকে তার বার্তা প্রেরিত হল। পুত্রকন্যারা স্ব-স্ব দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ম ফেলে রেখে ছুটে এলেন। জননীর অসুখ যতটা কঠিন মনে হয়েছিল ততটা অবশ্য হয় নি। কিন্তু সামান্য একটি কাকের ডাক একটি পরিবারে কি হুলস্থুল কাণ্ডই না করল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ কুসংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাস মানুষের কতটা দুর্ভোগ ও দুর্গতির কারণ হতে পারে বনফুল তাঁর চিরাচরিত দৃষ্টি দিয়েই তা অবলোকন করেছেন এবং গল্পে সার্থকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পে সাপের ওঝার প্রতি মানুষের মূঢ় আস্থা পরিহাসিত হয়েছে। হারু ঘোষের সেঝ ছেলেকে যে গোখরো সাপটি কামড়েছিল বিশু বাগদি তাকে বল্লমের আগায় বিঁধে রেখেছে। ছেলেটিকে ডাক্তার যথাসাধ্য ঔষুধপত্র লাগিয়ে গেছেন। এমন সময় সেখানে এক আগন্তুকের আবির্ভাব হল, তার কথা বার্তায় সবার ধারণা হল যে, সে একজন গুণী ওঝা। অতএব তার হাতেই সমর্পণ করা হল হারু ঘোষের ছেলেকে। ওস্তাদ সাপটিকে বল্লমমুক্ত করে অন্দরে তার চুমু খেয়ে ওস্তাদি দেখাল। ফলে হারু ঘোষের ছেলের মৃতদেহের পাশেই তারও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেহটি স্থান পেল। উত্তেজিত জনতা এই অলৌকিক কাণ্ডের পরিণাম অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে তখন জানা গেল যে, যাকে সাপের ওঝা বলে মনে করেছে আসলে সে একটি পাগল। পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। কিন্তু পাগল কি শুধু ঐ একটি লোকই? আমাদের অন্ধভক্তি ও কুসংস্কারের কাছে আমরা সবাই পাগল নয়তো? পাড়াশুদ্ধ লোকের সামনে পাগলটি কি করে স্থান পায়। আধুনিক চিকিৎসা বর্জন করে ছেলেটিকে সবাই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। আমাদের সমাজের এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাস্ত ব চিত্রগুলো লেখক সার্থকতার সাথে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 'জাগ্রত দেবতা' গল্পে অনুরূপ অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সনাতনপুরের মহাদেবের নাম শোনে নাই এমন কেউ নেই। জাগ্রত মহাদেবের নানা কাহিনী আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই জানে। পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, তা অলৌকিক বটে। তাকে অস্বীকার করে কোন উপায় নেই, তেমনি এক ঘটনা। সনাতনপুরের মহাদেবের কাছে মানত করে অনেকে অনেক কিছু পেয়েছেন। তাইতো এলাকাবাসীর বিশ্বাস, তিনি জাগ্রত, তার একটা বড় প্রমাণও আছে। প্রতিবছর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সনাতনপুরে মহাদেবকে কেন্দ্র করে প্রকাণ্ড উৎসব হয়। আর প্রতিবছরই এই উৎসবের পর ঐ এলাকায় এক জন লোক পাগল হয়ে যায়। পাগল ভোলানাথ প্রতি বছর একজনকে তার নিজের দলে টেনে নেন।

সে বছর উৎসব শেষে, যাদব এসে খবর দিল এ বছর কেউ পাগল হয় নি। সকলের বিশ্বাস ছিল গেঁজেল বিশেটা এবার পাগল হবে। তার মাথাও দিব্যি ঠিক আছে। প্রবীণ

Dhaka University Institutional Repository
নীলমনি এতক্ষণ নীরবে তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, এ হতে পারে না, ভাল করে খুঁজে দেখ, কেউ নিশ্চয় পাগল হয়েছে, চিরকাল ধরে হয়ে আসছে। কিছুতেই তাকে বোঝানো যাচ্ছিল না যে সব ঠিক আছে। অতপর নীলমনি নিজেই খুঁজতে লেগে গেলেন। সনাতনপুরের লোকের মনে অজানা সংশয়, না জানি কি অমঙ্গল হয়। দৃঢ় বিশ্বাসী নীলমনি দমলেন না, তার বিশ্বাস কেউ পাগল না হয়ে পারে না, তা না হলে মহাদেবের মহাত্ম নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। দারুণ দ্বিপ্রহর, বৈশাখের দ্বিপ্রহর। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। কেবল একটি লোক রক্তচোখ, স্ফীত নাসা, ঘুরছে, আর খোঁজ করছে পাগলটা কোথায় গেল? সনাতনপুর বাসিগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে। তার বড় প্রমাণ নীলমনি নিজেই।

'উচিত-অনুচিত' গল্পে আমাদের সাধারণ মানুষের কিছু সংস্কার আছে। তা ভেঙে বের হওয়া খুবই কঠিন। এই সাধারণ মানুষদের মানসিক প্রবৃত্তিকে লেখক এ গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পে মূল চরিত্রদ্বয় হচ্ছে মিত্তির বাড়ির শফরী এবং বসুদের বাড়ির ক্যাবলা। দুজনের মধ্যে বেশ ভাব, কিন্তু দু পরিবারের লোক বলে তাদের সম্পর্ক ভাই-বোনের মত। তাদের ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আরও ভাল পাত্রী এবং পাত্র মিলবে। দু'পরিবারে সব জল্পনা কল্পনা উড়িয়ে দিয়ে একদিন শফরীকে নিয়ে ক্যাবলা মানে অশোক পলায়ন করল। এর পরের ঘটনা গল্প-কথকের জানা নেই। পাঁচ বছর পর এক নামজাদা প্রেক্ষাগৃহে গল্প-কথক সিনেমা দেখছেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন এ যে অশোক ও শফরী। ওরা এখন নামী নায়ক-নায়িকা। পিছনের সিটে বসা কুঞ্জনাথ, হরগোবিন্দ এবং দুইটি প্রৌঢ়া মহিলা মানে শফরী ও অশোকের বাবা-মায়েরা। আরও পনেরো বছর কেটে গেল। একদিন সকালে শফরী ও অশোক সাথে একটি চমৎকার মেয়ে নিয়ে বেড়াতে এল গল্প-কথকের বাসায়। তারা বলল– তাদের মেয়ে রুমা এবার ম্যাট্রিক দেবে। কিন্তু তারা তাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চায়। এবং গল্প-কথকের ছেলে এবার ডাক্তারি পাশ করেছে। তারা পালটি ঘরও। আরও বলল তারা এক লক্ষ টাকা পন দেবে। কিন্তু তিনি রাজি হতে পারলেন না। তিনি বললেন ভেবে দেখি– খোঁজ নিয়ে জেনেছেন ওরা আইন অনুসারে বিয়ে করেছেন। রুমা জারজ নয়। তবু কোথায় যেন বাঁধল। আমাদের সমাজের সকলেই এমন সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে আছে। এর কোন মানে নেই। তবু চিত্রজগতের লোকদের কেউই সংসার জীবনে টানতে চায় না। 'বেহুলা' গল্পে নারীদের পতিভক্তির দিকটি তুলে ধরেছেন। বেহুলা যেমন লক্ষিণদরকে নিয়ে ভেসেছে। তার পতিভক্তির পরিচয় দিয়েছে। এখনে একটি মেয়ে ডাক্তার সাহেবের কাছে আসে তার মাথার সিঁথিতে ঘা হয়েছে তা দেখাতে। ডাক্তার সাহেব ভাল করে পরীক্ষা করেছে এক্সিমা– সেখানে কাল দাগ পড়েছে। ডাক্তার ভেবেছে হয়তো আলকাতরা দিয়েছে, তখন ডাক্তার মেয়েটিকে বললেন ঘায়ে আলকাতরা দিও না। ডাক্তার একটা মলম

Dhaka University Institutional Repository

দিলেন, মেয়েটি চলে গেল। এরপর চার-পাঁচদিন পর ডাক্তার বাবুর দেখা মেয়েটির সাথে গঙ্গার পারে। দেখে গাড়ি থামালেন, দেখলেন মেয়েটির মাথা থেকে রক্ত ঝরছে, ডাক্তার বললেন, 'মলম লাগাও নি, এখন দেখি ঘা থেকে রক্ত পড়ছে। তোমার বাড়ি, সে বলল, পূর্নিয়া। সে সাপুড়ে, থাকে গঙ্গার পাড়ে একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে। ডাক্তার বাবু চলে গেলেন। এরপর মেয়েটি আর চেম্বারে আসে নি। এরমধ্যে একটি ছেলে এসে ডাক্তার বাবুকে বলল একটি মেয়ে গঙ্গার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার বাবু মেয়েটিকে দেখতে গিয়ে দেখেন সেই মেয়েটি। খুব জ্বর, হাসপাতালে বেড নেই, কি করা ঐ কুঁড়ে ঘরেই তার ব্যবস্থা করা হল, পাড়ার ছাত্র সমিতির ছেলেরা তাকে সেবা করে সারিয়ে তুলল, একমাস পরে জ্বর ছাড়ল। এরপর আবার একদিন একটি ছেলে এসে বলল, মেয়েটির গলায় একটা গোখরো সাপ জড়িয়ে কামড়াচ্ছে। ডাক্তার গিয়ে দেখেন সাপটা মেয়েটির বাহু জড়িয়ে আর মেয়েটি সাপটির ফনা সজোরে চেপে ধরেছে। মেয়েটির তখন জ্ঞান আছে– সে বলল, আজ ও জো পেয়েছে, তাই কামড়েছে, তার বিয়ের রাতে ঘরে ঢুকে সাপটি তার স্বামীকে কামড়ে দেয়, সেই সময় মেয়েটি সাপ ধরে রাখে। সে যমের সঙ্গ ছাড়ে নি, সাপকে সাথে নিয়ে চলছে। আর নদীর পারে পারে ঘুরছে। তার স্বামীকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে ঐসাপের রক্ত দিয়ে সে সিঁদুর পরে আর বলে স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে। জ্বরে সে সাপের বিষ দাঁত ভাঙ্গতে পারে নি তাই মেয়েটিকে কামড়ে দিয়েছে। এর একটু পরে একসাথে মেয়ে এবং সাপটির মৃত্যু হয়। এ মেয়েটির মৃত্যু এবং স্বামীর প্রতি ভালবাসা যেন সেই পুরানের বেহুলার কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানেও সেই কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল এই পতিভক্ত মেয়েটিকে।

সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তবচিত্র

বনফুল তাঁর সহমর্মী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে সমাজের নিষ্ঠুর চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন। "স্বাধীনতার যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা বাস্তবায়িত হয় নি। ফলে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে দেশ বিভাগ, রাজনীতিকদের মিথ্যাচার, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কঠোর সমালোচনা করেছেন।"[৯] তা আমরা তাঁর গল্পাণুর মাঝে দেখতে পাই। তাঁর 'হাবি আর নবু', 'বিশু আর ননী', 'ভোটার সাবিত্রী বালা' গল্পে তিনি রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রীদের চরম কষাঘাত হেনেছেন। আসলে– "বৈজ্ঞানিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন সমাজের বৈষম্য।"[১০] তাই গল্পে সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তব চিত্র তিনি সমাজের গভীরতম অন্ধকার থেকে টেনে-হিঁচড়ে আলোক উজ্জ্বল পরিবেশে পরিবেশন করেছেন। এ ধরনের গল্পের মধ্যে আমরা যেগুলো আলোচনা করব তাহল– হাবি আর নবু, বিশু আর ননী, রাবারের হাতি, ভোটার সাবিত্রী বালা, রাম সেবক, প্রাণ কান্ত,

Dhaka University Institutional Repository
প্রয়োজন, গল্প নয়, ধনী-দরিদ্র, হর্ষডাক্তার, নদী, ছায়া ও বাস্তব, গীতার ভাষ্য, বুড়ীটা কেন এমন, যদু, ক্ষতের গভীরতা। সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তব চিত্র অঙ্কনে জীবন শিল্পী বনফুল অনন্য। 'হাবি আর নবু' গল্পে আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র লেখক চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। 'হাবি আর নবু' গল্পে আছে নেতাদের বড় বড় বুলির কথা। সেগুলো কখনো বাস্তবে রূপান্তরের চেষ্টা করেন না তারা। গল্পে হাবি ও নবু দু ভাই-বোন। বাপকে কখনো দেখে নি, মা যতদিন বেঁচেছিলেন– ঝি-বৃত্তি করেছে। সে মারা গেল। তার তখন বয়স চৌদ্দ পনের। পাড়ার ছেলেরা চাঁদা তুলে তার মায়ের সৎকার করল। পাড়ার মাস্তান জিতুর জ্বালায় সে পাড়ায় ঝি-গিরি নেয় নি। তাকে দেখলে অশ্লীল কথা বলে। তার উঠতি বয়সের জন্য কোথাও ঝি-গিরির কাজ পায় নি। তার মায়ের একটি সরু সোনার হার ছিল তা বিক্রি করে চার বছরের ছোট ভাইয়ের জন্য খাবার ব্যবস্থা করেছে। সে খুব ভোরে বের হয়ে ভিক্ষে করে। এবং ডাস্টবিন ঘেঁটে এটা সেটা বাড়িতে নিয়ে আসে ভাইয়ের জন্য। সে রাস্তায় অনেক কিছু দেখে। মাঝে ভাইয়ের মন খারাপ হয়। সেদিন রাস্তায় লোকারণ্য। প্রকাণ্ড মিটিং এ একজন লোক বক্তৃতা করছে– "আমাদের পণ, আমরা প্রত্যেকের মুখে পুষ্টিকর খাবার তুলে দেব, প্রত্যেকের কাপড় জামার ব্যবস্থা করব, প্রত্যেকের ঘর-বাড়ি বানিয়ে দেব, সর্বহারারাই সব পাবে আবার।" (২খ, ১৫৪পৃ) হাবির কাছে মনে হয় রূপকথা। এর মধ্যে বোমার শব্দে সবাই পালাল, হাবিও ছুটতে ছুটতে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ ডাস্টবিনে একটা বাক্স দেখে থমকে দাঁড়াল। দুটো কাটিও আছে। বাড়ি এসে নবুকে দেখাল কি মজার জিনিস সে এনেছে– ফুল ঝুরিতে আগুন লাগিয়ে নবুকে দেখাল সে খুব খুশী। কত সামান্যতেই হাবি ও নবু খুশী। কিন্তু এদেশের নেতার বড় বড় বুলি ঝাড়ে, হাবি ও নবুর খবর তারা রাখে না। লেখক এখনে সমাজের বাস্তব চিত্র চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। 'বিশু আর ননী' গল্পে আমাদের সমাজের এক বাস্তব খণ্ডচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বিশু চাষা যে গ্রামে বাস করে সেখানে কোন ডাক্তার নেই। সেখান থেকে পনের ক্রোশ দূরে বড় সরকারি হাসপাতাল আছে। বিশু চাষার একমাত্র ছেলের অসুখ বাড়াবাড়ি। সে ছেলেকে কোলে করে দুদিন পরে ক্লান্ত হয়ে হাসপাতালে এসে পৌছল। এসে দেখে বড় হাসপাতাল। সারি সারি বাড়ি। গিজ গিজ করছে লোক। অনেক ঘোরাঘুরির পর একজন ডাক্তারের নাগাল পেল। কিন্তু তিনি বললেন বেড নেই। এর মানে বিশু বুঝল না। শেষে এক ধূর্ত গোছের লোক এসে বলল-- পঁচিশ টাকা হলে ভর্তি করে দেব। কিন্তু বিশুর এত টাকা নেই। তখন বিশু হাসপাতালের বারান্দায় সবার পা ধরতে লাগল কিন্তু কাজ হল না। শেষে এক ডাক্তারের পা ধরে হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল– "এত বড় হাসপাতালের বারান্দায় শুয়ে আমার ননী বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। দয়া করুন, দয়া করুন ডাক্তার বাবু। তখন ডাক্তার একটু জায়গা করে দিল। কিন্তু দুঘণ্টা চলে গেল কোন

Dhaka University Institutional Repository

ঔষুধ এল না। একটা লোক এসে বলল, কম্পাউন্ডারকে টাকা দাও তবে ঔষুধ হবে। বিশু বলল ওকে ঔষধ দিন পরে না হয় ভিক্ষে করে পয়সা এনে দেব। দুঘণ্টা কেটে গেল ঔষধ এল না। এর কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ননী খাবি খাচ্ছে। বিশু আর্তনাদ করে ওঠে, "ওরে বাবা ননীরে" (২খ, ১৭৯পৃ), কিন্তু একটা লরির আর্তনাদে সে আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল। পরদিন খবরের কাগজে ছাপা হল স্বাস্থ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন– "এবার দেশের লোকের সুচিকিৎসার জন্য নাকি কয়েক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার।" (২খ, ১৭৯পৃ) যেখানে কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে চিকিৎসার জন্য সেখানে বিনা চিকিৎসায় প্রতিদিন হাজারো ননী মারা যাচ্ছে আর হাজারো বিশুর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। এ যেন এদেশের এক বাস্তব চিত্র। 'ভোটার সাবিত্রী বালা' গল্পে বনফুল সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের চরম দুর্গতি ও দুর্দশার বাস্তব চিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছেন। সাবিত্রী বালার স্বামী মোহনাশ তর্কতীর্থ ছিলেন একটা টোলের পণ্ডিত। অতিশয় দারিদ্র্যের কারণে তাদের দুছেলেকে লেখাপড়া করাতে পারেন নি। তার ছেলে তমোনাশের বয়স যখন ছয় এবং রিপুনাশের বয়স তিন, তখন তাদের বাবা মারা গেল। সাবিত্রী বালা রাঁধুনি বৃত্তি করে সংসার চালাত। তমো নাশের বয়স যখন ষোল তখন সে মাস্তানী করে বেড়াত। যা পেত কিছু মাকে দিত, বাকিটা নিজের প্রমোদের জন্য রাখত। কিন্তু একদিন গুণ্ডামি করতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে মারা গেল। দেহটি ময়নাতদন্তের পর সাবিত্রী দাবি করল না। কারণ তার সৎকার করার মত অর্থ ছিল না। সে কাঁদলও না। এরপর ছোট ছেলে রিপুনাশ সে ছিল রুগ্ন তবু মুটেগিরি করে যা পেত মাকে দিত। কিন্তু দেখা গেল তার যক্ষ্মা হয়েছে। সাবিত্রী দিন সাতেক হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করে দেখল কোন লাভ নেই, টাকা ছাড়া চিকিৎসা সম্ভব নয়। সে আর হাসপাতালে যায় নি। কিন্তু রিপু ভাবল চুরি করে জেলে যেতে পারলে হয় তার অসুখ ভাল হবে। কিন্তু তার মাত্র একমাস জেল হল। চিকিৎসাও হল কিন্তু ভাল হল না। এর এক মাস পরে সে সাবিত্রীর পায়ের উপর রক্তবমি করতে করতে মারা গেল। এবার নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কাঁদল না, শুধু চোখ দিয়ে আগুন বের হল। এর দুমাস পরে নির্বাচন। প্রার্থী এল ভোট চাইতে। সাবিত্রী বলল, কেন সে ভোট দেবে। তার কোন উপকারেই কেউ আসে নি। তার চোখের সামনে বিদ্বান স্বামী ও নিরক্ষর ছেলেরা মরেছে। সে চিৎকার করে উঠল– "বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।" (২খ, ২৫৫পৃ) সাবিত্রী দরজা বন্ধ করে দিল। এমন হাজারো সাবিত্রী বালা আছে আমাদের সমাজে। ভোটের সময় বড় বড় বুলি নেতাদের কিন্তু কাজের বেলায় নেই। 'রাবারের হাতি' গল্পটি যদিও একটি ছোট বাচ্চাকে নিয়ে। তবু এর মাঝে লুকিয়ে আছে এদেশের সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশ। সব মিলিয়ে গল্পটিতে আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পে ছোট একটি মেয়ে তুফানী। তার বাবা এক অফিসের কেরানী ছিল। একদিন সে অফিস থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ফিরছে না। পরে জানা গেল বাস চাপা পড়েছে, তবে মারা যায় নি। হাত দুটো কাটা গেছে। চাকরি গেল। তুফানীদের ছোট সুখের সংসারে নেমে এল কাল ছায়া। তারা পাড়া ছেড়ে দূরে হাওড়ায় চলে গেল। সেখানে তার মা একটি বৃদ্ধকে দেখাশোনার চাকরি নিয়েছে। একটা দোতলা মাটির টিনের ঘরের একতালায় তারা থাকে। আগে গৌতমরা তাদের প্রতিবেশী ছিল। গৌতম মটর মেকানিক। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলে তুফানী এসে গৌতমদাকে অস্থির করে দিত। গল্পো বল, নয় লুডু খেল, গৌতমের হাত পা ব্যথা হলে, ওর ছোট হাত দিয়ে পা টিপে দিত। তুফানীরা চলে যাওয়ায় গৌতমের মনটা খারাপ হয়। তাই সে মাঝে মাঝে হাওড়ায় ওকে দেখতে যায়। রবিবার দিন তুফানীকে একটা সাদা রাবারের হাতি কিনে দেয়ার কথা বলেছিল গৌতম। কিন্তু চার পাঁচ দিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি। কলকাতার সব রাস্তা নদী। তবু তুফানীর কথা মনে করে গৌতম বেরিয়ে পড়ল। রবিবার দোকান বন্ধ। শেষে দোকানদারের বাড়ি গিয়ে অনুনয় করে হাতি কিনল। বাস নেই– অনেক কষ্টে কদমতলা পর্যন্ত পৌঁছল। এরপর কাঁদা জলে হেঁটে গৌতম তুফানীর বস্তিতে পৌঁছল। তারপর যা শুনল তাতে তার রক্ত জল হয়ে গেল। বর্ষায় তুফানীদের মাটির ঘর পড়ে গেছে। তার তলায় তুফানী, তার মা-বাবা চাপা পড়েছে। তখন পুলিশ আসে নি। গৌতম হাতিটা সেই ঘরে স্তূপের দিকে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য হল, রাবারের হাতি ডোবার কথা নয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পর ডুবে গেল। গৌতমের মনে হল তুফানী হাতিটা নিয়ে নিয়েছে। এ গল্পে আমাদের সমাজের মানুষের এবং প্রকৃতির পরিচয় মেলে।

'রাম সেবক' গল্পটিতে এ সমাজের সাধারণ মানুষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। 'রাম সেবক' গল্পের মূল চরিত্র রাম সেবক রায় বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের সুসংস্কার-কুসংস্কার, ভালো-মন্দের মধ্যেই মানুষ। ছোট বেলা থেকে পূজা অর্চনায়ও মন ছিল। ক্লাসেও ভাল ছাত্র ছিল। শুধু একটু বিপথে গিয়েছিল এই যে মণ্টুর প্রেমে পড়েছিল। সেখানেও সমস্যা হয় নি। মণ্টু পাড়ার মেয়ে, স্বজাতি এবং পালটি ঘর। সুতরাং বিয়েও হয়েছিল। ইংরেজের আমল বলে ভালো চাকরি জোটে নি। কেরানীগিরি করেই শেষ জীবনে দুইশত টাকা বেতন হয়েছিল। ধর্ম-কর্ম, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সাধারণ জীবন, আটটি ছেলে-মেয়ের তিনটি মারা যায়, রাম সেবক চিকিৎসার ত্রুটি করে নি। কিন্তু নারায়ণ দয়া করে নি। এত নারায়ণভক্তি কিন্তু জীবনে কখনো সাফল্য আসে নি। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর শখ হল মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হওয়ার– এবার ভোট যুদ্ধে অবতরণ করবে। বাড়িতে সে পুরোহিত নিযুক্ত করেছে– নারায়ণকে প্রত্যহ তুলসী দিবার ব্যবস্থা করেছে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ভোট যুদ্ধেও পরাজিত হয়েছে। নির্বাচিত হয়েছে মাতাল দুশ্চরিত্র গোলক বাবু। এরপর রাম সেবকের মৃত্যু কাল উপস্থিত। ছেলে-মেয়েরা হরিনাম শুনাচ্ছে। কিন্তু সে চিৎকার করে উঠল– "চোপ রও"। নারায়ণের মূর্তি সামনে ধরার

Dhaka University Institutional Repository

কথা বলতে বলল– "চোপ রও"। শেষে স্ত্রী মণ্টুকে বলল– "তুমি সামনে এস" (২খ, ১৮৭পৃ.) তার চোখে চোখ রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। যদিও পত্রিকায় ছাপা হল- হরিনাম করতে করতে সাধনোচিতধামে মহাপ্রয়াণ করেছে। গল্পের মূল কথা সাধারণ নিরীহ, ধর্মপ্রাণ মানুষই জীবনযুদ্ধে বারবার পরাজয় বরণ করে। অন্যদিকে তোষামোদকারী, মতাল দুশ্চরিত্ররা দাপটের সাথে চলে। আমাদের সমাজে এরূপ চিত্র অহরহ চোখে পড়ে।

'প্রাণকান্ত' গল্পে আমাদের সমাজের একটি বাস্তব দিক তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের এ সমাজে নির্বাচনের একটা গুরুত্ব আছে। নির্বাচিত প্রতিনিধির কার্যকলাপে এলাকার উন্নতি– সমাজের উন্নতি। কিন্তু নির্বাচনকে নিয়ে আমরা চিন্তিত। যদি কোন ভাল লোক নির্বাচনে প্রার্থী হয়। তখন ভাবি, লোকটি ভাল তবে একে ভোট দেব না। এটা যেন সমাজের রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। যে বেশি প্রবঞ্চনা করে তাকেই আমরা ভোট দেই। কারণ ভাল লোক সকলের মন রক্ষা করতে পারে না। সুতরাং প্রিয় বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও প্রাণকান্তকে ভোট দেয়া যাবে না। পরিশেষে জানা গেল মাত্র এক ভোটে বন্ধু হেরে গেছে। তখন দুঃখ হল। কিন্তু প্রাণকান্তের সেজন্য দুঃখ নেই। কারণ সে হেরেও বাজিতে জিতেছে। কারণ সে বাজি ধরেছিল ভোটে ঠকবে। বন্ধুর একটি ভোট পেলে জিতেও যেত। সুতরাং বাজির টাকায় বন্ধুর স্ত্রীর জন্য কানের দুল গড়ে এনেছেন। এমন নির্ভেজাল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও লেখক বন্ধুকে ভোট দিল না। এটা আমাদের সমাজের একটা ব্যাধি। লেখক এখানে হাস্যরসের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। রাম সেবক যেমন ভাল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ভোটযুদ্ধে জয়ী হতে পারে নি, তেমনি লেখকের বন্ধুটির এই দশা। এই সমাজের নিষ্ঠুরতম বাস্তব সত্য। আর একারণেই সমাজের মানুষের দুর্গতির শেষ নেই। 'প্রয়োজন' গল্পটিতে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন পৃথিবীতে সব কিছুর সব মানুষের প্রয়োজন আছে। কারো জন্মই বৃথা নয়। গল্পের মূল চরিত্র একটি রুগণ ছেলে। ছেলেটি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছে। যাকে ভালবাসত সে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে– ভাল ছেলের সাথে। এ ব্যর্থ জীবনে আত্মহত্যা করার সাহসও ছিল না। তাই রুগণ শরীর নিয়ে কোলকাতায় এল চাকরির সন্ধানে। কিন্তু সেখানে তার ব্যর্থ জীবন ঠাঁই পেল না। একদিন দুপুরে মার্চেন্ট অফিসের সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যায়– সেই সময় রাস্তায় মোটরচাপা পড়ে মারা যায়। এখন মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তার জীর্ণ দেহ কেটে চিরে তন্ন তন্ন করে দেহতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করছে। এ গল্পে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন পৃথিবীতে সবারই প্রয়োজন আছে। 'গল্প নয়' গল্পটিতে সমাজের দরিদ্র যুব সমাজের চিত্র তুলে ধরেছে। গল্পের মূল চরিত্র অতি সাধারণ একটা ছেলে লেখাপড়া বেশি শেখে নি। চাকরির চেষ্টা করছে, কিন্তু পায় নি, বেকার। রোজ বিকেলে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে চৌমাথার এক কোণে দাঁড়ায়।

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তার জনতার দিকে চেয়ে তার স্বপ্নের কথা ভাবে, একটাও সফল হয় নি। রাস্তায় জনতার মাঝে অনেক মেয়েরা চলে, তাদের মধ্যে অনেকে সুন্দরী, অনেকে যুবতী তাদের দিকে সে হ্যাংলার মত চেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে কবিতা লিখে পত্রিকায় পাঠায়, ছাপা হয় না। "একটি মনোহারি দোকানের সামনে সে রোজ দাঁড়ায় যেখানে মেয়েদের ভীড় বেশি। জায়গাটা তার খুব পছন্দ, রোজ একই জায়গায় দাঁড়ায় সে। কিন্তু হঠাৎ সেদিন দোকানদার তাকে বলল রোজ আপনি আমার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন বলুনতো মশাই? নিশ্চয় কোন মতলব আছে আপনার।" (৩খ, ৮পৃ.) সে বলল, 'না এখানে জায়গাটা একটু ফাঁকা কিনা'– দোকানদার তাকে অন্যত্র সরে যেতে বলল। ছেলেটার বলতে ইচ্ছে হল– 'ফুটপাত কি আপনার বাবার' (৩খ, ৮পৃ.) কিন্তু কিছু না বলে সশংকোচে সরে গেল। এরাই হচ্ছে আমাদের যুব সমাজ, আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ। লেখক এখানে সমাজের বড় শক্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। যারা দেশের চালিকাশক্তি– তাদের অবস্থা এই হলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। 'ধনী-দরিদ্র' গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন ধনী এবং দরিদ্র দুই শ্রেণীর মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাদের আচার আচরণের বহু তফাৎ। যদি কখনো দুয়ের মিল ঘটে তার পরিণাম বড়ই করুণ হয়। গল্পের মূল চরিত্র মহেশ দাস। সে কেরানীর ছেলে। পড়াশুনায় ভীষণ ভাল, পাশ করে কলেজে অধ্যাপনা করছে। রায় বাহাদুর নির্মলশঙ্কর তার একমাত্র কন্যা জয়শ্রীর জন্য মহেশকে নির্বাচন করেছেন। প্রথমে মহেশ রাজি ছিল না। পরে মায়ের অনুরোধে রাজি হল। মাস ছয় বিয়ে হয়েছে। কিন্তু কেউ সহজ হতে পারছে না। জয়শ্রী কোনদিন প্রাণ খুলে মহেশের সাথে কথা বলে নি। মহেশ রায়বাহাদুরের বাড়িতে গিয়ে অস্বস্থি বোধ করে। তাদের মৃণালপুরে একটি বাড়ি আছে। জয়শ্রী সিমলায় পড়াশুনা করে। এবার ছুটিতে সে মহেশকে না জানিয়ে সরাসরি মৃণালপুরে চলে গেছে। খবরটা জানাল রায়বাহাদুরের কর্মচারী ধীরেন বাবু। আর এও জানাল অবনী অন্য এক জমিদারের পুত্র যার সাথে জয়শ্রীর বেশ ভাব সেও মৃণালপুরে চলে গেছে। স্বাভাবিক কারণে মহেশের মাথা গরম হল। সারাদিন কলেজে কাটাল, সন্ধ্যায় আর থাকতে পারল না। সে কাউকে না বলে মৃণালপুরে গেল, বাড়ির পরিস্থিতি তার জানা ছিল না। সহজে ভিতরে প্রবেশ সম্ভব নয়। বাধ সাধল বিশাল লোহার গেট। চারদিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ভিতরে বাঁশির সুর, সাথে কে যেন গান গাইছে। সে জানে অবনী ভাল বাঁশি বাজায় এবং জয়শ্রী ভাল গায় গায়। সে কাউকে না ডেকে গেট টপকে ভেতরে ঢুকতে গেল। সকাল বেলা চায়ের টেবিলে অবনী, জয়শ্রী ও এক দুসম্পর্কের মামা। তখন চাকর এসে জানাল কোন চোর গেট টপকে ভিতরে ঢোকে কিন্তু অ্যালসেশিয়ান দুটো তাকে মেরে ফেলেছে। পুলিশে খবর দিতে হবে। 'মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল' অবনী বলে। জয়শ্রীকে বলে চল যাবে নাকি– উত্তরে বলল "যাচ্ছি দাঁড়ান– ভৈরবীটা শেষ হোক।' (৯৩খ, ৩২২পৃ.) আসলে ধনী-গরিবে কখনো মিল হওয়া সম্ভব নয়। আগে সকলকে এক কাতারে আনতে

Dhaka University Institutional Repository

হবে, না হলে মহেশের মত অনেককেই জীবন দিতে হবে। 'হর্ষ ডাক্তার' গল্পে আমাদের সমাজের চার পাশের পরিবেশকে তুলে ধরা হয়েছে। 'হর্ষ ডাক্তার' গল্পের হর্ষ ডাক্তার চাকরি থেকে রিটায়ার করে এখন প্র্যাকটিস করছেন। ছেলে মেয়ের এখনো গতি করতে পারেন নি। গল্প কথক সদ্য পাশ করা ডাক্তার, যদিও তার বড় মেয়েকে বিয়ে করতে আপত্তি করেন নি। কিন্তু তিনি অসবর্ণের বিয়েতে রাজি নন। এছাড়া ডাক্তারের মা-বাবার মনে কষ্ট দিতে চান না। হর্ষ ডাক্তারের আবার কঠিন ব্যাধি আছে– "রেনাল কলিক"। যখন হয় তখন মরফিন নিতে হয়। সংসারের ভার নেয়ার মত কেউ নেই। বড় ছেলে ক্লাস সিক্সে পড়ে। এ তো আমাদের চারপাশের বাস্তব চিত্র। এখন কলিকের ব্যথা উঠলে নবীন ডাক্তার তাকে ইনজেকশন দেয়। একদিন রাত একটায় হর্ষ ডাক্তারের চাকর এসে বলল– "শিগগির চলুন, বাবু কলিকের ব্যথায় ছটফট করছেন।" যাওয়ার পর হর্ষ ডাক্তার বললেন তার ব্যাগে মরফিনের নতুন প্যাকেট আছে। নামজাদা কোম্পানির নতুন প্যাকেট। তা থেকে একটি অ্যামপুল বের করে ডান হাতে ইনজকশনটি দিয়ে সে চলে আসল। কারণ মরফিন দিলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে চাকর বলল বাবুর যন্ত্রণা কমে নি। হর্ষ ডাক্তার তাকে আরেক হাতে আর একটা মরফিন দিতে বললেন। নতুন ডাক্তার বলল এত তাড়াতাড়ি উপর্যুপরি মরফিন দেওয়া অনুচিত। কিন্তু ধমকে দিতে হল। ঘণ্টা খানেক পরে আবার ডাকাডাকি। তখন গিয়ে দেখে তাঁর হাত ফুলে লাল হয়ে গেছে, এরপর তিনি প্রায় মাস খানেক শয্যাগত। এবং হাত দুটো দুর্বল হয়ে গেল। গল্প কথকের সন্দেহ হওয়ায় সে একটি অ্যামপুল কেমিক্যাল একজামিনের জন্য পাঠায়। রিপোর্ট পেয়ে অবাক, সেখানে কোন মরফিন নেই। এরপর সেই কোম্পানির কাছে কেমিক্যাল একজামিনের রিপোর্ট দিয়ে পাঠান। তারা বলল আপনারা যা ক্ষতিপূরণ চান দিতে রাজি। তখন ডাক্তার হর্ষ ডাক্তারকে বলল চলুন, আপনার বড় মেয়ে শৈলীর বিয়ের টাকাটা আদায় করে আনি। তারা গিয়ে পনের হাজার টাকা দাবি করেন। কোম্পানি দেয়। এবং বলে কথাটা গোপন রাখবেন। তারা চলে আসার সময় একটা ছোকরা হাউ মাউ করে করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল। তার চাকরি গেছে। সে এ ঔষুধ ভরেছিল। কিন্তু না বুঝে ভরেছে। তখন হর্ষ ডাক্তার ফিরে গিয়ে ছেলেটিকে কাজে বহাল করে ফিরে এল। এ গল্পের ঘটনা আমাদের সমাজের এক বাস্তব চিত্র। প্রায়শই দেখা যাচ্ছে ঔষধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু কে এর জবাবদিহি করে।

'নদী' গল্পটিতে লেখক নদী ও নারীকে এক দৃষ্টিতে দেখেছেন। নদী গ্রামের শোভা বৃদ্ধি করে, নারী ঘরের শোভা বৃদ্ধি করে। উভয়ের যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। গল্পে দেখতে পাই, একজন বড় সরকারি কর্মকর্তার বাল্য বন্ধু পিতাম্বর, তাদের গ্রামের বাড়ি সোনাপুর। তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে তরলা নদী। তরলাকে বাদ দিয়ে গ্রামের কথা চিন্তাই করা যায় না। তরলা গ্রামের শুধু শোভা বৃদ্ধি করে নি, গ্রামকে শস্য শ্যামলাও

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা এ নদীতে জঞ্জাল ফেলে, যেন সে নদী নয় নর্দমা। তরলা হাসিমুখে সব সহ্য করেছে। বহু বছর পর পিতাম্বরের সাথে দেখা, সে পুরহিত। অফিসের এক ক্লার্ক তাকে নিয়ে এসেছিল। পিতাম্বরের মেয়ে আদরিণী ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। সে এখন এ বাড়িতে প্রায়ই আসে। পিতাম্বর মেয়েটিকে বিয়ে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মেয়ে শ্যামলা। তার উপর পিতার তেমন অর্থ সম্পদ নেই। অফিসার বাবু নিজেও বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করেছে আদরিণীর জন্য। কিন্তু পারে নি। এরপর অফিসার বাবু বদলি হয়ে চলে যান অন্যত্র। এরপর বহু বছর পর তিনি রিটায়ার করে কলকাতায় এক চামড়া ব্যবসায়ীর ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। তখন চাপরাসী খবর দিল এক 'আউর' তাঁর সাথে দেখা করতে চান। আসতে বলায় দেখলেন বোরখা ঢাকা এক মহিলা এসে মুখের কাপড় তুলে বলল– "কাকা বাবু আমাকে চিনতে পেরেছেন?" (৪খ, ২২১ পৃ.) তিনি চেনেন নি। মহিলা তখন বলল, 'আমি আদরিণী'। 'আমি মুসলমান বিয়ে করেছি। আপনাদের সমাজে তো ঠাঁই পেলাম না, এরা আমাকে আদর করে নিয়েছে।' (৪খ, ২২১পৃ.) বহু বছর পর তিনি গাঁয়ে গিয়ে দেখলেন– তরলা নদী আর সোনাপুর গ্রামের পাশ দিয়ে বইছে না; জঞ্জালে সে প্রায় বুজে গেছে। নদী কিন্তু মরে নি– সে গতি পরিবর্তন করে রহিমগঞ্জের পাশ দিয়ে বইছে। সে গ্রামকে আজ শস্য শ্যামলা করছে। আর আদরিণীও আজ আর সমাজে ঠাঁই না পেয়ে অন্য সমাজকে সমৃদ্ধ করছে। লেখক গল্পটিতে সমাজে পণ প্রথা, কুসংস্কার সুন্দর ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে সমাজের কঠিন বাস্তবতার প্রকাশ ঘটে। 'ছায়া ও বাস্তব' গল্পে লেখক জীবনের কঠিনতম সত্য সকলের সামনে উন্মোচন করেছেন। আমরা সিনেমা দেখে বাস্তববের মুখোমুখি হতে চাই। কিন্তু সিনেমা তো বাস্তব থেকে তৈরি। যার ঘটনা ঐ ছবির জগৎ থেকে মনে বেশি রেখাপাত করে লেখক সে কথাই এখানে তুলে ধরেছেন। গল্পকথক ডাক্তার বাবু চেম্বারে গিয়ে দেখেন তার ডিসপেনসারির বারান্দায় এক কালো কুচকুচে আসন্ন প্রবসা মেয়ে সাথে একটি নাক-বসা শিশু, এর সাথে একটি রোগা লোক। চাকর বলল গতকাল সন্ধ্যা থেকে বসে। মনে পড়ল কাল সন্ধ্যায় একটি সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। এখনো তার রেশ মন থেকে যায় নি। বড় লোকের মা-মরা মেয়ে পিতৃস্নেহে বড় হচ্ছে। বাবা তার সব আবদার পূরণ করে। একদিন মেয়েটি এক মাকাল ফল বাঁশিওয়ালার প্রেমে পড়ে। পিতার আদেশ অমান্য করে তার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল উক্ত প্রেমাস্পদ শুধু নায়িকা নহে, বহু কুমারী হৃদয় হরণ করেছে। তিনি বহুবল্লভ। সুতরাং নায়িকা সরে পড়ল, সে নানা গুণে গুণান্বিতা, রূপসী, সুগায়িকা, তার প্রেমিকের অভাব হল না। ডাকাত তার অনুরাগী হল। শেষে মেয়েটি ডাকাত দিয়ে সেই বাঁশিওয়ালাকে বন্দী করে এনে তার পায়ের কাছে করজোড়ে বসাল, সে কান মলল, নাকে খত দিল। এরপর নায়িকা বলল, তার শিক্ষা হয়েছে, পুরুষ মানেই পশু, এতে আমার সন্দেহ নেই। আমার পবিত্র প্রেম আমি মানুষকে দিব না,

Dhaka University Institutional Repository

ভগবানকে দিব। সে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হল। আর ডাকাতও তাকে দেবী সম্বোধন করে পিছনে চলল। কিন্তু এখানে ডাক্তার বাবুকে মেয়েটি বলল, তার স্বামী অসুস্থ। তার গর্মি গনোরিয়া আছে। কিন্তু স্বামী স্বীকার করে না। ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখে সত্যি। মেয়েটি অনুনয় করল তাকে ভাল করে দেয়ার জন্য। ডাক্তার বলল ভাল হলে আবারও বদমাইসি করবে। তুমি ওর সাথে কেন এলে– বলল, ওর কেউ নেই, টাকা হাতে দিলে খরচ করে ফেলবে তাই নিজে এলাম। এই বলে দশটাকা সামনে রাখল। ডাক্তার বলল, কি করিস। সে বলল– "ডাক্তারের প্রণামী না দিলে অসুখ সারে না।" (৪খ, ৪২২পৃ) মেয়েটি যে নাক বসা বাচ্চাটিকে এনেছিল, তাকেও কোন রোগে ধরেছে। মেয়েটির স্বামী মেছুনি। সে গয়না বিক্রি করেও স্বামীকে ভাল করতে চায়। সে তার নসীব বলে সব মেনে নিয়ে স্বামীর সাথে থাকতে চায়। মেয়েটির জন্য ডাক্তারের বড়ই দুঃখ হচ্ছিল। সেই সিনেমার নায়িকা তাঁর মন থেকে মুছে গেল। সেখানেই এই বাস্তবের নায়িকা বাসা বেঁধেছে। 'গীতার ভাষ্য' গল্পে এক আদর্শবান নিষ্ঠুর পিতার দেখা পাওয়া যায়। যদিও সন্তানকে সকলে ভালবাসে। এই পিতাও হয়ত তার সন্তানকে ভীষণ ভালবাসত। পরিবেশ, পরিস্থিতি দারিদ্র্য মানুষকে নিষ্ঠুর করে দেয়। 'গীতার ভাষ্য' গল্পে গল্পকথক ও আর এক ভদ্রলোক ট্রেনে পাশাপাশি বসাছিল। ভদ্রলোকের গায়ে ময়লা পোশাক, উসকো-খুসকো চুল, লাল চক্ষু, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। তার সাথে কথা বলার প্রবৃত্তি হল না গল্পকথকের। তিনি বসে গীতার ভাষ্য পড়ছিলেন। সাথে একটি চট ছিল। এমন সময় ট্রেনের জানালা থেকে একটি ছোট মেয়ে জীর্ণ শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দিল। গল্পকথক ভিক্ষা দেন না। কিন্তু নোংরা ভদ্রলোক মেয়েটিকে একটি পয়সা দিলেন, এমনি সময় ট্রেন চলতে শুরু করল। ভদ্রলোক ট্রেনের চেইন টেনে গল্পকথকের চটটা নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। বললেন, পয়সা পড়ে গেছে– তিনি খুঁজে মেয়েটি দিয়ে তবে ট্রেনে ফিরে আসেন। পরের স্টেশনে পুলিশ এসে তাকে বলল আপনি রামলাল, সে হ্যাঁ বলল। পকেট থেকে ছবি বের করে মিলিয়ে বলল– আপনি আপনার মেয়েকে খুন করেছেন। বলল হ্যাঁ। খুন করে বাঁচিয়েছি তাকে। তাকে খেতে দিতে পারতুম না। ক্ষিধের যন্ত্রণায় দিনরাত কাঁদত। একদিন চুরি করেছিল, তাই। যে লোকটি ছোট ভিখারী মেয়ের পয়সা পরম যত্নে খুঁজে দেন, সে নিজের মেয়েকে হত্যা করছে। চিন্তাই করা যায় না। তবে সে মেয়েকে চুরির শাস্তি দিয়েছে। এরপর সে হঠাৎ দারোগার টুঁটি কামড়ে ধরল। লোকটি সব স্বীকার করেও আইনের হাত কড়া পরতে রাজি নয়। কারণ হয়ত আইন তার মেয়েকে খেতে পরতে দেয় নি। 'বুড়ী' গল্পে আমাদের এ সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত বুড়ী ভিখারীদের দেখতে পাওয়া যায়। তাদের জীবনচিত্র লেখক তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। গল্প কথক ডাক্তার বাবুর চেম্বারে প্রতিদিন এক বুড়ী আসে ভিক্ষে করতে। তার ভাষা– "একঠো পয়সা দেনি বাবু"। ডাক্তার বাবু প্রতিদিন তার জন্য এক পয়সা বরাদ্দ করেছেন। বুড়ীর পরনের কাপড়টা বেশ পুরনো

Dhaka University Institutional Repository

ও পাতলা। ঠাণ্ডায় তার বেশ কষ্ট। তার বড্ড জ্বর এবং ঠাণ্ডাও লেগেছে। ডাক্তার বাবু তাকে তাঁর বাড়ি থেকে কাপড় আনতে বলায় বুড়ী বলল বাড়ি চেনে না। সে ডাক্তার বাবুকে দয়া করে কাপড়টি আনতে বলে। এরপর একদিন দুদিন তিনদিন ডাক্তার বাবু ভুলে যায়। এরপর ড্রাইভারকে বললে মনে করিয়ে দিতে সে ভুলে যায়। এরপর বুড়ী আর কাপড়ের কথা বলে নাই। অবশেষে মনে করে গৃহিণীকে বলে একখানি মোটা খদ্দরের কাপড় নিলেন। কিন্তু সেদিন বুড়ী আসল না। এরপর ভীড়ে লক্ষ করা হয় নি তিন দিন ধরে বুড়ী আসছে না। কাপড়খানি তাকে তুলে রাখা হল। একদিন প্রধান মন্ত্রী আসবেন। সেদিন ডাক্তারের দূরে কল আছে– তাই সকাল সকাল রওনা হলেন, ফিরে এসে মন্ত্রীর ভাষণ শুনবেন। কিন্তু পথে দেখেন এক বুড়ীর মৃতদেহ শকুনীরা ব্যবচ্ছেদ করছে। পাশে শুকনো লাঠি দেখে ডাক্তারের সেই বুড়ীর কথা মনে পড়ে। গ্রামের লোকজনকে ডেকে সৎকারের জন্য বিশ টাকা দেন। এসে আর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেখতে পান নি। শুনলেন বক্তৃতায় নেহেরুজী বলেছেন দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতির জন্য তাঁর গভর্নমেন্ট প্রাণপণ করছে। পরদিন পত্রিকায় এ খবর পড়ছেন– এমন সময় 'একটো পয়সা দেনি বাবু'! (৪খ, ১৩৪পৃ.) সেই বুড়ী! ডাক্তার বাবু ভেবেছেন মরে গেছে। সৎকারের টাকা দিলেন। আসলে এদেশে এমন ভিখিরী বুড়ীর অভাব নেই। 'কেন এমন' গল্পটিতে বনফুল সমাজের উঁচু ও নিচুর মধ্যে যে দেয়াল তার এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র কুমার, দশ বছরের বালক। পিতৃহীন বালক, তবে সে বাবার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার মাকে সকলে রানীমা বলে ডাকত। মায়ের সমস্ত স্নেহ পুঞ্জিত হয়ে উঠেছিল কুমারকে ঘিরে। কুমারের ছিল আলাদা গাড়ি, টাট্টু ঘোড়া, ঝি, চাকর। তার সব কিছু বাধা ধরা নিয়মে চলত। কুমারের এ জীবন অসহ্য হয়ে উঠে। সে একটু সময়ের জন্য একা হতে পারে না। এত বিলাস তার কাছে এক ঘেয়ে লাগে। তার ভাল লাগে বিকালে ড্রাইভার বিজয়ের সাথে বেড়াতে যাওয়া। বিজয় তাকে অনেক দূরে এক মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে একটা বস্তি আছে। সেখানে আছে দাগুয়া, তারই সমবয়সি, আছে ঝুমরি আর সুনরি। ওরা মাটি দিয়ে ঘর বানিয়ে খেলে। এটা সে দূর থেকে দেখে। কাছে যাওয়ার উপায় নেই। একদিন সুযোগ মিলল– বিজয়ের ছিল আফিং নেশা। আফিং ফুরিয়ে যাওয়ায় কুমারকে গাড়িতে বসিয়ে সে বন্ধুর বাড়ি থেকে আফিং আনতে গেল, এই সুযোগে কুমার নেমে গেল। সে দাগুয়ার সাথে আলাপ জমাল। তার মহিষে চড়ে ঘুরল। বটের ঝুড়িতে দোল খেল। ওদেরকে তার গাড়িতে চড়তে দিয়ে সে ঝুমরি, সুনরির ধুলা ও কাদার ঘর নিয়ে খেলতে বসে। এমন সময় চিৎকার শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখে বিজয় দাগুয়াকে মেরে নাক থেকে রক্ত বের করে দিয়েছে, ঝুমরিদের চড় মেরেছে। তখন কুমারের গা ধুলা কাদায় মাখামাখি, জুতা ভেজা। সেদিনই বিজয়ের চাকরি গেল, নতুন ড্রাইভার এল। এখনও সে রোজ দাগুয়াদের দেখে কিন্তু কাছে যেতে পারে না। এ দূরত্ব কিসের কুমার উপলব্ধি করার

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করে। 'যদু' গল্পটিতে লেখক বালক মনে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে রচনা করেছেন। আজকের শিশু ভবিষ্যতের জাতির পরিচালক। তাকেই ছোটবেলা থেকে দেশের মানুষের কথা ভাবতে হবে। আমাদের সমস্যাগুলো কোথায় বুঝতে হবে। খেলার এবং পড়ার সাথী কেন ঝরে যায় তাও বুঝতে হবে। এমন একটি গল্প যদু। দারিদ্র্যের কষাঘাতে যাকে অকালে লেখাপড়া ছাড়তে হয় এবং অকালে পরপারে পাড়ি জমাতে হয় এমন এক ছেলে যদু। ছোট বেলা থেকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস। বাবা টিউশনি করে সংসার চালায়। তার উপর বাবার যক্ষা, অতিকষ্টে লেখাপড়ার খরচ চলে। তবু ক্লাশে প্রথম হত। পাশের বাড়ির বিত্তশালী পরিবারের ছেলের চেয়ে পড়াশুনায় এগিয়ে। কিন্তু একদিন মাকে একটি ফেরিওয়ালার কাছে কাপড় দেখতে দেখে। একটি সুন্দর শাড়ি, ফেরিওয়ালা তাঁর মাকে নেয়ার জন্য অনুরোধ করছে। তিন টাকা দাম শুনে মা বলে 'কিনব না'। যদুও মাকে শাড়িটি নিতে বলে। তখন মা বলে– "এত টাকা কোথায় বাবা।" (৪খ, ৭৮পৃ.) মার পরনে শতছিন্ন শাড়ি। সত্যি, টাকা কোথায়। এরপর যদু একা একা রাস্তা ঘুরে বেড়ায়। কি হবে লেখাপড়া দিয়ে, কি হবে ফার্স্ট হয়ে। যদি মায়ের দুঃখই ঘোচাতে না পারে, পথে ফেরিওয়ালার সাথে আবার দেখা। তার দোকানের ঠিকানা জেনে নেয় যদু, এবার সে ঘরে এসে চুপি চুপি তার প্রাইজ পাওয়া বইগুলো বিক্রি করে মার জন্য শাড়ি নিয়ে আসে। মা সব কথা শুনে নির্বাক। এরপর আর যদু প্রাইজ পায় নি। কারণ তার কিছুদিন পর তার বাবা রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যায়। এরপর যদুকে কাজ খুঁজতে হয়। কোন কাজ না পেয়ে শেষে রিক্সা টানতে হয়। সে একদিন অনেক বড় কিছু হতে পারত। কিন্তু হল না। ঐ জীর্ণ শরীরে রিক্সা টানা সইল না। তাকেও একদিন অকালে যক্ষা রোগে মরতে হল। 'ক্ষতের গভীরতা' গল্পে আমরা দেখতে পাই শিক্ষার কি অবমাননা। আমাদের সামাজিক পরিবেশে শিক্ষার থেকে অর্থের মূল্যই বেশি– তারই বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পে সুরেন বাবু নামে এক ভদ্রলোক কলকাতা থেকে সরকারি কাজে ভাগলপুরে আসেন। স্টেশন আছে কিন্তু রিকসা নেই। সুতরাং একটি কুলির সহযোগিতায় মাইল খানেক দূরে একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। কুলি তার বিছানা ঠিক করে দিল। খাবার ব্যবস্থাও করে গেল। এর কিছুক্ষণ পর এক কমনীয় কান্তি আধুনিক বেশ ভুষার এক যুবক এল। এসে তার পরিচয় দিল বিনায়ক বকসি। অর্থনীতিতে এম.এ. পাস, তবে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ। সে রাজনৈতিক সামাজিক বিষয়াবলী অহেতুক আলোচনা করছিল। অবশেষে জানা গেল সে কলকাতায় তার মায়ের কাছে একশিশি গোয়াভা জেলি পাঠাবে। সুরেন বাবু বললেন তিনি সকাল সাতটার ট্রেনে যাবেন। তখন দিলেই চলবে। পরদিন সকাল ছয়টায় সেই কুলিটি এসে হাজির এবং ছেলেটি এল না। সাতটায় যখন ট্রেন ছাড়ে তখন দৌড়াতে দৌড়াতে প্লাটফর্মে পড়ে গেল– জেলির শিশি ভেঙ্গে গেল। এমনকি হাতের দামি ঘড়িটাও হয়তো ভেঙ্গেছে। বছর খানেক পরে সুরেন বাবুকে আবার উক্ত গ্রামে যেতে

Dhaka University Institutional Repository

হল। গিয়ে সেই কুলিটির খোঁজ করলেন। জানা গেল এখন কুলিগিরি করে না, ধর্মশালার পাশে একটি দোকান দিয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল সাধারণ খাবারের দোকান আর তার দোকানের হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করে সেই এম.এ পাশ বিনায়ক বকসি। মাসে ত্রিশ টাকা বেতন। এবারও কিন্তু সেই কুলি কালীচরণ সুরেন বাবুর সিট ঠিক করল। বালতিতে জল এনে দিল এবং যাওয়ার সময় খাবারের ব্যবস্থা করে গেল। একটু পরে বিনায়ক এল, নানা কথার পর বলল– "ও মেড়ো ব্যাটার মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই। ভাগ্যে আমি আছি। তাই দোকানটাকে কোন ক্রমে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" (৪খ, ৪৪০পৃ.) আমাদের দেশের শিক্ষিত ছেলের অবস্থা এখানে লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

বাঙালি নারীসমাজের বাস্তবতা

বাস্তববাদী ও জীবনধর্মী শিল্পী বনফুল তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে সমকালীন সমাজের বাস্তবচিত্রকে অবলোকন করেছেন এবং তাঁর ক্ষুরধার কলমের আঁচড়ে ছোটগল্পে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পের বেশ কিছু জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে বাঙালি নারীরা। বনফুল তাঁর গল্পে বাঙালি নারীদের অবহেলা, বঞ্চনা, গঞ্জনা, যৌতুকের শিকার, তাদের মাতৃত্ববোধ, তাদের মনোজগত ইত্যাদি নানা বিষয়কে নিপুণভাবে কখনো পেন্সিল স্কেচে, কখনো রং তুলিতে নিখুঁতভাবে চিত্রণ করেছেন। বনফুলের 'নিম গাছ' গল্পটি যেন বাঙালি নারীর চিরন্তন প্রতীক। বনফুলের গল্পে নারী চরিত্র আছে প্রচুর– তবে, আমরা স্বল্প পরিসরে অল্প কিছু নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব। গল্পগুলোর মধ্যে আছে– 'নিম গাছ', 'অদ্বিতীয়া', 'তিলোত্তমা', 'পরিবর্তন', 'পালোয়ান', 'সুরমা', 'সুন্দনা', 'চুনোপুঁটি', 'চম্পা', 'বাবা', 'সুরবালা', 'সতী', 'বল মা তারা', 'অমলা', 'মালা বদল', 'যেমন আছে থাক', 'বন্দেমাতরম', 'নারীর মন' ইত্যাদি।

'নিম গাছ' গল্পে নিমগাছটির সাথে শুধু সে বাড়ির লক্ষ্মী বৌটির বড় মিল। শুধু সে বাড়ি কেন বাঙালি সমাজে নারীদের সাথে নিম গাছটির বড় মিল। সবাই তাকে ব্যবহার করছে, কেউ ছাঁল ছড়িয়ে সেদ্ধ করছে। কেউ পাতা ছিঁড়ে শিলে পিষছে, কেউ ভাজচে গরম তেলে, কেউবা কচি ডালগুলো চিবোয় দাঁত ভাল থাকে বলে। ঠিক বাঙালি নারী-রা সংসারের সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে একের পর এক। হঠাৎ এক নতুন লোক এসে গাছটির পাতা, ডাল ছাঁল কিছুই নিল না শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে গাছটি দেখল। গাছটির ইচ্ছে হল লোকটির সাথে যেতে কিন্তু পারল না। কারণ তাঁর শিকড় মাটির অনেক গভীরে চলে গেছে। ইচ্ছে করলেই নড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে ঐ বাড়ির আবর্জনার স্তূপের মাঝেই দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ঠিক "ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটির ঠিক একই দশা।" (১খ, ৫২৪পৃ.) তাই হলেও কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, তার শিকড়ও

Dhaka University Institutional Repository

সংসারের গভীরে চলে গেছে। ঐ নিম গাছের মত বাঙালি নারীদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। এখানে লেখক খুবই সামান্য পরিসরে বাঙালি নারীর অসহায় করুণ জীবন চিত্রকে জনসম্মুখে অসাধারণ ভাবে তুলে ধরেছেন। 'অদ্বিতীয়া' গল্পে দেখি নারী নিজেকে স্বামীর কাছে অদ্বিতীয়া ভাবলেও বাস্তবে তা নয়। যদিও এখানে হাস্যরসের মাঝে লেখক প্রথমার সাথে স্বামীটির দ্বিতীয় বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গল্পের নায়িকা প্রভাবতীর মৃত্যু সংবাদের তিন মাস যেতে না যেতেই শ্যালিকার অনুরোধে পত্নীব্রত স্বামীটি দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মতি দিলেন এবং বিবাহ বাসরে গিয়ে দেখলেন সাতটি সন্তান পরিবৃতা তাঁর প্রথমাই বাসর কক্ষে প্রতীক্ষারত। এখানে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র হাস্যকৌতুকের মাঝে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে এখানে নারী হৃদয় হয়েছে ক্ষত বিক্ষত। তবু প্রভাবতী তার স্বামীকে ছেড়ে যায়নি। বাঙালি নারী শত অবহেলা বঞ্চনার মাঝে সংসারকে স্বামীকে সবার উপরে স্থান দেয়। 'তিলোত্তমা' গল্পটিতে নারীর অবস্থান আরও করুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। তিলোত্তমার স্বামী গোকুল শিক্ষিত এবং সচ্ছল। তবু গোকুলের বাবা যৌতুকের লোভে তিলোত্তমাকে বৌ করে আনে। কিন্তু কালো, অসুন্দর, তিলুর দরিদ্র বাবা পণের পাঁচ হাজার টাকা বাকি রেখেছে। সুতরাং ছেলে পক্ষ তিলুর উপর সন্তুষ্ট নয়। তার উপরে গোকুলের তিলুকে পছন্দও ছিল না। কোন শৌখিন ছেলের পক্ষেই তিলুকে নিয়ে ঘর করা সম্ভব নয়। তিলুর তাতে কোন বাদ প্রতিবাদ নেই, সে সারাদিন সংসারের ঝিগিরি করে। হঠাৎ একদিন গোকুলের এক বিধবার সাথে পরিচয়, এবং তাঁর সুন্দরী মেয়ে উষার সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়। সিদ্ধান্ত হয়– তিলুকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে। একথা তিলুকে জানাতে সে বলল– "তাই যাব। তুমি এক আধবার যাও যদি দয়া করে তাতেই আমার যথেষ্ট হবে। আমি যাই, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।" (১খ, ৩৪৩পৃ.) সকালে আশির্বাদের সরঞ্জাম আসল। গোকুলের মা বলল– "ও বউ মা, কোথায় গেলে তুমি? শাঁখটা বাজাও।" (১খ, ৩৪৪পৃ.) কি নিষ্ঠুর পরিহাস, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের আশির্বাদের শাঁখ বাজাতে হয় নীরবে প্রতিবাদহীনভাবে বাঙালি নারীকে, এতো সমাজের বাস্তব চিত্র, যদিও গোকুল শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিয়ে করে নি। তিলোত্তমার অসাধারণ ধৈর্য তাকে তার মনোজগতে নাড়া দিয়েছে। 'পরিবর্তন' গল্পটিতে দেখতে পাই বাঙালি পতিভক্তি নারীর কি নিদারুণ পুরস্কার এ সমাজ দিয়েছে। এ গল্পে যক্ষা রোগী হরিমোহনের স্ত্রী সরমা। সরমা যখন জানল তার স্বামীর যক্ষা হয়েছে, বাঁচার আশা নেই, সে নিজে তাঁর সেবা করেছে এবং সহমরণের জন্য স্বামীর উচ্ছৃষ্ট খেয়েছে। সুতরাং সরমারও যক্ষা হল। এবং সে মারা গেল। কিন্তু হরিমোহন বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করে ভাল হয়ে এল। সেও সরমার ভালবাসার প্রতি সম্মান দেখিয়ে দ্বিতীয়বার 'সরমা' নামের আর একটি মেয়েকে বিয়ে করল। আসলে সমাজে বাঙালি নারীর বাস্তব অবস্থানকে বনফুল নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। 'পালোয়ান' গল্পে নারীর প্রতি আরও নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে। নারীও যে মানুষ, তার যে একটা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিত্ব আছে, আছে স্বকীয়তা– তা এ সমাজের পুরুষেরা যেন বুঝতেই চায় না। নারী যেন পুরুষের ইচ্ছের পুতুল মাত্র। গল্পের মূল চরিত্র পালোয়ান– তার বন্ধুকে বলছে– "তোর কাছে লুকোব না কিছু! বউকে আমি ভাড়া দিই। মাসে এ্যাভারেজে দুই হাজার টাকা রোজগার হয়।"(৩খ, ২৫০পৃ.) বউ-এর আপত্তি সত্ত্বেও পালোয়ান বউকে দিয়ে হীন কাজ করাচ্ছে। এবং সে বউ-এর অজান্তে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখের সংসার করছে। বউটি জানে না তার আয়ে পালোয়ান অন্যত্র সংসার করছে। সমাজে নারীদের এই নিষ্ঠুরতম অবস্থানকে বনফুল প্রকাশ করেছেন। এই হীন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও সমাজে প্রতিনিয়ত নারীকে হতে হয় যৌতুকের শিকার।

'সুন্দনা' গল্পে আমাদের সমাজের মেয়েদের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'সুন্দনা' গল্পের প্রধান চরিত্র সুন্দনাকে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। সুন্দনা কালো। কিন্তু পড়াশুনা ভাল ছিল। ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল। এরপর বাবা আর পড়াতে পারে নি। বিয়ের জন্য চেষ্টা করছে। কিন্তু পাত্র পক্ষের তাকে পছন্দ নয়। সুন্দনা যা বাস্তবে করতে পারে নি তা স্বপ্নে ও কল্পনায় করে। সুন্দনা স্বপ্ন দেখে সে একটি বড় প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। সে এম.এ; পিএইচ.ডি। লন্ডনে আমেরিকায় প্রচুর গবেষণা করেছে। তার অফিসের কেরানী চন্দ্রকান্তকে অফিসের নিয়মকানুন না মানার জন্য চাকরি থেকে সাসপেন্ড করেছে। তখন চন্দ্রকান্ত তার পা জড়িয়ে সে কি কান্না। সুন্দনা মাপ করেছে কিনা জানা যায় নি তার আগেই সুন্দনার ঘুম ভেঙ্গে যায়, স্বপ্নও শেষ। এই রামকান্ত কদিন আগে সুন্দনাকে দেখে গিয়েছিল। এর মধ্যে তার মা ডেকে বলছে– তাড়াতাড়ি উঠে উনে আঁচ দিতে। আর বাবা বলছে– সুনিকে একটু সাজগোজ করিয়ে রেখ। বিকেলে মিত্তির মশায় তাকে দেখতে আসবে। সুন্দনা খিড়কির দরজা খুলে বের হয়ে যায়। আর ফিরে আসে নি। বাঙালি মেয়েদের অনেক কিছু করতে ইচ্ছে হলেও পারে না। তারা চিরকাল লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার। সুন্দনা গল্পটিতে আমাদের নারী সমাজের বাস্তব চিত্র বনফুল নিপুণ হস্তে অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছেন। 'চম্পা' গল্পে দেখতে পাই নারীরা যে প্রচলিত রীতিনীতির কারণে প্রতিনিয়ত অবহেলিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে এবং পা বাড়াচ্ছে অপরাধ জগতের দিকে। এজন্য এ ঘুণে ধরা সমাজকেই দায়ী করতে হয়। গল্পের মূল চরিত্র চম্পা, তাকে পছন্দ করে শ্রীমান কার্তিক। একদিন এক ঘটনা ঘটে। কার্তিকের প্রতিবেশী অমর বাবুর বাল্যবন্ধু যোগেন এসে হাজির অমর বাবুর বাসায়। তার মেয়ের বিয়ের গয়না গড়াবেন। তার কোটের পকেটে টাকা। তিনি কোট খুলে ভিতরে গিয়ে স্নান সারলেন। তিনি বন্ধুকে বললেন, ভদ্রাসনটুকু বাধা দিয়ে তিন হাজার টাকা যোগাড় করেছেন। আর ছেলে পক্ষ নগদ দেড় হাজার টাকা চেয়েছে তা তার বৌমার গয়না বেঁচে হয়ে যাবে। বৌমা কোথায় জিজ্ঞেস করতে বলল, বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ছেলের বিয়ে সে পাঁচ হাজার টাকা পণ নিয়েছিল। তা দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ি দোতালা করেছে। ছেলে মারা যাওয়ায় বৌকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এরপর মধ্যে পচু স্যাকরাকে খবর দেয়ার কথা মনে পড়তে বৈঠকখানায় এসে দেখে কোট নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। অনেককে জেরা করা হল। একজন বলল– কার্তিক বাবুকে বলে দেখুন। কার্তিককে বলাতে সে বলল, চেষ্টা করে দেখি। কার্তিক চলে গেল। চম্পার কাছে গিয়ে বলল– তুমি এবারে গুণ্ডাদের রানী হয়েছ। বলল হ্যাঁ, তাহলে একটা কাজ করতে হবে। একটা কোট খুঁজে দিতে হবে। চম্পা কোট এনে হাজির করল। তখন যোগেন বাবু এল, তার কোট পেয়ে দেখল সব ঠিক আছে। কিন্তু যোগেন বাবু বলল, তোমাকে চেনা চেনা লাগছে। তোমার নাম কি সাবেত্রী। চম্পা বলল না। কিন্তু যোগেন বাবু ভুল করেন নি। এই মেয়েটি তাঁর ছেলের জন্য পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু মেয়ের বাবা পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারে নি বলে বিয়ে হয় নি। সেই সাবেত্রী আজ গুণ্ডাদের রানী। এই যোগেন বাবুরা সাবেত্রীকে ঠেলে দিয়েছে চম্পা হতে। সমাজ থেকে পণ প্রথা বন্ধ না হলে মেয়েরা নির্যাতিত হতেই থাকবে। লেখক সে দিকটাই গল্পে তুলে ধরেছেন সার্থক ভাবে।

'বাবা' গল্পটিতে দেখা যায় মেয়ের বাবা প্রচুর যৌতুক দেওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির লোকের চাহিদা মেটে না। গল্পে প্রণতির বাবা তাঁর সম্পত্তি হিন্দু মুসলিম বিরোধ নিবারণ কল্যাণে ট্রাস্টি করায় প্রণতির শ্বশুর বাড়ির লোক মনক্ষুণ্ন হয়। এরপর প্রণতির বাবা মারা যায়। স্বামী পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়। এর জন্য তারা প্রণতিকে দায়ী করল। এবং তারা নিজেরা ঠিক মত খাওয়া দাওয়া করলেও প্রণতির উপর শুরু হল নির্যাতন। তাকে খাওয়া পরায় কষ্ট দিতে লাগল। তখন সে মুখ বুজে নির্যাতন সহ্য করেছে। যদিও গল্পে লেখক এখানে তার বাবার প্রেতাত্মাকে হাজির করে মেয়ের কষ্ট লাঘব করেছেন। তবু সমাজে নারীরা প্রণতির মত প্রতিমুহূর্তে নির্যাতিত হচ্ছে। সমাজে কালো মেয়েদের যে কি করুণ দশা তাও বনফুলের দৃষ্টি এড়ায় নি। 'বল মা তারা' গল্পে আমাদের সমাজের মেয়েদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে কাল মেয়েদের দুর্গতির সীমা নেই। পদে পদে তাদের হোঁচট খেতে হয়। যেমন বিয়ের বাজারে, তেমনি চাকরির বাজারে। সে যতই যোগ্যাত সম্পন্ন হোক না কেন, কালো বলে কোন ইন্টারভিউতে কালো মেয়েরা পাশ করতে পারে না। গল্পে দেখা যাচ্ছে একটি ট্রেনের কামরায় এক পরিবার তাদের মেয়ে উমাকে বিয়ের জন্য দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন। আর একটি মঞ্জুশ্রী যাচ্ছে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে। একই স্টেশনে উভয়ে নেমে পড়ল। আবার দেখা বিকালের ফিরতি ট্রেনে। উভয় উঠেছে। উমাকে ছেলে পক্ষের পছন্দ হয় নি, তারা এর চেয়ে ফরসা মেয়ে দেখেছে। আর মঞ্জুশ্রী বি.এ পাশ এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও চাকরিটা হল না। তার চেয়ে কম পারদর্শী আই.এ পাশ জ্যোৎস্না রায়ের চাকরি হয়েছে– ফরসা এবং টল ফিগার বলে। আমাদের এদেশে কালো মেয়ের এ সমস্যার যেন শেষ নেই। তখন প্লাটফর্মের একধারে এক অন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

ভিখারী একতারা বাজিয়ে গান গাইছে– "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।" (৪খ, ১৪৫পৃ.) এ গান যেন আমাদের সমাজের কালো রঙের মেয়েদের জন্য। 'সতী' গল্পটি লেখক বাঙালি নারীর সতীত্ব বোধ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বাঙালি নারীরা ধন-দৌলত, ঐশ্বর্যকে বিসর্জন দিয়ে স্বামীকেই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। এখানে ভবতোষ বাবু প্রতিদিন একটি মহিলার ছবিকে প্রণাম করছে- কেন করছে এ কথা জানতে চাইলে তিনি তার কারণ ব্যক্ত করেন। বাঙালি সতী নারী এমনই হয় স্বামী যেমনই হোক। তার মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেন। ভবতোষ বাবু যে ছবিটি প্রণাম করেন তা হল তার বন্ধুর স্ত্রীর। এ বন্ধুকে তিনি বিয়ে করিয়েছিলেন। বউটি খুবই সুন্দরী। সুতরাং ঘরে নিজের সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ভবতোষের ঈর্ষা হল। তিনি প্রায়ই বন্ধুর বাড়ি গিয়ে বন্ধুর বউ এর সাথে হাসি ঠাট্টা করতেন। কিন্তু কখনো বন্ধুর বউর সাড়া পান নি। একদিন ভবতোষের স্ত্রী মারা গেলেন, সুযোগ যেন বেড়ে গেল। চারদিকে শিক্ষিত, সুন্দরী মেয়েদের ভীড় জমল। ব্যাংকে তার পঁচিশ লক্ষ টাকা। এছাড়া আরও প্রচুর সম্পত্তি। কিন্তু তার মনে গেঁথে রইল বন্ধুর স্ত্রীর ছবি। কিন্তু তাদের প্রেম অটুট। কোথাও ফাঁক নেই। একদিন সুযোগ এল– বন্ধু বেপথে গেল– অন্য মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়ল। তখন ভবতোষ বন্ধুপত্নিকে চিঠি লিখলেন– তার কাছে চলে আসার জন্য। উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে। সে লিখেছে- "আমি মহাপাপী, তাইতো আমার স্বামী বিপথে গেছেন। তাই আপনি (যাকে আমি এতকাল দাদার মতো শ্রদ্ধা করে এসেছি) আমাকে এমন চিঠি লিখতে পারলেন। দোষ আপনাদের নয়, দোষ আমার মধ্যেই নিশ্চয়। তাই এসব ঘটছে। আমি আপনাদের পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেব।" (৪খ, ১১৫ পৃ.) পরদিন সে আফিং খেলে। অনেক চেষ্টায় বাঁচানো গেল। কিন্তু বন্ধুটি মনে করল তার কারণে বউ আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। সে অসুস্থ হল এবং একদিন মারা গেল। তাকে শ্মশানে নেয়ার সময় তিনতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে বন্ধুর স্ত্রীটিও মারা গেল। দুজনকে এক চিতায় পোড়ানো হল। 'সুরমা' গল্পে বাঙালি নারীদের চিরাচরিত রূপ বনফুল তাঁর তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'সুরমা' গল্পের সুরমা এক সাধারণ দরিদ্র লোকের স্ত্রী, তবু তার মধ্যে আছে স্বামীর প্রতি ভালবাসা, সতীত্ব বোধ। গল্পে দেখা যাচ্ছে সুরমা এবং এক ভদ্রলোক একটা রিকশায় বসা। সুরমা রিকশা থেকে নেমে একটি বাড়ির ভেতরে গেল– চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ঝলক। গৃহকর্তা তাকে বসতে বললেন। কিন্তু সুরমা বলল– "না আমি বসতে আসি নি, এইটি ফেরত দিতে এসেছি।" (২খ, ১৭২ পৃ.) ভদ্রলোক সুরমাকে গহনা ও টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু সুরমা কোন কিছুর বিনিময়ে তার সতীত্ব বিসর্জন দিতে রাজি নয়। তার স্বামী ভীতু বলে সহ্য করেছে। সে করবে না। সে ভদ্রলোকের গহনা ও অর্থ ফেরৎ দিয়ে রিকশায় গিয়ে বসল। রিকশায় বসা ছিল সুরমার স্বামী। এবার তার মুখে হাসি ফুটল। বাঙালি মেয়েরা তাদের স্বামীকে পরম দেবতা মনে করেন। সে যতই বিত্তহীন হোক না কেন, তাকে আঁকড়ে বাঙালি নারী

Dhaka University Institutional Repository

বাঁচতে চায়। এ সুরমা যেন বাঙালি নারীদের প্রতীক। 'বন্দে মাতরম' গল্পে লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন– যে বাঙালি নারীদের সকল ঐশ্বর্যের চেয়ে বড় ঐশ্বর্য মাতৃত্ব। তারা মাতৃত্বের জন্য সব কিছুকে ছাড়তে পারে। কোলের শিশু পৃথিবী শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এর তুলনা কিছুর সাথে মেলে না। গল্পের মূল চরিত্র রায়-বাহাদুরের কন্যা সুশীলা। কোন কিছুর তার অভাব নেই, দামী গাড়ি, পোশাক, অলঙ্কার, পার্টি, সিনেমা, সব আছে। কিন্তু রায়-বাহাদুর তার উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছিলেন না বলে বিয়ে হচ্ছিল না। এ যুক্তি কিন্তু বয়স বা যৌবনের উদ্দাম গতিকে রোধ করতে পারে না। হঠাৎ একদিন উধাও হইয়া গেল। সি-আইডিকে জানানো হল এবং গোপনে খোঁজ খবর নিতে বলা হল। কারণ রায়-বাহাদুর বলেছেন মেয়ে ব্যাঙ্গালোরে বিলাতী শিক্ষা দিতে পাঠিয়েছেন। দেখতে দেখতে সাত/আট মাস কেটে গেল কিন্তু সুশীলাকে পাওয়া গেল না। হঠাৎ একদিন সিআইডি সাহবে এলাহাবাদে সিধু গুণ্ডার পিছু নিয়েছিলেন। সে প্রকাশ্য দিবালোকে মাড়োয়ারিকে খুন করে টাকা ছিনতাই করেছে। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল গভীর রাতে একটা ডাস্টবিনের কাছে কোন ব্যক্তি সিধুর জন্য খাবার রেখে যায়। সিধু তা নিয়ে যায়। রাতে সেভাবে সিধুর পিছু নেয়া হল– সিধু সাইকেলে সুতরাং তার পিছনে ধাওয়া করতে করতে সে মিলিয়ে গেল। তবু তারা চলল– দুই দিকে ফাঁকা মাঠ, জনমানবের চিহ্ন নেই, গভীর অন্ধকার। কিছুটা যেতে দেখা গেল একটা মাটির পুড়ানো নড়বড়ে ঘর। ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখা গেল– একটা কুকুর ঘেউ করে আসল। সেটা কুকুরী। সিধুকে পাওয়া গেল না। টর্চের আলো ফেলে সিআইডি সাহেব অবাক হলেন শত ছিন্ন বসন, রুক্ষ চুল, সদ্যজাত একটি শিশুকে বুকে চেপে সুশীলা উঠে বসেছে। ঠিক পাশে কতগুলো কুকুর ছানাও রয়েছে। সুশীলার চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি, সে থর থর করে কাঁপছে। সিআইডি সাহেব কিছুই বলতে পারলেন না। জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকে মনেমনে প্রণাম করে বের হয়ে আসলেন। গল্পে লেখক মাতৃত্ব বোধকে সার্থকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। একজন রমণীর বড় অহঙ্কার সে মা। 'যেমন আছে থাক' গল্পটিতে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। আমাদের সমাজে মেয়েরা বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ি চলে যায়। ছোট বেলা থেকে যে পরিবেশে মানুষ বাবা-মা, খেলার সাথি, নিজের শখের জিনিস সব ছেড়ে তাকে চলে যেতে হয় নতুন পরিবেশে। নিজের গুছানো পরিপাটি করে সাজানো ঘরটি ফাঁকা হয়ে যায়। দেখে মা-বাবার মনটা ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু এটাই নিয়ম স্বাভাবিক। সদ্য বিবাহিতা কন্যা সব ফেলে চলে যায় শ্বশুর বাড়ি। বাবার বাড়ির কোনো জিনিসে তার আর প্রয়োজন নেই। নতুন জায়গায় নতুন জিনিস নিয়ে সে নতুন সংসার পাতে। চারদিকে তার স্মৃতিচিহ্ন পড়ে থাকে। মা বাবাকে কষ্ট দিলেও তা মাধুর্যে পরিপূর্ণ। তাই মেয়ের সব জিনিস যেখানে যেমন ছিল, সে সেভাবেই থাকে। তা দেখেই তাদের শান্তি। 'মালা বদল' গল্পে দেখি বিয়ের পর বাঙালি মেয়েদের অনেক স্বাধ, ইচ্ছে বিসর্জন দিতে হয়। 'অমলা' গল্পে

Dhaka University Institutional Repository
আছে যৌতুক প্রথা, তাছাড়াও আছে বাঙালি মেয়েরা অপছন্দের পাত্রকেও বিয়ের পর সহজ ভাবে মেনে নেয়ার চেষ্টা করে নিজস্ব স্বপ্নকে জলাঞ্জলি দিয়ে। আসলে বাঙালি নারীরা জলের মতো, যে পাত্রে রাখে সে আকার ধারন করে, তার নিজস্ব কোন রূপ নেই।

পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকার

অনেক সময় পরিবেশ পরিস্থিতি এবং অহঙ্কার মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। এদিকটিও বনফুলের দৃষ্টি এড়ায় নি। 'পরিস্থিতি' গল্পে সমাজের একটা বাস্তব সত্য প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষকে অনেক সময় ইচ্ছের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে হয়। তখন আশেপাশের মানুষ হয়তো তাকে সমালোচনাও করে। পর মুহূর্তে সমালোচকও যখন পরিস্থিতির শিকার হন তখন সবই যেন বদলে যায়। 'পরিস্থিতি' গল্পে এক আদর্শবাদী কবি বেশ প্রতিবাদী কবিতা লিখতেন। কিন্তু কোথাও ছাপা হচ্ছে না, হলেও দক্ষিণা মাত্র পাঁচ টাকা। চাকরিটি চলে যাওয়ায় স্ত্রীকে ঝিগিরি করতে হচ্ছে। তারা বস্তিতে থাকে। এক ব্যবসায়ী সুজিত বাবু দয়া করে তার বাড়িতে একটি ঘরে বসে লিখতে দিয়েছেন। পাঞ্চজন্য পত্রিকার সম্পাদকের সাথে দরকষাকষির কথা শুনে তিনি বললেন– অনেকদিন থেকেই আপনাকে একটা প্রস্তাব করব ভাবছিলাম কিন্তু আপনি আদর্শবাদী লোক বলেই সাহস পাই নি। (২খ, ৬৮পৃ.) এরপর তিনি একটি খাম দিয়ে বললেন- ছবিগুলি দেখুন এদের নিয়ে কবিতা লিখতে হবে। নানা ভঙ্গিতে কিছু যুবতী উলঙ্গিনী নারীর ছবি। সুজিত বাবু বললেন– শাড়ির ব্যবসা করি, বিজ্ঞাপনে দেব। অবশ্য ডিজাইনারকে দিয়ে শাড়ি ডিজাইন আঁকিয়ে নেবেন। সাথে কবিতা থাকবে। একটা কবিতায় পঁচিশ টাকা করে দেবেন। একশ ছবিতে আড়াই হাজার টাকা। লোভনীয় প্রস্তাব। সংসারের কথা চিন্তা করে রাজি হলেন। কিছুদিন পর একবন্ধু পত্র লিখেছেন অমন উলঙ্গিনী নারীদের পাশে তোমার কবিতা আশা করি নি। তার গরিব কাগজে বিনে পয়সায় একটা কবিতা পাঠাতে বললেন। কবি এক জ্বালাময়ী কবিতা লিখে দিলেন। কদিন পর কবিতাটি ফেরত এল। বন্ধু লিখলেন– কবিতাটি খুব ভাল তবে কাগজের মালিক গভর্নমেন্টকে চটাতে চান না। তার চেয়ে একটা ভাল প্রেমের কবিতা পাঠাতে। এবার কবির মুখে হাসি ফুটল। সমালোচক বাবুর মুখও বন্ধ হয়ে গেল। আসলে সাধারণ জনগণ সব সময় পরিস্থিতির শিকার। 'বাল্মীকি' গল্পটি অনেকটা 'চতুরী লালে'র সাথে মিল আছে। তবে এর বিষয়বস্তু অন্য আঙ্গিকে। নায়ক মহীতোষ বাবু খুব হিসেবী লোক। কাজের লোকের অপচয় সে সহ্য করতে পারে না। সে সবসময় ছেঁড়া টুকরা কাগজটুকুও জমিয়ে রাখে। সময়ে কাজে লাগায়। দেশলাইয়ের বাক্সের কাঠি গুনে রাখে। কাজের লোক যাতে সরাতে না পারে। কিন্তু তবুও পারে না তাকে সামলাতে, তাই বিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। কিন্তু গিন্নীর দামী দামী জিনিসপত্র দেখে সে চিন্তায় পড়ে। সে গিন্নীকে বলে– কাজের লোকের উপর কড়া নজর রাখতে, কারণ ব্যাটা গোবর্ধন বড় চোর। গিন্নী হাসে। বিয়ে করেও শান্তি নেই, লক্ষ্য করল– দেশলাইয়ের কাঠি বেশি নষ্ট হচ্ছে। একদিন দুপুরে বাসায় ফিরে দেখল– গোবর্ধন বিড়ি ফুকছে। এক চড় মারলেন, কিন্তু গোবর্ধন বিচলিত না হয়ে বাবুর জুতার ফিতা খুলতে লাগল এবং বলল উপরে পা টিপে যেতে বৌমা শুয়েছে– গিয়ে যা দেখল তা অচিন্ত্যনীয়। মনু মানে তার স্ত্রী বই পড়ছে বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। বইটি ইকনমিকস বিষয়ক বই। যাকে এনেছে– ঘরের চোর ধরতে সেই কিনা দেশলাইয়ের কাঠি চুরি করছে।

মহীতোষ বাবু অনেক পথ হেঁটে কম ফিসের ডাক্তারের কাছে এসেছিল গলার ব্যথা দেখাতে। ডাক্তার বললেন, আজকাল সিগারেট ধরেছ নাকি। বলল– ধরেছি সম্প্রতি। হিসেবী লোকও সঙ্গদোষে বেহিসেবী হয়। তাই ডাক্তার বাবুকে বলল, মহীতোষ না লিখে প্রিসকিপশনে– বাল্মীকি লিখতে। সমাজের অনেক না জানা দুঃখ গাঁথা 'চুনোপুঁটি' গল্পটিতে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষের উপর থেকে দেখে ভিতরের দুঃখ বোঝা কষ্ট সাধ্য। গল্পটির মূল চরিত্র পুঁটি। পাঁচ বছর বাদে দেশে যাচ্ছে মানে মোহনপুর গ্রামে। এ গ্রাম থেকে একবার তাকে পলায়ন করতে হয়েছিল। তার অপরাধ সে কালো। তদুপরি দরিদ্র। শতাধিক লোক তাকে দেখেছে কিন্তু কেহ বধূরূপে নির্বাচন করে নি। তার মা মানুষের পা পর্যন্ত ধরেছে তবু কারো মন গলে নি। অন্যদিকে পাড়ার ছেলেরা তার বাড়ির পাশে আনাগোনা শুরু করে। অবশেষে একদিন– তার মা তাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ত্যাগ করে।

আজ পাঁচ বছর পর স্বামীসহ পুঁটি গ্রামে এল। গ্রামের সবাই অবাক হল। পুঁটির সাজসজ্জা রানীর মত। আর স্বামী যেন রাজপুত্র। সাথে জনা পাঁচ চাকর। তার মা বছর খানেক আগে গত হয়েছে– মায়ের ইচ্ছে পালন করতে গ্রামে এসেছে। মায়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পর গ্রামের লোকদের ভাল করে খাওয়াতে হবে এটা তার মায়ের শেষ ইচ্ছা। পুঁটি মন্দিরে, স্কুলে মোটা অঙ্কের টাকার চাঁদা দিল। আজ তাদের পুঁটির রূপ এবং ভাগ্যের প্রশংসা করতে একটুও লজ্জা বোধ করল না। দুই সপ্তাহ মোহনপুরকে মাতিয়ে অবশেষে তারা বিদায় নিল। কেউ বুঝতে পারল না পুঁটির অন্তরের ব্যথা। এরপর ট্রেন যখন বর্ধমান স্টেশনে। তখন পুঁটি বলছে, চুনো দা এখানেই নামবে? উত্তরে চুনীলাল ওরফে চুনো বলল 'হ্যাঁ টাকাটা দিয়ে দাও।' পুঁটি তাকে– স্বামী হিসেবে অভিনয়ের জন্য দু'শত টাকা দিল। সে চলে গেল। এবং বলল স্টুডিওতে দেখা হবে। তারা দুজনেই অভিনেতা, অভিনেত্রী পুঁটি এখন অনেক টাকা রোজগার করেছে। বাড়ি গাড়ি সব হয়েছে। অনেক লোক পিছু পিছু ঘোরে। কিন্তু পৃথিবীতে একান্ত আপন বলে কেউ নেই। এখানে একজন অভিনেত্রীর জীবনের দুঃখগুলোর বাস্তবচিত্র লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তারাও সমাজের মানুষ, তাদের জীবনের দুখ কষ্ট আছে। 'কুতুব মিনার' গল্পে

Dhaka University Institutional Repository

লেখক সমাজের নিম্নতম এক চোরের কথা তুলে ধরেছেন। চোর হলেও তার মন ছিল বিশাল। 'কুতুব মিনার' গল্পের প্রধান চরিত্র কুতুব– গল্পকথকের বাড়িতে কাজ করত। কখনো ঘরামির কাজ, কখনো জমিতে কাজ। কঠোর পরিশ্রম করতে পারত। একদিন গল্পকথকের মায়ের গলার হার হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজার পর পাওয়া গেল না। তখন তার মা একদিন কুতুবকে বলল, "বাবা আমার শ্বাশুড়ীর দেওয়া হারটা কোথায় যে হারিয়ে ফেললাম, এইটে দিয়ে তিনি বিয়ের সময় আমার মুখ দেখেছিলেন, কি করে যে হারিয়ে গেল।" (৪খ, ৩১৬ পৃ.) কুতুব তখন কিছু বলল না– পরদিন হার নিয়ে হাজির। বলল– ওই ঝোপে পড়েছিল, কাকেটাকে ফেলেছে হয়তো। এরপরদিন দেখা গেল কুতুব রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সারা গায়ে প্রহারের দাগ। এরপর আর একদিন গল্পকথকের বাড়ি চুরি হল; অনেক মূল্যবান জিনিস চুরি হল। কিন্তু ছোট্ট গল্পকথকের একটা রঙিন টিনের মোটরগাড়িও নিল। তখন সে কুতুবকে সে কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল। পরদিন কুতুব মোটরটি এনে দিল। এখানে শেষ নয়। এই মটরকে ক্লু ধরে পুলিশ কুতুবকে খুব মারল এবং পুরো দলটা ধরে ফেলল। এর কয়েকদিন পর যা ঘটল তা নিদারুণ। কারা যেন কুতুবকে খুন করেছে। চোরের দল ঘর-ভেদী বিভীষণকে বাঁচিয়ে রাখা নিরাপদ মনে করে নি। গোপাল বাটিতে বসে গল্পকথকের মনে কুতুবের স্মৃতি যেন আকাশচুম্বী হয়েছে। লেখক তাকে কুতুব মিনার আখ্যা দিয়েছেন। আসলে কুতুব হয়তো পরিস্থিতির শিকার। তা না হলে কুতুবের মত সহৃদয় ব্যক্তির চোর হওয়া মানায় না। তার এই প্রশস্ত মনের জন্য তাকে প্রাণ দিতে হল। 'স্বরূপ' গল্পটিতে দেখতে পাই মানুষ কিভাবে চোর হয়। সে এ সমাজের শিকার। পরিস্থিতি মানুষকে বাধ্য করে অন্যায়ের দিকে ঠেলে দিতে। 'স্বরূপ' গল্পের মূল চরিত্র স্বরূপ, সে একজন চোর। ট্রেনে গল্পকথক কলেজ পড়ুয়া একটি ছেলের সাথে পরিচয় হয়। ছেলেটি স্বরূপকে তার কাঁধে ঘুমতে দেয়। এরপর খাবার থেকে ভাগ দেয়। এরপর পরিচয় করে জানতে পারে সে হাজারীবাগ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি যাচ্ছে। সে একজন সিঁদেল চোর। কেন চুরি করে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল প্রথমে সঙ্গ দোষে। কারণ মেয়ের বিয়ের জন্য টাকার খুব দরকার পড়েছিল। প্রথমবার বিশ হাজার টাকা চুরি করে, ভাগে পাঁচ হাজার টাকা পায় এবং মেয়ের বিয়ে দেয়। এরপর দুবছর জেল খাটে। তখন প্রতিজ্ঞা করে আর কখনো চুরি করবে না। কিন্তু জেল থেকে বের হয়ে দেখল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কঠিন। সে দাগী হয়ে গেছে– কেউ তাকে কাজ দেয় না। সুতরাং আবার চুরিই করতে হল। তার জেলেই সুবিধে– থাকা খাওয়া নিশ্চিন্ত। এবার ছেলেটিকে বলল– তুমি আমার বিনুর বয়সী, তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পকেটে পয়সা নেই। তাই তোমাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছি। একথা শুনলে তোমার ঘরে কোনদিন চুরি হবে না। মাস খানেক পর একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে চোখে টার্চের আলো পড়তে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে সেই চোরকে ছেলেটি দেখতে পেল। তখন চোর বলল– এটা তোমার বাড়ি। তুমিতো

Dhaka University Institutional Repository

আমার একটি কথাও শোন নি দেখছি(৪খ, ১২৮ পৃ.)। দিন সাতেক পরে একটি লোক একটি চিঠিতে দুটো দশ টাকার নোট পাঠায়, তাতে লেখা দেওয়ালের ফুঁটোটা সারিয়ে নিও, স্বরূপ। মাসখানেক পরে আবার দেখা– হাতে হাতকড়ি। তখন মুচকি হেসে বলেছিল, 'টাকা পেয়েছিল।' লোকটি চোর হলেও তার একটা নীতি আছে। সে সমাজের এবং পরিস্থিতির স্বীকার। 'পতানু পাগলা' গল্পে আপাত দৃষ্ট একটি পাগলকে দেখা যায়। কিন্তু এ পাগলের পিছনে লুকিয়ে আছে সমাজে কিছু লোকের প্রতারণা এবং নির্যাতনের কর্মকাণ্ড। পতানুর বয়স যখন উনিশ-কুড়ি তখন এক রিক্রুটিং অফিসার তাকে ভুলিয়ে বিদেশে কুলি হিসেবে চালান দেয়। যাদের চালান দেয়া হয় তারা আর ফিরে আসত না। কিন্তু পতানু এসেছিল। পুরা উলঙ্গ অবস্থায় সে ফিরে এসে ঘরের কোণে দাঁড়িয়েছিল। এরপর আবার পালায়। পরে ধরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখায় আর পালায় নি। কিন্তু সারাক্ষণ কোন উঁচু জায়গায় উবু হয়ে হাসত। একাবর সে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে এক ময়রার দোকানের লুচি ও মিষ্টি খেয়েছিল। এরপর তাকে পাগলের চিকিৎসা দেয়া হল। তারপর আবার শান্ত। কিন্তু তখন সে একটা কথা বলত– 'ব্রিনডাউন' সারাক্ষণই বলত। একবার এক পাগলা মহিষের সাথে লড়াই করে তার প্রাণটা গেল। পরবর্তীতে এক বৃদ্ধ রিক্রুটিং অফিসারের সাথে গল্পকথকের আলাপ হয়। মণিহারী নামটি শুনে তিনি বললেন– মণিহারীর পতানু তাদের চা বাগানে কাজ করত। পতানু বাগানের সাহেব মালিককে ঘুষিতে ভূশায়ী করে সরে পড়ে। সাহেবটাও বড় পাজি ছিল। কুলিদের বড়ই নির্যাতন করত। আর কথায় কথায় বলত Bringdown the whip। সে শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক দিয়ে কুলিদের চাবকাত। হয়তো সেই নির্যাতনে পতানু পাগল হয়ে গেছে– তাই সে ইংরেজি Bringdown কথাটি 'ব্রিনডাইন' বলে চিৎকার করত সারাক্ষণ। পতানু সমাজের শিকার।

'মহামানব কেনারাম ওক' গল্পটিতে দেখতে পাই কেনারাম নামে এক ব্যক্তি মহামানব হবে বলে বাড়িতে অপরাধীদের আশ্রয় দিয়েছে। সবকিছু সে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখার চেষ্টা করেছে। সে ক নামক একজন নারী ধর্ষক, গুণ্ডাকে ঘরে ঢোকার সুযোগ দেয়। ক সেই সুযোগে কেনা রামের স্ত্রীকে আয়ত্ত করে। তার সামনেই তদেরকে অপ্রীতিকর অবস্থায় দেখতে পেয়েও ক্ষমা করে দেয়। যদিও সে কিছুটা বিচলিত হয়েছিল। যখনি মনে হল সে মহামানব তখনি রাগ জল হল। এরপর একদিন তার স্ত্রী পুঁটি এবং ভণ্ড ক পালিয়ে যায়। এরপর কেনারাম তার সর্বস্ব বিক্রি করে চৌমাথায় এক টুকরো জমি কিনে মর্মর বেদী তৈরি করে সেখানে উঠে প্রত্যহ বক্তৃতা দিত– "অপরের দোষ দেখিয়া নিজের দোষের কথা ভুলিও না।" এ বাণী হিন্দী, বাংলা এবং ইংরেজিতে সকাল বিকাল প্রচার করে। আসলে এখানে কেনারামের কথার মধ্যে থেকে একটি সত্যি কথা ফুটে উঠে– সমাজে আমরা অন্যের দোষ ধরতে ব্যস্ত। নিজের দোষের কথা ভাবি না। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository
তাই বলে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। লেখক এ কথাই এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে অনেক সময় নিজেরও বিশাল ক্ষতি হয়ে যায়। 'অঙ্কুর ও বৃক্ষ' গল্পে আছে মানুষ তার শ্রম ও মেধা দিয়ে উপরে উঠতে পারে। আর প্রচুর ঐশ্বর্য ধন সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও অহমিকা এবং অলসতা মানুষকে অধঃপতনের চরমে পৌঁছে দিতে পারে। যার পরিচয় মেলে এই 'অঙ্কুর ও বৃক্ষ' গল্পটিতে। এমন ঘটনা একটু নিরীক্ষণ করলে আমরা আমাদের চার পাশেই দেখতে পাই। গল্পের প্রথমে আছে এক ভদ্রলোক বেশ বিপন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি লেখককে অনুরোধ করেছেন তার সুদের টাকা যেন ছেড়ে দেয়। সেজন্য লেখক অন্য এক ভদ্রলোককে বলে দেন। কম নয় দুহাজার টাকা। তবু লেখক বললেন, এখন কথা হল– এ বিপন্ন ভদ্রলোক হলেন– ঐ এলাকার এক সময়ের সবচেয়ে বড় দোকান জগজ্জ্যোতি ভাণ্ডারের মালিক ধনী জগৎ বাবু। আর সুদ ছেড়ে দেয়ার জন্য যাকে বলতে হবে তিনি হলেন– মথুরা দাস। একসময় তিনি খুব সামান্য মূলধন নিয়ে শাড়ির দোকান দিয়েছিল। কিন্তু আজ শহরের তার চার/পাঁচটি বড় দোকান। মোটা অঙ্কের ব্যাংক ব্যালেন্স। ধনী জগৎ বাবুর এই দীন দশা দেখে লেখকের অনেক আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল– লেখকের বন্ধু রতন বিশাল বড় লোকের একমাত্র সন্তান, কিন্তু পোশাকে কথা বার্তায় তা বোঝার উপায় নেই। সে পাটনায় এক বিয়েতে যাওয়ার পথে লেখকের সাথে দেখা করার জন্য নেমেছিল। কিন্তু তার মনে পড়ল বিয়ের গিফট কেনা হয় নি। তখন লেখককে নিয়ে বেরুল শাড়ি কিনতে। তখন এই জগৎ বাবুর দোকানে গেলেন– দুপুর বেলা তিনি ঝিমুচ্ছিলেন। আর কর্মচারীরা খেতে গেছেন। বেনারশী শাড়ি দেখতে চাইলে যা দেখালেন তা রতনের পছন্দ হল না। বলল ভাল শাড়ি দেখানোর জন্য। তখন বলল আছে আড়াইশ তিনশ টাকা দামের শাড়ি। বেশ দেখান। তখন দোকানদার বলল– "সত্যি সত্যি যদি নেন তাহলে দেখাই।" (৩খ, ২৮৬পৃ.) তা না হলে শুধু শুধু সিঁড়িতে চড়ে তিনি শাড়ি নামাতে চান না। দোকানদারের কথা রতনের পছন্দ হল না। দোকান থেকে বের হয়ে মথুরা দাসের দোকানে গেলাম। তার দোকান ছোট– সুতরাং দুপুর বেলার রোদে ঘুরে এ দোকান সে দোকানের একগাদা শাড়ি এনে হাজির। কিন্তু যখন পছন্দ হল না তখন বলল, আপনার ট্রেন ছাড়ার আগে পছন্দ মত ফিকে সবুজ শাড়ি নিয়ে হাজির হব। রতন তার কাছ থেকে সাড়ে আটশ টাকায় শাড়ি কিনলেন। তার লাভ হয়েছিল একশ টাকা। এই পরিশ্রমী লোকটি আজ লক্ষপতি। আর জগৎ বাবু তার গলগ্রহ। লেখকের অনুরোধে মথুরা দাস জগৎ বাবুকে ঋণমুক্ত করে দেন। লেখক এখানে সুন্দর ভাবেই তুলে ধরেছেন পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি প্রবাদটি। সেদিনের সে অঙ্কুর আজ মহীরুহ বৃক্ষ।

মানুষের জীবনের কোন কিছুরই বড়াই করতে নেই। মানুষকে কখনো না কখনো প্রকৃতির কাছে হার মানতেই হয়। সেখান থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না। 'চৌধুরী' গল্পের মূল চরিত্র কংগারী চৌধুরী। সে কখনো কারো কাছে হার মানে নি।

Dhaka University Institutional Repository

গরিব ঘরে জন্মগ্রহণ করেও নিজ দাপটে জমিদার হয়েছে। জাল, জুয়াচুরি, ঘুষ, খোশামোদ, বাহুবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল– কার্যসিদ্ধির জন্য যা প্রয়োজন করেছে। চৌধুরী করে নাই কি? গ্রামে পিতার নামে স্কুল, মাতার নাম অবলা আশ্রম, বৃন্দাবনে মন্দির, জলসত্র, ডাকাতি, খুন, বড় বড় মামলা, নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ– এমনকি শিশু হত্যা পর্যন্ত। কখনো কোন কিছুতে দমে নি। যাতে হাত দিয়েছে চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। গরুর গাড়ি যেন মন্ত্র বলে মোটরের গতি লাভ করে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য বেগে ছুটছে। হাতির মুখে লাগাম লাগানো যায় না বলে চৌধুরী হাতি চড়ত না।

একদিন হঠাৎ চাকা ঘুরে গেল। চৌধুরী সহসা অন্ধ হয়ে গেল। দেশের নামকরা ডাক্তার বৈধ্য এল। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি আর ফিরবে না। কিছুতেই না। চৌধুরী তার বিশ্বাসী দেওয়ানকে বলল– 'বল কি হে! পরাধীন হয়ে বাঁচতে হবে? শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল!' (১খ, ২০৭পৃ.) দেওয়ান নিশ্চুপ। দেওয়ানকে ঔষুধ আনতে বলা হল। দেওয়ান চলে যায়। একটু পরেই হৈ চৈ রৈ রৈ পড়ে গেল– দেখা গেল চৌধুরীর দেহ বিছানায় পড়ে আছে। রিভালবার দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এবং গুলি চোখেই করেছে। চৌধুরী কিছুতেই হার মানতে রাজি নয়। তাই সে ভাঙ্গলেও মচকাবে না। এমন মানুষ খুবই বিরল।

সমাজের পাপাচার

অন্যায় ও পাপাচারীর প্রায়শ্চিত্ত বিধানেও বনফুলের ন্যায়দণ্ডটি বড়ই কঠিন। দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বিবেক সর্বদা খড়গহস্ত। সেখানে কোন ক্ষমা নেই, বিচারে নেই কোন শৈথিল্য, শাসনে বাঙালি-সুলভ অনুকম্পাও নেই। 'আইন' গল্পে ডাক্তার টি.সি পাল দ্বিসহস্র রজত-মুদ্রার বিনিময়ে আইনের চক্ষে ধুলো দিতে গিয়ে সর্বধিক সামলে অতিশয় হুঁশিয়ার হয়ে যে কাণ্ডটি করলেন, তার ফল একেবারে হাতে হাতেই তাঁকে পেতে হল। অপরিচিত ব্যক্তিকে মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে যখন তিনি আত্মতৃপ্তি সহকারে ভাবছেন, 'এমন পাকা কাজ করে দিলুম যে, আইনের বাবারও সাধ্য নেই আপনাকে ধরে' (১খ, ৪২১পৃ.)। তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, এই অব্যর্থ অস্ত্রটি একেবারে তাঁরই মাথায় ইন্দ্রের বজ্র হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। সার্টিফিকেট নিয়ে লোকটি হাতের নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে ডাক্তার বাবু পুলিশের পত্রে জানতে পারলেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রটি নিহত হয়েছে; এবং হত্যাকারী যে সে তাঁর কাছ থেকেই আত্মরক্ষার চরম অস্ত্রটি আদায় করে নিয়ে গেছে। সে সত্যও তাঁর কাছে দিবালোকের মতই প্রাঞ্জল হয়ে উঠল। 'শেষ কিস্তি' গল্পেও দেখি সামজের শোষক ব্যক্তিরা কিভাবে নিয়তির নির্মম দণ্ড ভোগ করে। এ গল্পে লেখক সমাজের বাস্তবচিত্রগুলো তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। শেষ কিস্তি গল্পটিতে দেখতে পাই ধনী বৃদ্ধ জগৎ সেন– মানুষ ঠকিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বিশাল সম্পত্তির মালিক। কিন্তু তার দুঃখ তার ঘরে সন্তান বেশি দিন বাঁচে না। একটি সন্তান সাত/আট বছর বেঁছে মরে যায়, আবার পরের বছরই একটি সন্তান আসে। কিন্তু বেঁচে থাকে না। এজন্য তিনি তার ছেলে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালান। শহরের বড় বড় চিৎসিকরাও হার মানে। একজন নবীন ডাক্তার এবং নার্স রাতে ছেলের পাশে থাকে। যদিও নবীন ডাক্তারকে বৃদ্ধ দীনু ডাক্তার বলে দিয়েছেন– কোন রকম ইনজেকশন দিও না। ছেলের সামান্য ম্যালিরিয়া হলেও বাঁচবে না। নবীন ডাক্তারটি প্রথমে আমল দেন নি। যখন রাতে ছেলেটির অবস্থা খারাপ হল। তখন নার্স এবং ডাক্তার দুজনে মিলে ছেলে ধরে রাখাও কঠিন। বৃদ্ধ জগৎ সেন ছেলের পা ধরে দয়া ভিক্ষা চাইছে। আট বছরের ছেলেটি বৃদ্ধের মত খন খন করে বলছে– 'আমি– আমি জোচ্চরের বাড়ি থাকি না।' শিগগির ফিস দিয়ে দাও এদের– (১খ ৫০৯পৃ.) জগৎ বাবু শেফ খুলে নার্স এবং ডাক্তারকে টাকা দিলেন। ছেলেটি পরম তৃপ্তিতে চোখ বুজল। এখানে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন মানুষ তার কর্মফল এ পৃথিবীতেই অনেক সময় ভোগ করে। তার দৃষ্টান্ত এই বিখ্যাত ধনী জগৎ সেন। 'প্রারব্ধ' গল্পে আছে আমাদের সমাজের সাধরণ মানুষের জীবন চিত্র। ঘরে অভাব, খোকনের দুধ নেই, মুদির দোকানে পাওনা। ব্যাংকের সামান্য কর্মচারী বিশ্বম্ভর বাবুর ঘরের চিত্র। অভাব মানুষকে অন্যায়ের দিকে প্ররোচিত করে। কিন্তু পাপীকে একদিন না একদিন তার শাস্তি ভোগ করতে হয়। কিন্তু এ গল্পের সমাপ্তি আরও নিষ্ঠুর। বিশ্বম্ভর বাবু একরাতে খাজাঞ্চিকে খুন করে ব্যাংক থেকে ত্রিশ হাজার টাকা চুরি করে। স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলল, আমি চললুম, তোমরা সুখে আছ, টাকার অভাবে কষ্ট পাচ্ছ না, এই জেনে সুখে থাকব। আমি হয়তো আর ফিরব না, খোকনকে মানুষ কর। খোকনকে আদর করে চলে যাবে, তখন মনে হল পুলিশ হয়তো বাড়ি এসে টাকা নিয়ে যাবে তাই তাদের বাবার বাড়িতে রেখে নিজ হাতে টাকা মাটির নিচে পুঁতে দিয়েছিল। শুধু দুর্গামনি বিশ্বম্ভরের স্ত্রীই জানত। এরপর বিশ্বম্ভর বাবু চলে গেল। পুলিশ আসল, দুর্গামনি বলল– তার স্বামী তাদের জোর করে এখানে রেখে গেছে, সে আর কিছু জানে না। এরপর বিশ্বম্ভর বাবু নানা রকমের কাজ করল, কখনো রিক্সা টানল, কখনো কুলিগিরি করল। এক হোটেলে কিছুদিন রান্নাবান্না করল, একদিন এক সাহেবের খানসামা হয়ে সিংহল চলে গেল। প্রায় ত্রিশ বছর কেটে গেল। তার কাজে খুশি হয়ে সাহেব তাকে এক কুঠির ম্যানেজার করল। আজ আর তার অর্থাভাব নেই। কিন্তু তার মধ্যে মানসিক বিপর্যয় দেখা দিল। সে তার স্ত্রী-পুত্রের জন্য প্রচুর অর্থ রেখে এসেছে কিন্তু নিরীহ খাজাঞ্চি বাবু। তার পরিবারের জন্য সে তো কিছুই করে যেতে পারে নি। হয়তো সেই তার পরিবারের একমাত্র ভরসাস্থল ছিল। বিশ্বম্ভর অস্থির হয়ে উঠল। হয়তো এ পাপের জন্য দুর্গামনি এবং খোকন কষ্ট পাচ্ছে। শেষে সিদ্ধান্ত নিল সে দেশে ফিরবে। ফিরে প্রথমে সে খাজাঞ্চির খোঁজ নিল। তার ছেলে সদাগরি অফিসে চাকরি করে। তার বাসায় গিয়ে বলল– বিশ্বম্ভর আপনাকে টাকা দিতে বলেছে। ছেলেটি বলল,

Dhaka University Institutional Repository

কোন বিশ্বম্ভর বাবু– বলল যিনি আপনার বাবাকে খুন করেছিল। সে মারা গেছে। ছেলেটি বলল– সন্ধ্যা বেলায় আসবেন– তখন টাকা নেব। আমি একটু দরকারে বাইরে বেরুচ্ছি। সন্ধ্যা বেলায় পুলিশ তাকে বন্ধি করল। সে স্ত্রী ছেলের খোঁজ নিতেও পারল না। বিচারক তাঁকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছে। বিশ্বম্ভর বাবুর মরতে আপত্তি ছিল না। যদি সে স্ত্রী-পুত্রের খবর জানতে পারত। কিন্তু সে জানতে পারল না, যে বিচারক তাকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছে, সেই তার খোকন। তাঁর রেখে যাওয়া অর্থে সে আজ জজ হয়েছে। নিয়তির কি পরিহাস, নিজের ছেলের আদেশেই তার ফাঁসি হচ্ছে। কিন্তু ছেলে জজ জানতে পারলে মরেও শান্তি পেত। কিন্তু সে শান্তিও তার ভাগ্যে জুটল না। যার শুরু হয় ত্রিশ বছর আগে, সে শাস্তি আজ ভোগ করছে। 'শেষ ছবি' গল্পটিতে দেখতে পাই যুব সমাজের অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র। গল্পকথক এবং শ্যাম প্রেসিডেন্সি কলেজে একত্রে পড়াকালে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, শ্যাম ভাল বাঁশি বাজায় আর গল্পকথক বায়া তবলা, সকলে তাদের মানিক জোড় বলত। এক সাথে চলাবসা, খাওয়া-দাওয়া-শোয়া এবং আড্ডা, তাদের আসরে যোগ হল সুরা। গল্প কথকের বাবা টের পেয়ে তাকে টেলিগ্রাম করেন এবং বহরমপুর কলেজে ভর্তি করে দেন। আজ তিনি মুনসেফ আর রিটায়ার্ড করার পূর্বে সাব জজ হতে পারবেন। তাই আজ তিনি স্বর্গীয় পিতাকে বারংবার প্রণতি জানান। অন্যদিকে বন্ধু শ্যামকে একেবারে ছাড়তে পারেন নাই। মাঝে মাঝে চিঠি যোগাযোগ আছে। সে লেখাপড়ার সমাপ্তি টেনে একটা প্রুফ রিডারের চাকরি নিয়েছে। অন্য খরচ যোগায়– সোনা নামে এক পতিতাপল্লির মেয়ে। এদিকে শ্যামের বাবা তার জন্য মেয়ে ঠিক করেছে। বাবার কথা না শুনলে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে। কি করা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে হল এবং বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু তার যাওয়া হয় নি। শ্যাম বিয়ের পরও সোনার কাছে থাকে। এদিকে শ্যামের বাবা কলকাতায় বাসা ঠিক করে পুত্র বধূ ও পিসিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। একদিন হঠাৎ বাসায় রাত দুইটায় গিয়ে দেখে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে বৌটি, সে যেতে দরজা খুলে দিল। হয়তো রোজই দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর শ্যাম সোনার সাথে ইউরোপ বেড়াতে গেল। এরপর একদিন এক বন্ধুর কাছে খবর পেল শ্যাম খুব অসুস্থ। দেখতে গিয়ে দেখে তার যক্ষ্মা হয়েছে। সোনা ডাক্তারের কাছে গেছে। আজ মৃত্যুর আগ মুহূর্তে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। আজ তার চোখে একটা ছবিই ভাসে– তাহল একটা রোগা মেয়ে জানালার গরাদ ধরে রাস্তার দিকে আকুল নয়নে চেয়ে আছে। সেই ছবি সব ছবিকে আড়াল করে দেয়। এখানে লেখক যুব সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। সময় থাকতে ভুল না শুধরালে সারাজীবন প্রস্তাতে হয়। এখানেও তাঁকে চরমদণ্ড দিতে হয়েছে। 'পালানো যায় না' গল্পটিতে দেখতে পাই সমাজে অন্যায়কারী, অপরাধীরা অন্যায় করে সহজেই মুক্ত পায় না। সে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে পারে বটে। কিন্তু বিবেক তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। গহীন জঙ্গলে গিয়ে তার মুক্তি নাই।

Dhaka University Institutional Repository
গল্পটিতে দেখি বানোয়ারি নামের এক ফেরারি আসামী পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সে হারগিলা, আসল নাম দন দন, ভাল নাম দনুজারি নামের ব্যক্তির সহযোগী হয়ে ঝুকো নামের এক মহিলাকে খুন করে তার গয়না নিয়ে পালাতে চেয়েছিল। পরে বানোয়ারি আবার হারগিলাকে খুন করে পালায়। পুলিশ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর সে সোনাটুপি গ্রামের শেষে অরণ্যে একটা পোড়ো বাড়িতে লুকায়। কিন্তু সেখানে কে যেন তার পিছু নিয়েছে। সে শুধু হাসির শব্দ পায়। পরে সে হারগিলার ছায়ামূর্তি দেখতে পায়, ঝুমকোর ফিসফিস শব্দ শুনতে পায়– তা লক্ষ করে ছুরি মারলে দেয়ালে আটকে যায়, অনেক কষ্ট করে ছাড়াতে পারে নি। শেষে মনে হল ঝুমকো তাকে পিছন থেকে ঝাপটে ধরছে আর মেঝে চড়াৎ করে ফেটে যায় এবং সেখান থেকে হারগিলা তাকে টেনে নেয় ফাটলের দিকে। বানোয়ারি কোন ক্রমেই পালাতে পারল না। সাতদিন পর পুলিশ আবিষ্কার করল জঙ্গলের পোড়ো বাড়ির মেঝের ফাটলে আটকে আছে ফেরারি আসামী বানোয়ারি। গল্পে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন– অপরাধী কখনো পালিয়ে বাঁচতে পারে না। তার ক্ষমা নেই। 'পোকা' গল্পে আছে অপরাধবোধ অনেক সময় মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। 'পোকা' গল্পে নিখিল রঞ্জন ছেলেবেলা থেকে পোকা মেরে বেড়াত। এটা যেন তার হবি হয়ে গিয়েছিল। বড় হয়ে যখন কলেজে ভর্তি হল। কলকাতায় তেমন পোকা পেত না, তখন লাইটপোস্টের পোকা দেখে বাড়ি ফিরত। সে বিশেষ করে কান-কটারি নামে ছাইরঙের শক্ত এক ধরনের পোকা মারত। কে যেন তাকে বলেছিল পোকাগুলো ভয়ানক পাজি। কত যে পোকা মেরেছে তার ইয়াত্তা নেই। একদিন রাতে দেখে তার বিছানায় একটি পোকা। সে মেরে ফেলে– সঙ্গে সঙ্গে পোকাটা কিচ করে একটা শব্দ করল, তারপর আরেকটা, তাকে মারার সাথে সাথে কিচ কিচ শব্দ করতে করতে ঘর পোকায় ভরে গেল। পোকারা যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। এরপর একদিন একটা কান-কটারি তার কানেও ঢুকেছিল। তাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে। এরপর থেকে সে কানে তুলো দিয়ে রাখে। কিন্তু তাই বলে পোকার নিস্তার নেই, দেখলেই মেরে ফেলে। এরপর অনেক দিন কেটে গেল বিয়ে করে শ্বশুরের পয়সায় ব্যবসা শুরু করেছে। একদিন মাল খরিদের জন্য ট্রেনে সুসকরায় যাচ্ছিল। কামরা খালি দেখে সে চারদিকে দেখে নিল এবং পোকার প্রতিষেধক ঔষদ চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে কানে তুলো দিয়ে ঘুম দিল। হঠাৎ তার মনে হল তার চোখে মুখে কি যেন ছররার মতো পড়ছে। সে দুহাতে মুখ ঢেকে রেহাই পেল না এবং কিচ্ কিচ্ কিচ্ শব্দে চারদিক ভরে গেছে– তার মুখ ক্ষতবিক্ষত করছে, নাকের ভিতর ঢুকছে। কানের তুলো টেনে বের করছে। সে জ্ঞান হারাল। পরদিন ট্রেনের কামরায় তার মৃতদেহ পাওয়া গেল। ডাক্তার বলল– শকে মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে একটা ভীতি কাজ করেছিল। আসলে অপরাধ– সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক– মানুষকে সব সময় তাড়িয়ে বেড়ায়। 'আত্মপর' গল্পটিতে দেখতে পাই মানুষ না ভেবে অনেক কাজ করে ফেলে। সেটা যে অন্যের কষ্টের কারণ হতে পারে তা

Dhaka University Institutional Repository

কখনো ভেবে দেখে না। কিন্তু যখন মানুষ নিজে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন সে বুঝতে পারে অপরের দুঃখ কষ্ট। এ গল্পের মূল চরিত্র বা নায়কের একমাত্র সন্তান শচীনকে সাপে কেটেছে। চারদিকে কান্নার রোল। শচীনের মা বার বার অজ্ঞান হচ্ছে। তখন নায়কের ঠিক পাঁচ বছর আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। একদিন দুপুরে ঘুমের সময় একটি পাখির ছানা তাঁর মুখের উপর পড়ায় বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল। তার একটি বিড়াল তাকে মুখে করে নিয়ে গেল। তখন শালিকের মায়ের সেকি আর্তনাদ। আজ এতদিন পর সেদিনের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে নায়ক একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে উঠেছিল। মানুষ কখনোই অন্যের যন্ত্রণা বুঝতে চেষ্টা করে না। যতক্ষণ না সে নিজে সেই যন্ত্রণা ভোগ না করে। এখানে লেখক মানুষ হৃদয়ের অপরাধবোধকে তুলে ধরেছেন। গল্পটি আয়তনে খুবই ছোট, কিন্তু এর গভীরতা বিশাল।

অতিলৌকিকতার আধারে সমাজবাস্তবতা

জীবনের বিচিত্র দিক নিয়ে বনফুল গল্প লিখেছেন। তিনি অতিলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত লেখাতেও বিশেষভাবে কৃতিত্বের দাবিদার। অতিপ্রাকৃত শব্দের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে অলৌকিক। অতিপ্রাকৃত শব্দের সহজ অর্থ প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যাওয়া বা ছাপিয়ে যাওয়া। বনফুল কিন্তু তার এই অতিপ্রাকৃত গল্পের মাঝে বাস্তবতাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। বনফুলের অতিলৌকিকতা প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন– "অভিজ্ঞতা-পন্থী বুদ্ধিবাদী শিল্পীর রচনায় এই 'রহস্যবাদে'র আবির্ভাবে চলিষ্ণুমনা বনফুলের সাহিত্য ধর্মেরও বিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। শুধু বিবর্তনই নয়, একে জন্মান্তরও বলা যেতে পারে। 'অদৃশ্যলোকে' যেন শিল্পীর নবজন্ম হয়েছে। অলৌকিকের আলোকে তিনি জীবনকে নতুন করে যাচাই করে দেখছেন।"[১০] আসলেই বনফুলের অতিলৌকিক গল্পের মধ্যেও সমাজের বাস্তবতাগুলো চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়। তাঁর অতিলৌকিক গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– মালাবদল, প্রজাপতি, একই ব্যক্তি, পালানো যায় না, মিনির চিঠি, পক্ষীবদল, জবর দখল, ছবি, ভূতের প্রেম, মনু ইত্যাদি। গল্পগুলোতে লেখক অতিলৌকিতার মাঝেই সমাজের চিত্রগুলোকে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

'মালাবদল' গল্পে অতিলৌকিকতার মাঝে, সমাজের নারীদের বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে। গল্পটিতে দেখতে পাই বন্দনা নামের একটি মেয়ে। আজ তার জীবনের পরম রাত্রি। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে। দ্বিতলের বাতায়নে বন্দনা একা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ গেল পাখিটা সুর চড়িয়ে ডেকে উঠল। জ্যোৎস্নায় শিহরণ লাগল। খোঁপা থেকে একটা বেলফুল পড়ে গেল, ফুলটা হাসছে। বন্দনার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সে রূপবান এবং গুণবান স্বামী পেয়েছে। কত ধনীর দুলালী এ ছেলের জন্য ভীড়

Dhaka University Institutional Repository
জমিয়েছিল। কিন্তু তার সুরের কাছে সব হার মেনেছে। বন্দনা ভাল গান গায়। সে আকাশের দিকে চেয়ে ভাবছে, সে স্বল্পালোকে দেখতে পেল একজোড়া হংস মিথুন আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। সে ভাবল আজ স্বামীকে বাগেশ্রী আলাপ করে শোনাবে। সেতারটা পাশের ঘরে এনে রেখেছে। এমন সময় ঝন করে শব্দ হল। ভাবল সেতারের তার ছিঁড়ে গেল কি? দেখে এক অপরূপ রমণী তাকে বলছে, 'আমি চললুম। আমি তোমার গানের সুর। এতদিন তুমি আমার সাধনায় মগ্ন ছিলে। আজ আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে' (১খ, ৫১০পৃ.)। সে বন্দনাকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই চলে গেল। লেখকের এই অপরূপ সুরের দেবীর আগমন অতিলৌকিক। কিন্তু দেবীর বিদায় থেকে বোঝা গেল সংসার জীবনে পা দিলে মহিলাদের অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে হয়। ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব হয় না। এখানেই লেখকের নৈপুণ্য-- কত ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজের একটি বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। 'প্রজাপতি' গল্পটিতে সমাজের একটি বাস্তবচিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে আমরা দেখতে পাই গল্পের মূল চরিত্রটি বেশ কিছুদিন ধরে নিঃসঙ্গ। তার স্ত্রী আশা বেশ কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন। এখন তার এক বন্ধু সোমেশ্বর তার কাছে প্রায়ই আসেন। এবং তার বোন বেলাকে বিয়ে করার জন্য বলেন। গল্পের মূল নায়কেরও বেলার প্রতি বেশ দুর্বলতা আছে। গল্পের নায়ক এ নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটা জিনিস লক্ষ করেছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার পড়ার টেবিলে ইলেকট্রিক বাতির শেডের উপর একটি প্রজাপতি এসে বসে। যখন তিনি টেবিলে বসে লেখাপড়া করেন শেডটির উপর চুপ করে বসে থাকে। আশা মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে ঐ তাঁর সন্ধ্যা বেলার সঙ্গী। আজ সোমেশ্বর যখন বলল, "যা হোক একটা ঠিক করে ফেল ভাই– তারপর একটু থেমে বলল– শেষ পর্যন্ত বিয়ে তো করবেই, সবাই করে, বেলাকে যদি কর, আমি নিশ্চিন্ত হই। বেলা তোমাকে ভালও বাসে।" (১খ, ৫১৫পৃ.) তখন সে কিছু সময় চুপ থাকে। সোমেশ্বর বলে তুমি না বলে দিলে দ্বিজেনের সাথে চেষ্টা করি। তখন নায়ক বলল– দ্বিজেনের কাছে যাবার দরকার নেই। আমি বিয়ে করব। তবে কিছুদিন সময় দাও ভাই। এরপর সোমেশ্বর বেলাকে সুখবর দেয়ার জন্য চলে গেল। এরপর যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য। হঠাৎ আশার কণ্ঠস্বরে কে যেন বলে উঠল– "তাহলে আমার দায়িত্বও ফুরোল– আমিও চললাম।" প্রজাপতি উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আসলে আমাদের সমাজে স্ত্রী মারা যাওয়ার পর অনেকেই বিয়ে করে, স্ত্রীকে যদিও তারা বলে থাকে তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে গ্রহণ করব না, তবে বাস্তবে দেখা যায় তার উল্টো। সামাজিক কারণে তাকে আবার বিয়ে করতে হয়। এখানেও প্রজাপতির আগমন এবং চলে যাওয়া অলৌকিক, তবে প্রজাপতির কণ্ঠে কথা এবং ভদ্রলোক বিয়ে করা কিন্তু বাস্তব। 'একই ব্যক্তি' গল্পটিতে দেখতে পাই একই মানুষের নানা রূপ। সময়ের সাথে সাথে মানুষের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। দূর থেকে দেখা মানুষ এবং কাছ থেকে দেখা একই মানুষের মধ্যেও অনেক তারতম্য ঘটে। গল্পের

Dhaka University Institutional Repository
মূল চরিত্র প্রৌঢ় সিমু। তার স্বামী বেশ রাশভারি কড়া মেজাজের লোক। সারাক্ষণ বই নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন। কাছাকাছি কেউ জোরে কথা বললে বিরক্ত হতেন, বকতেন, এমন কি মারধরও করতেন। সবসময় নির্জনতাই যেন পছন্দ। সারাটা জীবন এমনি কাটিয়েছেন। সব মিলিয়ে এত বছর সংসার করেও সিমু তাকে বুঝতে পারে নি। তবে কখনো সংসারের কোন কর্তব্যে তিনি অবহেলা করে নি। সব মিলিয়ে ভালমানুষ গোছের বলা যায়। মৃত্যুর দিনটায় তিনি সিমুর গান শুনতে শুনতে মারা গেলেন। আজ এতদিন বাদে কুড়ি বছর আগের একখানি চিঠি পেল সিমুকে লেখা, সেখানে যেসব কথা লিখেছেন সিমুর মনে হচ্ছে তাঁর মনের কথা নয় শুধু লেখার জন্য লেখা। চিঠি আজ পড়ে মনে হচ্ছে– "একি শুধু কথাই? মনের কথা নয়? কি জানি, আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে।" বিয়ের আগে যেমন শুনেছিল, পরে পরে দেখল– ঠিক তেমনটি নয়। সর্বদাই সিমুর সামান্যতম অসুবিধা দূর করবার জন্য ব্যস্ত। কুড়ি বছর সংসার করেও তাঁকে চিনতে পারে নি। আজ নীলিমা আসবে, তার শরীরে প্রেতাত্মা ভর করে। ঠিক করেছে সে এলে তার মৃত স্বামীর সাথে কথা বলবে। নীলিমার চোখ মুখ হঠাৎ কেমন বদলে গেল, ঠিক যেন তাঁর দৃষ্টি, নির্মিশেষে সিমুর দিকে তাকিয়ে আছে। "আমাকে ডেকেছ কেন? অকিবল তাঁরই গলা। সিমু বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ না?' সে বলল, 'না'। আমাকে মনে পড়ে না তোমার। সে বলল 'না'।" (১খ, ৫১৯পৃ.) গল্পটিতে লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সময়ের সাথে মানুষের পরিবর্তন। মৃত্যুর আগে এবং পরের পরিবর্তন। মৃত ব্যক্তি এখন এ জগতের কেউ নয়। এখানে প্রেতাত্মা সত্যি কি কল্পনা সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল পরজগতের সাথে ইহজগতের কোন সম্পর্ক থাকে না। এটাই স্বাভাবিক বাস্তব। 'অদ্ভুত কাণ্ড' গল্পটিতে অপ্রাকৃতির মাঝেও সমাজের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। সময়ের সাথে আমাদের ঐতিহ্যকে আমরা হারাতে বসেছি। তাকে কেউ রক্ষণা-বেক্ষণের বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করছি না। 'অদ্ভুত কাণ্ড' গল্পটি যদিও অদ্ভুত তবে আসল সত্য ও বাস্তবতা এখানে ফুটে উঠেছে। মহারাজ জ্বলজ্জ্যোতি সিংহ কাশীতে এসেছেন বহুকাল পূর্বেকার দিনগুলোকে ফিরে পাওয়ার জন্য। এসে তিনি গাইড নিযুক্ত করেন এক ধপধপে ফরসা রং, গম্ভীর কিন্তু প্রসন্ন লোককে। লোকটি মহারাজকে আগে থেকেই নাকি চেনেন। মহারাজকে গাইড হোটেলে নিয়ে এল এবং বলল– "মহারাজ, আপনার কি কি চাই আমাকে আদেশ করুন।" (২খ, ২৬পৃ.) মহারাজ বলল– "কিছু ভাল জরদা, আর কিছু শাড়ি। সেকালে জহর বাইজি খুব ভাল গান গাইত। সে যদি থাকে, তার কাছে নিয়ে যেও। আর বাবা বিশ্বনাথ তো আছেনই, তাঁর কাছে তো নিশ্চয়ই যেতে হবে।" লোকটি উত্তরে জানাল এর কিছুই নেই। জহর বাইজির মেয়ে এখন সিনেমায়। ভাল পাখোরাজ বাজাতো নবীন মিত্তির, এখন অন্ধ। ছেলেরা খেতে দেয় না। আর বাবা বিশ্বনাথ নেই, আছে শুধু পাথরটা। বিশ্বনাথ এখন কখনো রাজনৈতিক দলের ক্যানভাসার কখনো দালাল, রিকসাওয়ালা, নানাভাবে তার

Dhaka University Institutional Repository
দিন কাটে। এখন তিনি হোটেলে চাকরি করেন। বলেই লোকটি বেরিয়ে গেল। তখন হোটেলের আর এক চাকর এসে বলল– কাকে খুঁজছেন। তিনি বললেন "যে লোকটি আমাকে নিয়ে এল এখানে।"(২খ, ২৭২পৃ.) চাকরটি বলল ও মহাদেব। ও লোকটা পাগলা গোছের হুজুর। কোথাও টিকে থাকতে পারে না। সরে পড়ল বোধ হয়। এ গল্পে একটা বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে যে, পুরানো কোন কিছুই যেন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। আর ঐতিহ্য ধরে রাখতে আমরাও তেমন সচেষ্ট নই।

'মিনির চিঠি' গল্পটি আপাত দৃষ্টিতে অতিলৌকিক মনে হলেও এ গল্পে সমাজের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। সমাজে সন্ত্রাসী ও গুণ্ডাদের অত্যাচারে মানুষকে কিভাবে জীবন দিতে হয়। বিশেষ করে নারীদেরকে নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তার বাস্তব চিত্র এ গল্পে প্রকাশ পেয়েছে। আর প্রকাশ পায় সাধারণ মানুষ প্রতিবেশীর বিপদে এগিয়ে আসে না। তার জন্য গুণ্ডাদেরই রাজত্ব। তাদের কেউ বাধা দেবার নেই। তার কারণেই সমাজ আজ সন্ত্রাসীদের কাছে জিম্মী। গল্পে শিবেন বাবু পনের দিন আগে মারা গেছে। তবু তার অতৃপ্ত আত্মা প্রতিটি ডাকবাক্স হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কারণ মিনিকে সে তার ভালবাসার কথা জানিয়েছিল কিন্তু উত্তর পাওয়ার আগেই সে হার্টফেল করল। আর ওদিকে মিনির অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে– সে তার প্রতিবেশী নিতাইদাকে মালতী লতা হয়ে দুলে দুলে বলছে–

> "তুমি শিবেন বাবুকে লিখে দাও আমি তার চিঠি পেয়েছিলাম। তোমরা তো কেউ আমাদের বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে এলে না। গুণ্ডারদল আমাকে আর মাকে নিয়ে চলে গেল। আমার উপর মায়ের উপর কি যে অত্যাচার করেছে– তা অকথ্য।
> আমি মরে গেছি খবরটা তুমি শিবেন বাবুকে জানিয়ে দাও। আর যে কথাটা লজ্জায় তাকে জানাতে পারি নি, সেই কথাটা এখন বলেই কি হবে। তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন।"(২খ, ২০২পৃ.)

কিন্তু মিনির একথা নিতাই লক্ষই করে নি। সুতরাং মিনির অতৃপ্ত আত্মা ঘুরতে লাগল। হঠাৎ একটা ঝড় এসে মালতী লতা ফুল ছিঁড়ে আঁছড়ে পড়ল শিবেনের উপর। এবং শিবেনকে ঘিরে ঘুরতে লাগল আকুল হয়ে মালতী লতা। কিন্তু শিবেন বুঝতে পারল না যে তার উত্তর এসেছে। এ অতিলৌকিক ভালবাসার গল্পের মধ্যে দিয়ে সমাজের চরম সত্যকে লেখক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'পৌরাণিক-আধুনিক' গল্পে আছে মানুষ অতিরিক্ত ভাল করতে গিয়ে অনেক সময় ক্ষতি করে বসে। তার বড় প্রমাণ এই গল্পটি। সেই পৌরাণিক গল্পে যা ঘটেছে আজ বর্তমানেও ঘটছে। শুধু সময়ের ব্যবধান। গল্পে এটাও বোঝা যায় যে অতিরিক্ত ভালর পিছনে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া এবং কাজের গাফিলতিরও প্রশ্ন উঠতে পারে। 'পৌরাণিক-আধুনিক' গল্পে লেখকের এক পাঠক এক সন্তান সম্ভবা মেয়ে উষাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছে কিন্তু ডাক্তার দেখে বলল–

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতালে লেডি ডাক্তারের কাছে নিতে। তখন পাঠক ডাক্তার বাবুকে বলল, আপনাকে একটা গল্প বলি– এক ব্রাহ্মণ বিয়ে করার কিছুদিন পর অনুভব করলেন তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন, তখন তিনি স্ত্রীকে রেখে হিমালয়ে গিয়ে কঠোর সাধনা শুরু করেন। বহু বছর পর ভগবান তার তপস্যায় খুশি হয়ে বললেন– আমি তোমাকে বর দিলাম তুমি যে কোন লোককে অমর করতে পারবে। ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরে দেখে স্ত্রী বৃদ্ধা, এক সুদর্শন যুবক তার সেবা করছে। তখন স্ত্রী বলল তিনি চলে যাওয়ার পর এ ছেলে ভূমিষ্ট হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে এক ভৃগুমুনি তার হাতের রেখা দেখে বলেছেন ছেলেটি এক বছরের মধ্যে মারা যাবে। শুনে ব্রাহ্মণ বলল, চিন্তা কর না আমি ওকে অমর করে দেব। পরে কি মনে করে তিনি বিষ্ণুকে ডাকলেন– এবং বললেন আপনি অমর করে দিলে আরও ভাল হয়, তখন বলল তাহলে ব্রহ্মার কাছে যাই, ব্রহ্মা বলল– মহেশ্বরের কাছে যাই, শেষে পাঁচ জনে ভাগ্যবিধাতার কাছে গেল– কিন্তু দপ্তরে ঢুকতেই এক প্রকাণ্ড পাথর মাথায় পড়ে ছেলেটি মারা গেল। তখন ভাগ্য বিধাতা বলল– এ ছেলের মৃত্যুর জন্য সেই মুনিবর ব্রাহ্মণই দায়ী। কারণ সেই তাকে অমর করে দিতে পারত। গল্প শেষ করে পাঠক মশায় বলল– উষাকে প্রথমে নেয়া হল নার্স আভার কাছে, সে পাঠাল– ডাক্তার শশী বাবুর কাছে আর শশী বাবু পাঠাল আপনার কাছে। আর এখন আপনি বলছেন– হাসপাতালে লেডি ডাক্তারের কাছে পাঠাতে। উষাকে নেয়া হল হাসপাতালে। হাসপাতালেই উষা মারা গেল। মাস দুই পরে উষার মত কেস, এক জমিদারের পুত্রবধূর সন্তান প্রসব। ডাক্তার বাবু এক হাজার টাকা ফি নিয়ে করে দিলেন। মা এবং সন্তান উভয়েই সুস্থ আছে। সেখান থেকে ফেরার পথে গাড়ির টায়ার ফেটে যায়। এবং ড্রাইভার যখন মেরামত করছে তখন ডাক্তার বাবু একটু পায়চারী করছে। হঠাৎ কানের কাছে কে যে বলে উঠল– "আমাকে তা হলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন কেন কাকা বাবু, আমার বাবা আপনাকে অত ফিস দিতে পারবেন না বলে।" (৩খ, ৩৪৫পৃ.) অন্ধকার জায়গা বোঝা যাচ্ছিল না। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করতে বলল, এটা শ্মশান। তাহলে প্রশ্ন কে করল। উষা না, ডাক্তারের বিবেক। আসলে সেই প্রাচীন যুগ থেকে মানুষের চরিত্রই এমন, নিজের দায়িত্ব কর্তব্য অন্যের উপর চাপানো। শুধু যুগের পরিবর্তন হয়েছে– মানুষের নয়। এখানে উষার প্রেতাত্মা ডাক্তার বাবুকে যে কথাগুলো বলেছে– তা কঠিন বাস্তব। 'ভূতের প্রেম' গল্পটি যদিও অতিলৌকিক, তবুও এর মাঝে বনফুল নারীমনের জটিলতাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। সে ভালবাসার জন্য সবকিছু ছাড়তে পারে। গল্পের নায়িকা ইন্দু ভালবাসার টানে ঘর ছাড়ে তার ড্রাইভার মানিকের সাথে। ধনসম্পত্তির চেয়ে ভালবাসাই বড় হয় দাঁড়ায়। সে মানিকের সাথে যে বাড়িতে উঠেছে– সেটা ছিল কোন এক মৈথিল জমিদারের বাগানবাড়ি, অনেক পুরনো বাড়ি। গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ায় রাত দশটায় মানিককে চলে যেতে হয়। একা বাড়িতে ইন্দু। সে লক্ষ করল বিশাল চার অশ্বের রথ বাড়ির গেটে থামে এবং তার ঘরে এসে হাজির

Dhaka University Institutional Repository
হয় এক প্রকাণ্ড লম্বা লোক। সে মহারাজ রঘুর পুত্র। শ্রীরামচন্দ্রের পিতামহ। সে ইন্দুমতীকে প্রেম নিবেদন করে এবং সঙ্গে যেতে বলে। কিন্তু ইন্দু পরিষ্কার তার ভালবাসার মানুষ মানিক একথা জানিয়ে দেয়। এরপর সে রথ চলে যায় এবং বলে যায়– আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে। ঘোড়াগুলো যেন মার্বেল পাথরের। ইন্দু বিষয়টি তার ডাইরিতে লিখে রাখে। এখানে ইন্দু তার ভালবাসার জন্য স্বামীর বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে এসেছে, রাজ প্রস্তাবও প্রত্যাখান করেছে। পরবর্তীতে ইন্দুমতীর স্বামী ভূজঙ্গধর ইন্দুকে চুলেরঝুঁটি ধরে মারতে মারতে ফিরিয়ে আনে আর মানিককে গুলি করে ওইখানকার একটা ইঁদারায় ফেলে দিয়েছে। ভুজঙ্গধরের বিশ্বাস ইন্দু হয়তো পাগল হয়ে গেছে– তাই তাকে লুম্বিনী পার্কে পাঠানোর চিন্তা করার জন্য বন্ধুর সাথে পরামর্শ করছে। এমন সময় বাড়ির চাকর এসে বলল– "প্রকাণ্ড একটা চার ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। কি বড় ধবধবে ঘোড়াগুলো। গাড়ির ভেতর থেকে চৌগোঁপ্পা একটা লোক মুখ বার করে বললে– 'ইন্দুমতী এস।' মাঠাকুরণ ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চেপে বসলেন। আর টগবগ করে গাড়িটা বেরিয়ে গেল ঝড়ের বেগে।" ইন্দু আর ফেরে নাই। এখানে ইন্দু যখন তার মানিককে পেলই না, তখন সে তার স্বামীর কাছেও থাকল না। সে হয়ত পরকালের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল। এখানে ইন্দুর ভালবাসার জয় হয়েছে। 'পক্ষীবদল' গল্পটি যদিও অতিলৌকিক। তার আড়ালেই লুকিয়ে আছে বাঙালি নারীর সংস্কারবোধ। সে তার বিশ্বাসে অটল। গল্পটিতে ইন্দুমালার স্বামী জিতেন বাবু বিলেত থেকে ফেরার পর ভীষণভবে বদলে গেছেন। ইন্দু যা বলে তাও অবিশ্বাস্য মনে হয়। ইন্দু তাকে স্বামী হিসেবে স্বীকার করে না। সে বিধবার বেশ ধারণ করেছে। জিতেন বাবু অত্যন্ত নিষ্ঠাচারী নির্বিবাদী লোক, একটা সিগারেট দূরের কথা পানটি পর্যন্ত খেতেন না। রাস্তায় দেখা হলে মৃদু হেসে সসঙ্কোচে সরে দাঁড়াতেন একধারে। কিন্তু বিলেত থেকে এসে একেবারে অন্য লোক– সিগারেট, পান জর্দা, হাফ শার্ট পরে বাটারফ্লাই গোঁফ রেখে মোটর সাইকেল করে দাবড়ে বেড়াচ্ছেন চতুর্দিকে। নেতাও হয়েছেন উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলের। এখানকার প্রবীণ উকিল গোলক বাবুই ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তাকে পদচ্যুত করে জিতেন বাবু নিজেই চেয়ারম্যান হলেন। সবাই হয়তো ভেবেছে জিতেন বাবু মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে এমন বদলে গেছেন। একবার গ্রামে ঝড়ের সময় ডাল ভেঙ্গে মাথায় পড়ে অজ্ঞান ছিলেন– সবাই ভাবে মরে গেছে খাটিয়ায় করে শ্মশান ঘাটেও নেয়া হয়, খাটিয়া নামাবার পর হাত-পা নড়ছে। চোখ খুলে হেসেছিলেন নাকি? এরপর বাড়ি ফিরে এলেন। জিতেন বাবু বেঁচে ওঠার পর ইন্দু কলকাতায় বাপের বাড়ি চলে যায়। জিতেন বাবু কিন্তু ছাড়বেন না। ইন্দুকে আইনত ফিরিয়ে আনতে না পারলে বেআইনী ভাবে আনতে ইতস্তত করবেন না। একারণে তাকে ফেরানোর জন্য গল্প কথক ইন্দুর কাছে গেলেন, তখন ইন্দু বলে, 'উনি আমার স্বামী নন'– কারণ যখন ইন্দু কলেজে পড়ত তখন বীরেন বাবু নামে

Dhaka University Institutional Repository

এক ভদ্রলোক তাকে প্রেম নিবেদন করেন। সে তাকে প্রত্যাখান করায় বীরেন বাবু আত্মহত্যা করে। এখন তার বিশ্বাস ঐ বীরেন প্রেতাত্মা জিতেন বাবুর দেহে ভর করেছে। ঠিক একই রূপ যেন দেখতে পাই 'জবর দখল' গল্পে। কেন তার এমন আজগুবি ধারণা হল জানতে চাইলে বলে– ওর চাল-চলন, কথা বার্তা সব বীরেন বাবুর মতো। এছাড়াও একটা ঘটনা ঘটে একদিন– রাতে খাবার খেতে বসে হঠাৎ পেয়ার জেলি চায়। তখন ইন্দু কাল এনে দেবে বলায়– উনি বলেন "জেলি আমার এখন চাই, কাল পর্যন্ত তর সইবে না। জীবনে যখনই যা চেয়েছি না নিয়ে ছাড়ি নি। জানত কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে। আমারও যায় নি। জাতিভেদের অজুহাতে বীরেন মিত্তিরকে তোমরা ঠেকিয়ে রাখবে ভেবেছিলে, কিন্তু তা যে পার নি সেটা তুমি অন্তত বুঝেছ এতদিনে।" (৩খ, ১৩৮পৃ.) এর মানে খাঁচাটি ঠিক আছে পাখি বদলে গেছে। সুতরাং ইন্দু আর তার স্বামীর ঘরে ফিরে যাচ্ছে না। এখানে ইন্দু তার স্বামীকে ঠিক ভক্তি করে, তবে বীরেন বাবুকে নয়। 'জবর দখল' গল্পে দেখতে পাই নারী কখনোই তার প্রতিদ্বন্দ্বী বা সতীনকে সহ্য করতে পারে না। জীবত অবস্থায় তো নয়, মৃত অবস্থায় তার অতৃপ্ত আত্মাও সতীনকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। 'জবর দখল' গল্পে সুন্দনা ডাক্তারের বাল্য বন্ধুর স্ত্রী। সে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় দেখতে যায়। সে শুধুই বিড়বিড় করছে, এবং দুমাস ধরে বিছানায় পড়ে আছে। উঠতে পারে না। সুন্দনা কালো হলেও অপরূপ সুন্দরী। ঘুমের ঔষুধেও ঘুম হয় না। শুধু বলে "জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল আমার।" (৪খ, ২২৬পৃ.) কিন্তু শরীরে জ্বর। নাড়ীও ভালো, রক্তের চাপও ঠিক, গলা খাবার দিলে খায়ও। কিন্তু একদিন লক্ষ করা গেল তার গায়ে ফোসকা পড়েছে। চোখে পুঁজ হয়েছে। মুখের সুন্দর শ্রী আর নেই। ঠোঁটের চামড়াও কুঁচকে গেছে। টেস্ট করে কোন রোগ জীবণু পাওয়া গেল না। এর চার পাঁচদিন পরে সুন্দনার বাবা হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, মেয়ে আর বাঁচবে না। গিয়ে দেখা গেল– তার সবচুল এক পাশে পরচুলার মত পড়ে আছে, মাথা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, শরীরের চামড়াও ঢিলে হয়ে গেছে। মনে হয় কেউ টেনে ছিঁড়েছে। রাতে সুন্দনার ঘরে যে ছোট ছেলেটা শুত সে বলল– রাতে কে বলছে, দূর হ, দূর হ, দূর হ। তারপরই দিদি আর্তনাদ করে উঠল। আলো জ্বেলে দেখি এই কাণ্ড। সুন্দনাকে হাসপাতালে নেয়া হল। তার বাবাকে বলা হল সুন্দনার স্বামীকে খবর দিতে। তখন তার স্বামী হরিশ আফ্রিকাতে জেল খাটছে। হাসপাতালে সুন্দনা ধীরে সুস্থ হল। কিন্তু তার চেহারা বদলে গেল। কাল রঙ হল গোলাপী। সুন্দর চুলগুলো লালছে। গায়ের চামড়া খোলসের মত খসে গেল। খাবার রুচিতেও পরিবর্তন এল। সে যেন অন্য মানুষ। এমন সময় হরিশ এসে হাজির। হরিশ স্ত্রীকে দেখতে এল, ডাক্তারও সাথে। দেখে হরিশ চমকে উঠল। "একি আভা! তুমি!" সুন্দনা বলল– 'হ্যাঁ, আমি ফিরে এসেছি।" (৪খ, ২২৯পৃ.) আভা হরিশের প্রথম পক্ষের স্ত্রী। বিয়ের দুবছর পরে সুন্দনার প্রেমে পড়ে লুকিয়ে বিয়ে করে। এ খবর শুনে আভা আত্মহত্যা করেছিল। গল্পটা যদিও

Dhaka University Institutional Repository
অতিলৌকিক মনে হয়। তবুও এটা সত্যি কোন নারী তার সতীনকে কখনোই প্রশ্রয় দিতে রাজি নয়। লেখক সে কথাই এ গল্পে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। 'ছবি' গল্পে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের অন্যায়বোধ, ভক্তি এবং বিশ্বাস। যদিও গল্পটি অবিশ্বাস্য মনে হয়। তবুও কোন ব্যক্তির বিশ্বাসকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। লেখকের ডাক্তার হিসেবে যে অভিজ্ঞতা সেখান থেকে হয়তো গল্পের সূচনা। ডাক্তার বাবু হিরণ সেন নামের এক রোগীকে দেখতে যান, রোগী পক্ষাঘাতগ্রস্ত, ভাল করে দেখে সন্দেহ হল সিফিলিস। ডাক্তার বাবু বললেন– রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। তখন রোগী আগের রিপোর্টগুলো বার করে দিলেন। রক্তে কোন দোষ নেই। হিরণ সেন বলল আপনি একবার কেন দশবার রক্ত পরীক্ষা করতে পারেন কিন্তু কোন লাভ হবে না। সব রকম বড় ডাক্তার এবং চিকিৎসা হয়েছে লাভ হয় নি হবেও না। তবে হিরণ বাবু আবার বললেন– "না আশা ছাড়ি নি আমি। আপনি যদি ডাক্তারি না করে অন্য একটা উপায় অবলম্বন করেন, তাহলে হয়তো সেরে যেতে পারি আমি। শুনেছি, আপনি স্বামী বিবেকানন্দের একজন ভক্ত।" (৩খ, ৩৫২পৃ.) আপনি বিবেকানন্দের কাছে প্রার্থনা করুন, তাহলেই আমার বিশ্বাস, অসুখ সেরে যাবে। তখন ডাক্তার বললেন, আপনিই করুন না। উত্তরে বলল, 'সর্বদাই করছি– কাজ হচ্ছে না, হবেও না। কারণ স্বামীজী আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন।' এরপর হিরণ বাবু ডাক্তারকে তার জীবনের কথা বললেন– তিনি শেফালী নামের একটি মেয়েকে ভালবাসতেন, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ আর সে কায়স্থ। সুতরাং বিয়ে সম্ভব নয়। শেফালীরা গরিব তাই বিয়ে হচ্ছিল না। কিন্তু একদিন এক ষাট বছরের বুড়োর সাথে শেফালীর বিয়ে ঠিক হল। তখন তিনি গুণ্ডা ঠিক করে শেফালীকে উঠিয়ে এ ঘরটি রাখেন এবং তাকে বিয়ের কথা বলেন। শেফালী রাজি হয় না। তখন তিনি আসুরিক মতে বিয়ে করবে বলে শেফালীকে জড়িয়ে ধরে। শেফালী চিৎকার করল, কেউ এল না। কিন্তু এমন সময় তার ঘরে বিবেকানন্দের ছবির কাচ ভেঙ্গে স্বয়ং স্বামীজী সামনে দাঁড়ালেন এবং তার কোমরে লাথি মারলেন– সেদিন থেকে হিরণ বাবুর এ পক্ষাঘাত। আর তিনি শেফালীকে নিয়ে চলে গেলেন। সকলে বলেছে শেফালী গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সে দেখেছে স্বামীজী শেফালীকে নিয়ে গেছে। হিরণ বাবু স্বামীজীর ভক্ত হয়েও তাকে হারালেন। আর তিনি ফিরে আসে নি। ঐ ছবির ফ্রেম এখনো খালি পড়ে আছে। এরপর থেকে ডাক্তার রোজ স্বামীজীর কাছে হিরণ বাবুর জন্য প্রার্থনা করেছেন। কিছুদিন পর হিরণ বাবু মারা গেছেন। 'মনু' গল্পটিকে অতিলৌকিক মনে হলেও কিন্তু বাস্তব সত্য বেরিয়ে এসেছে। 'মনু' গল্পে ছোট্ট মেয়ে মনু মারা গিয়েছে। তারা বাবা রমেন তাকে শ্মশানে নিয়ে যায়। তখন ওখানে আর এক ধনী ব্যক্তির চিতা সাজানো হয়েছিল তাকে চিতায় উঠানো হল সম্পূর্ণ উলঙ্গ-নিরলঙ্কার দেহে। দেখে রমেনের ভাল লেগেছিল। সে তার মেয়ে মনুর কাজ সম্পন্ন করে বাড়ি ফিরল। কিন্তু কি যেন একটা ভয় তাকে পেয়ে বসল। গাছ-পাখিরাও তার দিকে চেয়ে অনড় হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আছে। তখন সে বারান্দায় একটা চেয়ারে বসাছিল। দেখল একটি ছোট মেয়ে দৌড়ে চলে গেল। তখন পাখিরা যেন বলল, হয়েছে, হয়েছে, মজাটা খুব জমবে এইবার। এরপর শুনল ঘরে রমেনের মা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে– "মনুর মত গলা। এরপর তিনি ঘরের কপাট খুলে বেড়িয়ে এসে বলতে লাগলেন– 'মনু, মনু, শোন, কোথা গেলি। ফিরে আয়।" (৪খ, ৩৬৮পৃ.) তখন রমেনকে দেখে বলল– মনু এসেছিল। "সে বলল– ঠাকুমা তুমি আমার হাতের বালা দুটো খুলে নিতে বারণ করেছিলে। ওরা কিন্তু খুলে নিয়েছে। সত্যি খুলে নিয়েছিল।" (৪খ, ৩৬৯পৃ.) একথা শুনে রমেন অজ্ঞান হয়ে গেল। পকেট থেকে সোনার বালা দুটো বেরিয়ে পড়ল। এখানে ছোট মেয়ের সখের বালা দুটো তার বাবা খুলে নিয়েছে। তাই হয়তো তার অতৃপ্ত আত্মা ঠাকুমাকে নালিশ জানিয়ে গেছে। মানুষের শেষ ইচ্ছা পূরণ করা উচিত। মানুষের লোভ অনেক সময় তাকে হীন করে তোলে। 'পালানো যায় না' গল্পটি অতিলৌকিক হলেও, এখানে লেখক একটা জিনিস পরিষ্কার করে বোঝাতে চেয়েছেন– সমাজে অন্যায়কারীর সহজে মুক্তি নাই। সে আইনের চোখে ধুলো দিলেও বিবেক তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। গল্পটি আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। বানোয়ারি নামের এক ফেরারি আসামী পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে গহীন জঙ্গলে পোড়ো বাড়িতে লুকিয়েছে। সেখানে রাতের অন্ধকারে যাদের সে হত্যা করেছে– ঝুমকো তাকে শক্ত করে ধরে ফেলে। তখন মেঝে চড়াৎ করে ফেটে যায় এবং হারগিলা তাকে টেনে নিয়ে যায় ফাটলের মধ্যে। বানোয়ারি আর পালাতে পারল না। সাতদিন পর পুলিশ তার মৃতদেহ উদ্ধার করে। গল্পটি ভৌতিক হলেও এখানে সমাজের অন্যায়কারীদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং অন্যায়কারীর কখনোই মুক্তি নেই– লেখক একথা বুঝাতে চেয়েছেন। পালানো যায় না গল্প প্রসঙ্গে সুভদ্র কুমার সেন বলেছেন– "বাংলা সাহিত্যেই নয়, সব দেশের সাহিত্যের সেরা ভূতের গল্পের একটি হল, 'পালানা যায় না'।"[১১] আসলেই গল্পটি ভীষণভাবে ভীত রসে সংমিশ্রিত। তবে এখানে লেখক কিন্তু অন্যায়কারীকেই শাস্তি দিয়েছেন। 'শেষ কিস্তি' গল্পটিও আগে আলোচনা করেছি– সেখানেও সুদখোর বৃদ্ধ জগৎ সেনের আট বছরের ছেলে বৃদ্ধের মত গলায় খন খন করে বলেছে, "আমি জোচ্চরের বাড়ি থাকি না। শিগগির ফিস দিয়ে দাও এদের।" (১খ, ৫০৯পৃ.) জগৎ বাবু সবার টাকা দিলেন, ছেলেটি তৃপ্তিতে চোখ বুঝল। এখানেও অতি লৌকিকতার মাঝে শোষক জগৎ সেনের ছেলের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার শাস্তি হল। অন্যায়কারীকে বনফুল কখনোই প্রশ্রয় দেন।

বাস্তবজীবন ও বহুবিচিত্র দিক

বনফুল তাঁর সাহিত্য কর্মে বিশেষ করে ছোটগল্পে বাস্তব জীবনের এত বিচিত্র বহুমুখী দিকে বিচরণ করেছেন যে তার সবগল্পগুলোকে কোন গণ্ডীর মধ্যে বাধা কষ্টকর। "তাঁর

Dhaka University Institutional Repository
সৃষ্টিতে বিস্ময়ের দিকটি সার্থক ব্যাখ্যাত হয়েছে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার দৃষ্টিতে–

> "বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তুর সমাবেশ বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ণ মননশীলতা ও নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানব-চরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে। বস্তুত বনফুলের রচনায় মুগ্ধতার উপকরণ যতটুকু তার অনেকটাই ঐ অনির্মোচনীয় বিস্ময়-চমকে গড়া।"[১২]

আসলেই বনফুলের গল্পে জীবনের বৈচিত্র্য এবং বাস্তবের বহুমুখী সমাহার। "শিল্পরীতি ও রূপকর্মের দিক দিয়ে পুনরাবৃত্তি তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও নেই। যুগান্তকারী প্রতিভার পক্ষেও এ শক্তি দুর্লভ। বস্তুত বিচিত্র কারুশিল্পী হিসাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বনফুলের কীর্তি অতুলনীয়।"[১৩] এবারে আমরা বনফুলের সমাজ বাস্তবতা নিয়ে লেখা বিচিত্র দিকের বৈচিত্র্যময় গল্পগুলো আলোচনা করব।

বনফুলের গল্পে বাস্তব জীবনের বহু বিচিত্র দিকের সমাহার ঘটেছে। 'ফুল ও মানুষ' গল্পে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। সে ইচ্ছে করলে নিজেকে নতুন সাজে এবং আঙ্গিকে সাজাতে পারে। কিন্তু ফুল ফুলই থাকে। ইচ্ছে করলে রজনীগন্ধা পদ্ম হতে পারে না। গল্পে ভ্রোমর রজনীগন্ধাকে বলেছিল– 'তোমার সবই সুন্দর কিন্তু পাপড়ি যদি কমলের মত গোলাপী হত, তবে তুমি হতে অতুলনীয়া।' রজনীগন্ধার চেয়ে কমলের রঙ ভ্রোমরের বেশি ভাল লেগেছে। রজনীগন্ধা বলল, চেষ্টা করবে গোলাপী হতে। আর এদিকে বিকাশ আলোকে বলেছিল– "তুমি কিন্তু বড্ড সেকেলে, নয়?"(২খ, ২৬২পৃ.) সে বলল– "আমি যা, আমি তাই।" (২খ, ২৬২পৃ.) তখন বিকাশ বলল, ইচ্ছে করলে আলো, তনিমার মত স্মার্ট হতে পারে শুধু প্র্যাকটিস দরকার। তখন আলো বলেছিল, "পারলে তুমি খুশি হবে।" (২খ, ২৬২পৃ.) আলো পেরেছিল– সে নামজাদা খেলোয়াড়, নায়িকা, বক্তা, এখন পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হয়। তাকে ঘিরে বাহবা দিচ্ছে মুগ্ধ জনতা। বিকাশের সাথে আলোর বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু আজ আলো শুধু বিকাশের একার নয়, সবার। বিকাশের মনে হচ্ছে যে আলোকে সে ভালবেসেছিল সে আলো নিভে গেছে, বদলে গেছে, হারিয়ে গেছে। এখানে বিকাশ তার ভালবাসার মানুষটিকে অন্যের সাথে তুলনা করতে গিয়ে পেয়েও পুরোপুরি পায় নি। আজ আলো তার সময়কে শুধু বিকাশের জন্যই ব্যয় করে না। গল্পে একটা জিনিস মুখ্য হয়ে ধরা দিয়েছে। মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে। 'ঢেউ' গল্পে দেখতে পাই যার মাঝে সত্য-শিব-সুন্দর একই সাথে এই তিনটি জিনিস বিরাজমান সে জীবনে একদিন না একদিন বড় হবেই। খোকন খুব দুঃখী ছেলে। মা-বাবা বহুকাল আগেই মারা গেছে। পিসীর কাছে থাকে। পিসীর ফাইফরমাশ খাটতে খাটতে দিন যায়। একরাতে খোকনের ঘুম আসছিল না। সে ভাবল বাসনগুলো ধুয়ে রাখা যাক, কলতলায় গিয়ে জলের কল ঘোরাতে একটি ছোট মুণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

বেরিয়ে এল। খোকন বলল, তুমি কে? সে বলল, 'আমি পরি, আমার নাম ঢেউ। সেই ঢেউ খোকনকে তিনটে মুক্তা হাতে দিয়ে বলল, খুব জোরে চেপে ধরতে। কারণ এরা সাধারণ মুক্তা নয়। এর একটি সত্য, একটি-শিব, একটি সুন্দর। জোরে চেপে ধরলে খোকনের মুঠোর মধ্যে মিলিয়ে যাবে, প্রবেশ করবে দেহে। মনে, কল্পনায়। এরপর অনেকদিন কেটে গেছে– খোকন অনেক বড়লোক হয়েছে। আর অসামান্য প্রতিভাবলে অসাধারণ চরিত্র মাধুর্যে উজ্জ্বল করেছে দেশের মুখ। তার নাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সে আজ দেশের গৌরব। হতে পারে খোকন ছোট বেলায় স্বপ্ন দেখে নিজেকে তৈরি করেছে। কিন্তু খোকন তা অস্বীকার করে, সে বলে সে ঘটনা সত্যি। একদিন সে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে, মনে হল প্রতিটি ঢেউ তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। তার দেহে মনে কল্পনায় সত্য, শিব ও সুন্দরের ঢেউ বহমান। লেখক এখানে বলতে চেয়েছেন এই তিনটি গুণ যার মধ্যে বহমান সে বড় হবেই। 'খোকনের প্রথম ছবি' গল্পটিতে লেখক একটা নিগূঢ় সত্য উপস্থাপন করেছেন– আমরা আসলে অনুকরণ প্রিয়, অন্যের জিনিস নকল করতেই আমরা ভালবাসি। গল্পে ছোট খোকন বেশ ভাল ছবি আঁকে কিন্তু তাঁর বাবার বন্ধু এসে বলল– 'তোমার নিজের আঁকা ছবি কই?" (৩খ, ৭২পৃ.) সবই তো নকল করা ছবি। খোকন অবাক হয়ে গেল। এত তার নিজের আঁকা। তখন চিত্রকর তাকে বুঝিয়ে দিল– সে কোন কোন জিনিস দেখে এগুলো এঁকেছে। কিন্তু নিজের কল্পনা দিয়ে আঁকা নয়। সুতরাং এগুলো তাঁর নিজস্ব কিছু নয়। তাকে নিজের কল্পনা দিয়ে কিছু তৈরি করতে হবে। একদিন খোকন চোখ বুঝে রইল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না। সে অন্ধকারের ছবি আঁকলো– ড্রইং খাতা কালো রঙে ভরে গেল। সে এক দৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকিয়েছিল– এ কেমন ছবি হল? হঠাৎ তাঁর ছবির মধ্যে একটা মুখ দেখতে পেল– তার চোখও আছে। অদ্ভুত হাসি সে চোখে। নিজের সৃষ্টির দিকে চেয়ে রইল খোকন। আমাদেরও উচিত নিজস্ব স্বকীয়তা গড়ে তোলা। 'খোশামোদ' গল্পটিতে লেখক খোশামোদ বা তোয়াজ নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও কাজটা নিম্নমানের। কিন্তু সমাজে চলতে হলে খোশামোদের প্রয়োজন আছে। খোশামোদ বা তোয়াজ ছাড়া মানুষের কাছ থেকে কিছু আদায় করা কঠিন। সুতরাং কারও কাছ থেকে কিছু পেতে হলে তাকেও কিছু দিতে হয়। লেখকের এখন চোখ দুটির তোশামোদ করা প্রয়োজন। তার জন্য দরকার গরম পানির স্যাঁক, আর এজন্য দরকার ভৃত্য ভুতোকে। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল ভুতোকে বলা সত্ত্বেও এখন গরম পানি এল না। এখন ভুতোকেও খোশামোদ করা প্রয়োজন। বেতনভুক্ত ভৃত্য বেতনে যে কাজ করবে তার চেয়ে তোশামোদে কাজ করবে আন্তরিকভাবে। আর খোশামোদের মূল কারণ হচ্ছে গতকাল বন্ধু ত্রিপুরাচরণ এসেছিল। সে মুসোলিনীভক্ত। তাকে খোশামোদ করে লেখক সুখ পান নি। ত্রিপুরাচরণ যাওয়ার পর পীতাম্বর খুড়ো এসে হাজির, হাতে নিমন্ত্রণ পত্র। পাড়ার বীণাপাণি-মিলন-মন্দির আজ থিয়েটার করবে। লেখক যেন অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository
সেখানে উপস্থিত থাকে। সন্ধ্যায় থিয়েটারে যাওয়া হল। সেখানে সবাই বেশ সাদর সম্ভাষণ জানাল। থিয়েটার শুরু হলে সবাই চোখের জলে ভাসছে। লেখকের বড্ড হাসি পাচ্ছে। কি করা সবাই তার দিকে আড় চোখে চাচ্ছে। এমন সময় বিপদ তারণ মধুসূদন মাথায় একটা বুদ্ধি দিলেন। পকেট থেকে নস্যি বের করে চোখে লাগালেন। এবং সবার সাথে অঝরে কাঁদলেন। চোখ জ্বালা করলে কেঁদে সুখ ছিল। কারণ সকলে লেখকের অশ্রুবিসর্জন ব্যাপার তাঁর 'সাহিত্য' লাভ করে সন্তুষ্ট হলেন। এখন দরকার চোখের তোয়াজ। সেজন্য ভুতোর তোয়াজ প্রয়োজন। তাই লেখক ভুতোকে বললেন, নীল স্যাকরাকে খবর দে তোর বউকে নতুন পেঁচে গড়ে দেব। ভুতো বলল, এখন সময় নেই। কিন্তু সে পরম যত্ন করে লেখকের চোখে সেঁক দিতে লাগল। আমরা যত বলি না কেন খোশামোদ ভাল নয়, কিন্তু জীবনে চলার পথে এঁকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। 'স্থূল-সূক্ষ্ম' গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই, আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে সবসময় সঠিক জিনিস দেখি না। যা দেখি তা অনেক সময় ভুল দেখি। এর জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন। আবার অনেক সময় সূক্ষ্ম বিচারের মাধ্যমেও ভুল জিনিস নির্ণয় হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা রেকর্ড প্লেয়ারে শুনে কেউ রবীন্দ্রনাথকে প্রণামও করে না শ্রদ্ধাও জানায় না। কিন্তু সশরীরে রবি-ঠাকুর সম্মুখে দেখা দিলে অবশ্য শ্রদ্ধায় শির নত হয়। আর রবি-ঠাকুরের অবর্তমানে কেউ যদি রেকর্ডের কবিতা শুনে মুগ্ধচিত্তে ভাবের মাঝে হারিয়ে যায় তাকে কিন্তু শ্রদ্ধা জানাতে ইচ্ছে হয়। লেখকের বাড়িতে হঠাৎ করে এক আগন্তুকের আবির্ভাব, তাকে রবি-ঠাকুরের কবিতা শোনার কথা বলতে মুচকি হেসেছিলেন। এবং খুব মন দিয়ে অনুধাবন করছিলেন। দেখে লেখক বিগলিত হয়ে তৃতীয় বারের মতো কবিতাটির রেকর্ড বাজাবেন ভাবছেন। এমন সময় লেখকের বন্ধু এসে বললেন, আগে কাজের কথা হোক কবিতা পরে হবে। লেখক বললেন, লোকটি কত বড় সমজদার ব্যক্তি। তখন বন্ধু প্রাণকান্ত বললেন 'ও যে বদ্ধ কালা'। এখান থেকে বোঝা যায়, আমরা যা দেখি ঠিক নয়। লেখক তার সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়েও সঠিক বিষয় নির্ণয় করতে পারেন নি। এমন সূক্ষ্ম বিচার কোন কাজেই আসে না। যা কিন্তু ভক্তকে ভণ্ড করে দেয়। 'শিশু' গল্পে দেখি পৃথিবীতে সব মানুষই শিশুকে ভালবাসে। আপন দৌহিত্রকে তো কথাই নেই। তার সহস্র জ্বালাতনও যেন মধুময় হয়ে ওঠে। শিশুদের আছে এক আশ্চর্য আকর্ষণ শক্তি। এজন্য সে অসহায় হওয়া সত্ত্বেও কেউ তাকে দূরে সরিয়ে দেয় না। লেখক শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছেন শিশুকে এত ভাল লাগে কেন? নিরপেক্ষভাবে বিচার করে যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলতে বাধ্য যে, শিশু মাত্রেই বর্বর– অমার্জিত, অসভ্য, নগ্ন, পশু। আমরা অমার্জিত অসভ্য নগ্ন পশু প্রকৃতির প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে তো সহ্য করি না। অথচ শিশুর মধ্যে সেই বর্বরতাই আমাদিগকে আনন্দ দান করে। রাতে লেখক ঘরের কপাট খুলে রেখেছেন দস্যি নাতিটার মাকে লুকিয়ে আসার কথা। রাত্রে টের পেলেন কে যেন পাশে চুপ করে শুয়ে আছে। ভাবলেন নাতিটি মায়ের ভয়ে কথা বলছে না। সকাল বেলা

Dhaka University Institutional Repository
ঘুম থেকে তুলতে গিয়ে হাতে খড়ম নিতে হল। লোম-ওঠা-এক কুকুর রাতে দরজা খোলা পেয়ে বিছানায় উঠে পড়েছে। কুকুরটাকে বেশ জোরে মারা হলে সে বাইরে গিয়ে একটানা অসহায় আর্ত ক্রন্দন করেই চলছে। তখন লেখক রাতের থিয়েটারটাকে ব্যঙ্গ করলেন। অসহায় বলেই শিশুকে ভাল লাগে কথাটা ঠিক নয়। নারী ও শিশুর মধ্যে আছে এক স্বতস্ফুর্ত অদম্য প্রাণশক্তি, যাকে রোধ করবার ক্ষমতা পুরুষের নেই। সুতরাং শিশু ও নারী অসহায় নয়। অসহায় হল পুরুষ। তাইতো শিশু ও নারীর নানা উপদ্রবের মধ্যে সৌন্দর্য, লীলা আবিষ্কার করে পুরুষেরা অজ্ঞাতসারে নিজেদের অক্ষমতা জনিত লজ্জাকে চাপা দিয়া জ্ঞাতসারে পুলকিত হয়। লোম ওঠা কুকুরকে খড়ম মেরে তাড়ানো যায়। কিন্তু শিশু বিশেষ করে দৌহিত্র এবং প্রেয়সীকে সহজে বিদায় করা সম্ভব নয়।

'বাজে খরচ' গল্পটিতে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন আসলে বাহ্যিক দিক থেকে যাকে আমরা বাজে খরচ বলি, আসলে তা মোটেই বাজে খরচ নয়। সময়ের প্রয়োজনে জীবনের তাগিদে এ বাজে খরচ সঞ্জিবনীর কাজ করে। গল্পটিতে বৃদ্ধ দাদু তার নাতির বাজে খরচের বহর দেখে চিন্তিত। তিনি কিন্তু যৌবনকালে বাজে খরচ করেছেন। তার বড় প্রমাণ প্রতি বছর তিনি লক্ষ্মৌ শহরে লোক পাঠাতেন খরমুজা আনবার জন্য। আবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের আবদারে একটা টাট্টু ঘোড়াও কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার মাসিক আয় একশতের উপর ছিল না– আজ ছেলের সিনেমা দেখা, উপন্যাস কেনা এবং মধুপুরে বেড়ানোকে বাজে খরচ মনে হচ্ছে। নাতির দামী সিগেরেট কেসে বিদেশী সিগেরেটকেও বাজে খরচ মনে হচ্ছে। এর বদলে ঘরের সংস্কারটা বেশি প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে। এতসব চিন্তা যখন মনে তখন বাগানের মালী এসে বলল বাগানে চারা গাছটাকে সরিয়ে পুঁততে হবে। কাছে গিয়ে দেখা গেল বৃদ্ধ আম গাছের নিচে চারা গাছটি ম্লান। বসন্ত সমাগমে বৃদ্ধ গাছটি নবপল্লবে মুকুলে যতটা অলঙ্কৃত হয়েছে। চারাগাছটি তত পারে নি। বৃদ্ধের আওতায় পড়ে কিশোর চারাগাছ মধুমাসেও ম্রিয়মাণ। এ দৃশ্য দেখে দাদুর জ্ঞান চক্ষু খুলে গেল– আসলে সবাই সবার স্থানে অটল থাকতে চায়। এ যেন এক যুদ্ধ ক্ষেত্র। সবাই সবার প্রতিদ্বন্দ্বী। যুগের সাথে মিল রেখে চাহিদার পরিবর্তন ঘটেছে। তাই বাজে খরচগুলোও দিক পাল্টিয়েছে। মনে হচ্ছে এ বাজে খরচ নয়। একদিন বড় সাহেবকে খরমুজা খাওয়ানের জন্য ছেলের বড় চাকরি হয়েছিল। নিজে নানা লোককে খাইয়েছেন বলে সবাই তাকে ভালবাসে। আর ছেলের মধুপুরে বেড়ানো আর নাতির দামী সিগারেটের পিছেও হয়তো বড় কিছু লুকিয়ে আছে। সুতরাং কিছুই বাজে খরচ নয়। এ খরচগুলো মনের খোরাক মাত্র। 'অঙ্কের বাইরে' গল্পে দেখা যায় পশুর প্রতি মানুষের ভালবাসা। এবং পশুও মানুষের মত ভালবাসাকে বুঝতে পারে। গল্পকথকের একটা গরু ছিল, নাম মঙ্গলা। তার বয়স যখন দু মাস তখন তার মা চন্দন মারা যায়। সবাই মঙ্গলাকে বেচে দিতে বলে। কারণ এর পিছনে অনেক খরচ। গল্পকথক মঙ্গলার কাছে যেতে গরুটি তার হাত চেটে দিল। এবং গলা বাড়িয়ে দিল আদর নেবার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গলাকে আর বেচা হল না। তিন বছরের মাথায় সে মাতৃত্ব অর্জন করল। তখন তার প্রতি যত্ন বেড়ে গেল– খাবারও বাড়িয়ে দেয়া হল। মঙ্গলা এক বছর ধরে একটানা দুধ দিল। পাঁচ সের করে। কিন্তু গরু যত ভালই হোক বরাবর দুধ দেয় না। তখন গৃহিণী বলল খাবার খরচ কমিয়ে দিতে। তাই হল। তবে মঙ্গলাকে রোজ সন্ধ্যায় এক বোঝা সবুজ খাস এনে দেয়া হত। এখন দুধ কিনে খেতে হচ্ছে। একদিন গল্পকথক ভুলে গেলেন ঘাস আনতে। মঙ্গলা তাঁর গাড়ির শব্দ পেলেই এগিয়ে আসে। তখনো এল। কাল ঘাস এনে দেব বলাতে সে ফোঁস করে আওয়াজ করে দাঁড়িয়ে রইল। পরে মটর ঘুরিয়ে মাইল খানেক পথ পেরিয়ে ঘাস এনে দিলেন। ঘাস পেয়ে মঙ্গলা মহা খুশি। এবার গরুটি স্নিগ্ধ সুন্দর চোখের দৃষ্টি দিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তার মধ্যে দিয়ে মঙ্গলা গল্পকথককে দুধের চেয়ে অনেক দামী জিনিস দিল, সে যেন অমৃত। এখানে লেখক পশুর প্রতি মানুষের ভালবাসাকে তুলে ধরেছেন। 'গণেশ জননী' গল্পটিতে লেখক মানব মনের বিচিত্র দিক তুলে ধরেছেন। একটি হাতির প্রতি কি নিঃস্বার্থ ভালবাসা তা গল্পটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়িতে হাতি পোষা এক বিরল ঘটনা। কোন এক ব্যবসায়ী তাকে হাতির একটি বাচ্চা উপহার দেন। নিঃসন্তান ভদ্রলোক ও তার স্ত্রীর হাতির বাচ্চাটি পছন্দ হল। এরপর থেকে গণেশকে তারা পুষছে। একশ বিঘা জমিতে যা আয় তা সবই হাতির পিছনে যায়। হাতিটিও এমন পোষ মেনেছে, তাদের সব কথা বোঝে। তাই অভিমানও বেশি। একটু বকাঝকা করলে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। বাড়ির কর্তার ভক্ত বেশি– স্নানের সময় তার বালতি গামছা শুঁড়ে করে বহন করে। রান্নার সময় শুঁড়ে পাখা ধরে বাতাস করে। তাদের ঘর এখন হাতির ঘর। হাতিটি ছত্রিশ ঘণ্টা কিছু খাচ্ছে না, তাই ডাক্তারকে খবর দিলেন। কিন্তু কোন রোগ নয়, শুধু অভিমান। ঘরের সব ল্যাংড়া আম খেয়েছে বলে গৃহকর্তা বকেছিল। কিন্তু গিন্নী মা এতো সাধনা করছে, কান্নাকাটি করেছে হাতি খাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত গিন্নী মা নিজের গহনা বন্দক রেখে ডাক্তারের ফিস যুগিয়েছেন, হাতির জন্য। ডাক্তার বাবু অবশ্য তাদের এই ভালবাসা দেখে ফিস নেন নি। এখানে লেখক নিঃসন্তান পরিবারের সন্তান এই হাতির প্রতি ভালবাসা অপূর্ব সার্থকতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'বিদ্যাসাগর' গল্পে লেখক পূর্ব জন্ম নিয়ে রসিকতা করেছেন। ভণ্ড সাধুদের মন্ত্রতন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। গল্পটিতে এক মাস্টার মশায় তাঁর ছাত্র পড়ানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু ছাত্রের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। বিদ্যাসাগরের 'উপক্রমণিকা' এত পড়াচ্ছেন তারপর ভুল উত্তর দিচ্ছে। একদিন মাস্টার মশায় স্বামী চিন্ময়ানন্দের সাক্ষাৎলাভে জানতে পারলেন কিভাবে পূর্বজন্ম সম্পর্কে জানা যায়। এই পরীক্ষাটি মাস্টার মশায় তার ছাত্রের উপর প্রয়োগ করতে চান। কারণ তাঁর ধারণা ছাত্রটি পূর্বজন্মে গাধা, না হয় গরু ছিল। সেদিন নিশীতে স্বামিজীর প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে

Dhaka University Institutional Repository
যোগাসনে উপবেশন করে মুদিত নেত্রের সম্মুখে রুদ্ধশ্বাসে তার ছাত্রের পূর্বজন্মের মূর্তি নিরীক্ষণ করে চমকে উঠেন। এ যে বিদ্যাসাগর। স্বয়ং 'উপক্রমণিকা'র স্রষ্টা; জন্মান্তর রহস্যের ফেরে পড়ে 'নর' শব্দের রূপ বলতে পারছে না। 'সাঁতারের পোষাক' গল্পে হাসির মধ্যে দিয়ে সমাজের নানা রূপের মানুষের চরিত্র ফুটে উঠেছে। গল্পটি বিখ্যাত সাঁতারু দুলাল চাঁদের কাহিনী। তিনি মেডিকেলের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু হুজুগে মেতে সাঁতারের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। সাঁতার ক্লাবের সদস্য হতে হলে সুইমিং কস্ট্যুমের প্রয়োজন। বড় একটা বিদেশী দোকানে বন্ধু নগেনকে নিয়ে কস্ট্যুম কিনতে সেখানে কস্ট্যুম দেখাচ্ছিল অপরূপ সুন্দরী তরুণী কিন্তু একটাও পছন্দ হচ্ছিল না। অনেক দেখার পর যখন পছন্দ হল কিন্তু তার দাম পাঁচ টাকা চৌদ্দ আনা। হাতে টাকা নেই। তারা মেয়েটিকে বললেন– কাইন্ডলি এটা আলাদা করে রেখে দিন। এখনি এসে নিয়ে যাব আমরা। এই বলে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন চাপরাশি গোছের একটি লোক এসে বলল বড় সাহেব ডাকছেন। গিয়ে দেখেন দোকানের মালিক মেয়েটিকে ডেকে বলল– চৌদ্দ আনা আমি পকেট থেকে দিয়ে দিচ্ছি। ওদের কস্ট্যুমটা দিয়ে ক্যাশ মেমো দিয়ে দিন। আর বলল খেলা টেলা দেখতে এদিকে এলে পয়সাটা দিয়ে যাবেন। দুলাল চাঁদের সাঁতারের জগতে প্রবেশের দ্বারটা এমনি ছিল। এরপর তিনি আর পড়াশুনায় গেলেন না, সাঁতারু হলেন, সাঁতারু মেয়ে বিয়ে করলেন। একদিন মফস্বলে এক প্রতিযোগিতায় যাবেন, কিন্তু ট্রেনে তার সুটকেস চুরি হয়ে যাওয়ায় পড়লেন বিপাকে। কস্ট্যুম ছিল সুটকেসে। কি করা ওখানকার দোকানে কিছুক্ষণ কস্ট্যুম খুঁজে হতাশ হলেন। ওখানকার বড় দোকান ভবতারণ ভাণ্ডার। সেখানের মালিক বললেন কাগজে টাইট গেঞ্জি-প্যান্ট পরা ছোকরা ছুকরিদের ছবিতে দেখি বটে মাঝে মাঝে। না মশাই ওসব জিনিস এখানে পাবেন না। একজন বলল আজ বিখ্যাত সাতারু দুলাল চাঁদ আসছেন। তখন দুলাল তার পরিচয় বলল। তখন মালিক বলল আচ্ছা দাঁড়ান– তিনি গফুর নামের এক দর্জিকে ডেকে মাপ নিলেন এবং বললেন চারটা নাগাদ পেয়ে যাবেন। ভদ্রলোক ছাতার কাপড় দিয়ে কস্ট্যুম তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। সাঁতার শোয়ে গায়ের রং কালো হয়ে গিয়েছিল। দাম দিতে চাইলে নেন নি। বললেন– ওটা আপনাকে প্রেজেন্ট করলাম। গরিবের স্মৃতিচিহ্ন থাক আপনার কাছে। স্বদেশী এবং বিদেশী দোকানের লোকের সাঁতারুর প্রতি ভালবাসার গল্প। আরও আছে একবার অজ পাড়াগাঁয়ে বেড়াতে যায়। সেখানের ছেলেরা ধরল সাঁতার দিতে হবে তাদের সাথে কিন্তু কস্ট্যুম নেই। তারা বলল তাদের এক বেংকট বাবা আছে। তার কাছে চাইলে সব পাওয়া যায়। যাওয়া হল– তিনি বললেন "সাঁতার কাটার জন্য পোষাকের দরকার হয় না। সমস্ত ত্যাগ করে ভবসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়লে পার মিলবে না। উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ বাবা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে শেখ। পোষাক নিয়ে কী হবে।" (৩খ, ২৮৩পৃ.) যদিও হাসির মধ্যে দিয়ে একজন সাঁতারুর প্রতি সাধারণ মানুষের ভালবাসাকে তুলে ধরেছেন। আর শেষ

Dhaka University Institutional Repository
কথাটা হাস্যকর হলেও সত্য, সমস্ত ত্যাগ করে ভবসাগরে ঝাঁপিয়ে না পড়লে পার মিলবে না। এখানে একটা বড় দর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। 'আজবলাল' গল্পে দেখতে পাই, অনেক সময় মানুষের জীবনটাই যেন নাটক-থিয়েটার হয়ে যায়। এ গল্পের আজবলাল মতিলালের ছেলে। মতিলাল ছেলের নাম আজবলাল রাখে যাতে চাকরিতে সুবিধা হয়। কিন্তু ছেলের পড়ায় মন বসল না। সে ফাইভের উপরে উঠতে পারল না। তার মন গেল থিয়েটারের দিকে। শুধু থিয়েটার নয় অন্য গৃহস্থালী কর্মেও সে সুনিপুণ। সুরথ বাবুর বাড়িতে সে উঠল, সুরথ পত্নীও তাকে খুব যত্ন করে রেখেছেন। আজবলাল তাঁদের সব কথায় ফোড়ন দেয়, রাজনীতি, সাহিত্য সব বিষয়ে। আজবলাল বিশেষ করে মুরগির মাংস খেতে খুব ভালবাসে। সুরথ বাবু মাঝে মাঝে মুর্গি কিনিতেন। আজবলাল সেগুলো নিজে কেটেকুটে রান্না করত। একদিন সুরথ বাবুর উপর ভার পড়ল উকিল সমিতির বার্ষিক অধিবেশনের। তিন দিন ধরে অধিবেশন। সুতরাং প্রচুর মুর্গি কেনা হল। রান্নার ভার আজবলালের উপর, খুব খুশি। কিন্তু এমন সময় চিঠি এল তার বাবা বাস এক্সিডেন্টে মারা গেছে। সুরথ তাকে যেতে দিল, বলল এ কাজ শেষ করে যেতে। সে রান্না করল। কিন্তু খাওয়ার ইচেছ সত্ত্বেও খেল না। সুরথ বাবু আজবলালের জন্য আলাদা রান্না করল। তিন দিনপর কাজ শেষে যখন আজব চাকরকে দিয়ে থালা বাসন পরিষ্কার করাচ্ছেন এমন সময় মতিলাল হাজির। বলল তোকে লক্ষী খবর দিয়েছে আমি মরে গেছি। তাই নিজে এলাম দেখা করতে। ওরা তোকে দিয়ে থিয়েটারের পার্ট করানোর জন্য এমন চিঠি লিখেছে। তখন আজবলাল বলল, "এলেই যদি দুদিন আগে আসতে পারলে না।" (৪খ, ৩৩১পৃ.) সে এত করে লোভ সামলাল তা সব বিফল। আসলে জীবনটাই অনেক সময় নাটক হয়ে যায়। 'রঙের খেলা' গল্পে লেখক মানুষের জীবনের এক একটা অধ্যায়কে এক একটা রঙের সাথে তুলনা করেছেন। সত্যিই মানুষের জীবনে নানা রঙের সমাহার। প্রথম দর্শনে কাউকে ভাললাগার রঙ আবির রাঙা, যেন পলাশ, অশোক, কৃষ্ণচূড়া রং ছড়ানো। তাকে দ্বিতীয়বার দেখতে পাওয়া যেন আশাবরীর সুর। তার মাঝে কমলা রঙের ঝর্না ঝরছে। প্রিয় মানুষের প্রথম চিঠির রং সোনালি। দ্বিতীয় চিঠি সবুজ– এ যেন জীবন্ত প্রাণের বাণী। কিন্তু যখন জানা গেল চিঠি তার নয়, পাশের বাড়ির মেয়ের। নাম এক হওয়ায় পিয়ন ভুল করে দিয়ে গেছে। বেদনায় তখন সব নীল হয়ে যায়। যখন দেখা যায় ভাল লাগার মানুষটি পাশের বাড়ির মেয়ে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে। তখন নীল গাঢ় থেকে গাঢ় হচ্ছে। যখন তাদের বিয়ের কার্ড এল তখন নীলের সাথে তুষানল মিলে বেগুনি রঙ ধারণ করল। এবং সব কালো। রঙগুলো মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে ছড়িয়ে এবং জড়িয়ে আছে। লেখক সুন্দরভাবে তা তুলে ধরেছেন। 'আর একটা কথা' গল্পে লেখক জীবনের চরম সত্যকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। গল্পে যদিও একটি ফুলের ফুটে ঝরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। মানুষকে তেমনি একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। একটি ফুল অপরূপ শোভা নিয়ে সকাল

Dhaka University Institutional Repository

বেলা পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকাল, তখন আগের দিনের ফোটা বিবর্ণ ফুলটি বলল– যাচ্ছ কোথায় জান, সে বলল– জানি না। তখন বিবর্ণ ফুল বলল– তাকে দেখে আন্দাজ করতে। নতুন ফুল বলল– তোমার বেশ মলিন, কিন্তু মুখের হাসি কিন্তু কমে নি। বিবর্ণ ফুল বলল–মরণের ছায়া নেমেছে তার সর্বাঙ্গে। কাল সে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। নতুনেরও সেই পরিণাম হবে। সদ্য ফোটা ফুল শঙ্কিত হল। কিন্তু পরদিন সে বিবর্ণ হল ঠিকই, কিন্তু নতুন একটি ফোটা ফুলকে বলল– ভয় পেও না। পূর্বাকাশে অপরূপ সাজে মরণ আছে। (৪খ, ৩৬৭পৃ.) কিন্তু মরণ ও ঝরে যাওয়ার মধ্যে নব যাত্রার শুরু। মানুষের জীবনটাও ফুলের মত। জন্মগ্রহণ করলে তাকে মরতে হবেই। প্রবীণের মৃত্যু মানে নবীনকে স্থান করে দেয়া। 'মতিভ্রম' গল্পে আমরা এক কবির বিড়ম্বনার চিত্র দেখতে পাই। উদীয়মান কবি বিনয়ভূষণ এককালে সুরকির কলে চাকরি করতেন। তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে বিবাহ করেন। ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন তিনি। নামটা হল 'সুখরঞ্জন সাঁতরা'। নামটা নদনদী পত্রিকার সম্পাদিকাকে মুগ্ধ করল। তার পত্রিকায় ছাপা হল 'সুখরঞ্জন সাঁতরা'র কবিতা। তখন থেকে বিনয়ভূষণ সুখরঞ্জন সাঁতরায় পরিণত হল। কিন্তু একদিন পত্রিকার সম্পাদিকা তাকে লিখলেন, তিনি যেন তার পত্রিকায় লেখা না পাঠান। কারণ এমন অশ্লীলতায় ভরা গ্রাম্য গদ্য তাঁর কাগজে ছাপানো সম্ভব না। ওদিকে স্ত্রী ভাবছে বিনয়ভূষণ পাগল হয়েছে। এমন ধরনের চিঠি সে কখনো লেখে নি। পরে বোঝা গেল তার খাম বদল হয়ে গেছে। আধুনিক কবিতা গেছে স্ত্রীর কাছে। স্ত্রী জানত না তার স্বামী একজন কবি। আর স্ত্রীর পত্র গিয়েছে নদনদীর সম্পাদিকার কাছে। বিনয়ভূষণের মতিভ্রমের জন্য আজ তিনি কি বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছেন। এরকম ঘটনা আমাদের বাস্তবজীবনে অকল্পনীয় নয়।

'জনবুল' গল্পটিতে বাঙালিদের নেশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গল্পে আমরা দুটি চরিত্র দেখতে পাই। একজন বিপিন মল্লিক কলকাতার লোক, আর জনবুল থাকেন বিলেতে। দুজনের মিল এক জাগায়। দুজনই পাটের ব্যবসা করেন। জনবুলের হঠাৎ করে শখ হল বাংলাদেশটা বেড়িয়ে আসা যাক। যথা সময়ে এসে হাজির হলেন। মিস্টার স্টিফেন ও বিপিন মল্লিক স্টিমার ঘাটে আনতে গেলেন। প্রথমে মনে ভয় ছিল কেমন মানুষ হন, কথা বুঝতে পারবেন কি? পরে দেখলেন চমৎকার মানুষ। কথাও পরিষ্কার, বুঝতে সমস্যা নেই। জনবুলকে কলকাতা ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। ধর্মতলায় এসে জনবুল কিছু পানের দোকান দেখে জিজ্ঞেস করলেন এগুলো কি? তখন মল্লিক বলল পানের দোকান। আপনি খাবেন? ট্যাক্সি থামিয়ে দুটো পান কিনে এনে দিলেন জন সাহেবকে। দুটো পানই একসাথে খেতে বললেন। সাহেব পান চিবুচ্ছেন এবং কস বেয়ে পানের ধারা গড়াতে লাগল। সাহেব রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। মুছে রুমালের দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন। এবং রক্ত ভেবে ভয় পেলেন। ফিরে এলেন হোটেল। মল্লিক ধরে রুমে নিলেন। ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন। ডাক্তার নিয়ে এসে দেখে জনবুল মদ খাচ্ছেন। এবং

Dhaka University Institutional Repository

মল্লিককে বলল এখন সে সুস্থ। ডাক্তার চলে গেল। তখন জনবুল বলল এবার বুঝেছি, আমাদের মত মদ খাওয়ার নিয়ম নয় তোমাদের। আমি ভাবলাম তোমরা কিসের জোরে এত খাটছো। এবার বুঝলাম জনবুলের মত পাড় মাতালও যা খেয়ে ঘায়েল হয়ে যায়। আর তা বাঙালিরা অনবরত চিবুচ্ছে। তাহলে বাঙালিরাও কম নেশাখোর নয়। 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' গল্পটিতে লেখক খুব হালকা কিছু ঘটনা বা কথার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়েছেন– আসলে আমরা উদ্দেশ্যে নিয়ে কাজে নামি। শেষ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য টিকে থাকে না। সময়ের আবর্তে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যায়। এখানে স্কুল পড়ুয়া এক বালক ভুতো ঘর থেকে বেরিয়েছে এক রঙিন প্রজাপতি ধরবে বলে। কিন্তু প্রজাপতির পিছু ছুটতে ছুটতে প্রজাপতি হারিয়ে যায়। সে বুনোলতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভুলে যায় রঙিন প্রজাপতির কথা। এরপর বিড়ালের খেলা দেখা, পথে দেখা গোবিন্দের সাথে। সে একটা সুখবর দেয়– প্রতিপক্ষ দলের ফুটবল প্লেয়ার রামাকে তাদের দলের হাবলু দা– তাকে মাঠে ঘায়েল করেছে। শুধু ঘায়েল করে নি, মাঠে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। সুতরাং হাবলুদাকে তারা খাওয়াবে, ভুতোরও চারআনা দিতে হবে এবং ইলিশ মাছ কেনার দায়িত্ব তার। এরপর তার মোক্ষদা পিসীর জন্য মিছরি কিনতে দুঘণ্টা চলে যায়। এরপর ন্যাপলার সাথে স্টেশনে যায় শাহ নাওয়াজকে দেখতে। দেখতে অবশ্য পায় নি। সারাদিন এভাবে কেটে যায়। পড়ন্ত বিকালে গঙ্গার ধারে ইলিশের আশায় বসে আছে। এখনো মাছের ডিঙ্গিগুলো আসে নি। আকাশে রঙের উৎসবে সে মুগ্ধ। এমন সময় তার হঠাৎ লজ্জা লাগল সকালের কথা মনে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল রঙিন প্রজাপতির আশায়, আর এখন বসে আছে ইলিশের আশায়। সমস্ত দিনে প্রজাপতির কথা মনেও পড়ে নি। আসলে এভাবে মানুষও তার লক্ষ্য থেকে সরে যায়। খুব সাধারণ গল্পের ভিতরে লেখক অসাধারণ বিষয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 'কৃতজ্ঞতা' গল্পের মূল চরিত্র অধর আইচের কাণ্ড কারখানা দেখে পাগলামি মনে হলেও তার মধ্যে যে কৃতজ্ঞতাবোধ এটাই যেন গল্পের মূল কথা। ব্রাহ্মধর্মী অধরের ভাল লেগে যায় খ্রিস্টধর্মের মেয়ে যুথিকা বসুকে। কি করা, বিপুল ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও যুথিকার পাশের ঘরটিতে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু সাহস করে ভালবাসার কথা বলতে পারছিলেন না। দুজনেই দুজনকে পছন্দ করতেন। অনেক ভেবে চিন্তে নীল রঙের কাগজে তার ভালবাসার কথা লিখলেন– কিন্তু লেখা মন মত না হওয়ায় গুলি পাকিয়ে ঘরের কোণে ফেলে দিলেন। পরদিন মনে হল না চিঠিটা লিখে ফেলা যাক। "বিবাহের প্রস্তাব করিব ইহাতে লজ্জা কি আছে।"(৪খ, ১২৩পৃ.) আগের দিন কি লিখেছে তা দেখার জন্য ঘরের কোণে কাগজ খুঁজতে গিয়ে দেখে সেখানে গোলাপী কাগজ। খুলে দেখে যুথিকা তাকে উদ্দেশ্য করেই চিঠি লিখেছে। তাদের চিঠির আদান প্রদান ইঁদুর করে দিয়েছে। মেঘদূতের কাজ করেছে ইঁদুর– তাই অধর এ ইঁদুরের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি সমস্ত দোকানের ইঁদুরের কল কিনে গুদামে ভরেছেন। এবং বলেছেন কেউ যেন আর ইঁদুর না

Dhaka University Institutional Repository

ধরে। শুধু তাই নয়। বন্ধু হরিপ্রসাদকে দুশত টাকা দিয়েছেন গণেশ পূজা করতে। নিজে ব্রাহ্ম এবং যুথি খ্রিস্টান বলে করতে পারছেন না। গল্পটিতে হাসির মধ্যে দিয়ে কৃতজ্ঞতা বোধকে লেখক তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। 'যা হয়' গল্পটি সমাজের বিশেষ করে পরিবারের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে হাস্যকৌতুকের মধ্যে দিয়ে। ঘরের কর্তার প্রতিদিন সকালে অফিসে যাওয়া এক বাস্তব চিত্র। কিন্তু ছোট্ট খোকন অভি যখন তার বাবাকে অনুকরণ করে সাজগোজ করে সে নিজের কাঠের ঘোড়ায় চড়ে বলতে থাকে "হেট হেট, চল, চল, আফিসের লেট হয়ে যায় যে–" (৪খ, ১০২পৃ.) তখন বাড়িতে হাসির রোল পড়ে যায়। কিন্তু একই বিষয় যখন অভির বাবা করেন তখন কারো মধ্যেই কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। অভির বাবা যখন সাজ গোজ করে অকারণে তার মাকে ধমকাতে থাকে এটা দাও, ওটা দাও বলে। তারপর চিৎকার করে চাকরকে বলে গাড়িতে স্টার্ট দিতে। অফিসে লেট হয়ে যাবে আজ দেখছি– এই বলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু কেউ হাসল না। এই গল্পটিতে খুবই সহজ চিত্র কত সুন্দরভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরতে শুধু বনফুলই যেন পারেন। সমাজের একটি বড় বাস্তবতা পরিবার, সেই পরিবারে একটি ছোট শিশুর বাস্তব চিত্র লেখক এখানে সহজ সাবলিল ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন।

পরিশেষে বলতে হয় জীবনকে বহুকৌণিক দৃষ্টিতে হয়তো অনেকেরই দেখা সম্ভব হয় নি। বনফুল তাঁর অনুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দৈনন্দিন সমাজ জীবনের আনাচে কানাচে ধূলিমালিণ্যের তুচ্ছতায় আবৃত বাস্তব জীবন চিত্র অসাধারণভাবে গল্পে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে–

> "বনফুল মানুষের এই জীবনকে তার যথাযথ মূল্যে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। জীবন সম্পর্কে যেমন তাঁর কোনো অতীন্দ্রিয় মোহ ছিল না, তেমনি কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতিও তাঁর অকারণ অনুরক্তি ছিল না। দার্শনিক পরিভাষায় যাকে 'তটস্থদৃষ্টি' বলে, তাঁর দৃষ্টি সেই দৃষ্টি। জীবন সত্যের নিরীক্ষায় কোনো পূর্বধার্য তত্ত্বের অনুশাসন স্বীকার না করে সর্বসংস্কারমুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে বহু পরীক্ষা ও বহু পর্যবেক্ষণের সাহায্যে জীবনকে জানার যে আবেগ, তাঁর ব্যক্তি মানসে সেই আবেগই প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।"[১৪]

এই আবেগ, এই দর্শনের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনচৈতন্য গড়ে উঠেছে, আর তাই দিয়ে তাঁর শিল্পকর্মের প্রকাশ এবং প্রসার ঘটেছে। এবং বাস্তব জীবনের প্রতিটি কোণ তাঁর গল্পে এসে জীবন্তরূপে ধরা দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ :

১। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : বনফুলের ছোটগল্পে সমাজভাবনা; সাহিত্য পত্রিকা (কলকাতা ১৯৯৯) পৃ. ৪৯

২। বনফুলের গল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড) (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৮)
বনফুলের গল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০২)
বনফুলের গল্প সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড) (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪০৫)
বনফুলের গল্প সমগ্র (চতুর্থ খণ্ড) (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৩)
এই গ্রন্থগুলো থেকে উল্লেখিত প্রতিটি উদ্ধৃতির পাশে সংক্ষেপে এই গ্রন্থের খণ্ড ও পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করা হবে।

৩। শ্রীভূদেব চৌধুরী : বনফুলের 'লেখা'র শিল্প : 'লেখক' বনফুল; বনফুল শতবর্ষের আলোয়, সম্পাদক, পবিত্র সরকার (কলকাতা, ১৯৯৯), পৃ. ১২৬

৪। বীতশোক ভট্টাচার্য : বনফুলের একটি গল্প; কথনরীতির বিশ্লেষণ; কোরক (পূর্বোক্ত), পৃ. ৭৩-৭৪

৫। ভবেশ দাশ : 'ভালো' গল্পের বনফুল; কোরক (পূর্বোক্ত) পৃ. ৮৪

৬। জগদীশ ভট্টাচার্য : উন্মেষ পর্বের বনফুল : স্রষ্টা ও সৃষ্টি; বনফুল শতবর্ষের আলোয় (পূর্বোক্ত) পৃ. ১১৮

৭। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : (পূর্বোক্ত) পৃ. ৫৭

৮। অলোক রায় : বনফুলের ছোটগল্পে দেশ কাল; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৯। সরোজমোহন মিত্র : বনফুল: সাহিত্য ও জীবন (কলকাতা ১৯৯৯) পৃ. ভূমিকা

১০। জগদীশ ভট্টাচার্য : বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (পূর্বোক্ত) পৃ. ১৮

১১। সুভদ্রকুমার সেন : বনফুল সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত; বনফুল শতবর্ষের আলোয় (পূর্বোক্ত) পৃ. ১৪৯

১২। শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (কলকাতা, ১৯৬৫) পৃ. ৬৮৪

১৩। জগদীশ ভট্টাচার্য : বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প : (পূর্বোক্ত) পৃ. (ভূমিকা)-৭

১৪। জগদীশ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
উপসংহার

অন্তহীন জীবনজিজ্ঞাসা, বিজ্ঞানমনস্কতা, আধুনিকতা ও বাস্তবচেতনার সুসমন্বয়ে বনফুলের জীবনবোধ ও শিল্পবোধ যেমন সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট তেমনি স্বাতন্ত্র্যও চিহ্নিত। ছোটগল্প সৃষ্টিতে তাঁর সুগভীর সমাজবোধ ও অক্লান্ত জীবনজিজ্ঞাসা আকর্ষণীয়। ঐশ্বর্যে প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে বনফুলের লেখনী অজস্রবর্ষী। জীবনের গবেষণাগারে তাঁর সৃষ্টিকর্মের পরীক্ষণ নিরীক্ষণের শেষ নেই। সাহিত্যের রূপকর্মশালার বাণীলক্ষ্মীর নিত্য নব নব রত্নাভরণ-রচনাতেও তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা যেন অন্তহীন। শিল্পরীতি ও রূপকর্মের দিক দিয়ে পুনরাবৃত্তি তাঁর সৃষ্টিকর্মের কোথাও দেখা যায় না। যুগান্তকারী প্রতিভাধরের পক্ষেই এ দুর্লভ দক্ষতা অর্জন সম্ভব। মূলত ছোটগল্পেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার দীপ্তিময় স্বাক্ষর বহন করে। ছোটগল্পের মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শন সম্যক স্ফূর্তি লাভ করেছে এবং এখানেই তাঁর আত্মপ্রকাশ সবচেয়ে সার্থক, সহজ ও সাফল্যমণ্ডিত। তিনি তাঁর ছোটগল্পে জীবনের বাস্তবসত্যকে বহুরূপে, গন্ধে, বর্ণে, স্বাদে, বৈচিত্র্যে সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন।

সমাজসচেতন লেখক বনফুল তাঁর অনুসন্ধানী তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে সমাজের আনাচে-কানাচে ধূলিমালিন্যে আবৃত প্রতিটি দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন সমাজের বৈষম্যগুলো। বনফুল বাস্তবে যা দেখেছেন, অবলোকন করেছেন তাকেই তিনি তাঁর গল্পে স্থান দিয়েছেন। বনফুলের ছোটগল্পে প্রতিফলিত বাস্তবতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম, প্রচলিত ধারার সমাজবাস্তবতা বা সমাজভাবনা বলতে যা বোঝায় বনফুল সে নিয়ম মেনে চলেন নি। তাঁর মতে, মানুষকে নিয়েই সমাজ। তাই মানুষের বাস্তব জীবনের চিত্রগুলোই তাঁর গল্পে সুনিপুণভাবে ধরা দিয়েছে। বনফুলের গল্প অনুসন্ধানকালে তাই মধ্যবিত্ত জীবনের বিচিত্র চরিত্র ও চিত্র যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি লক্ষ্য করা গেছে সমাজমানুষের সম্পর্কের

Dhaka University Institutional Repository

নানাবিধ সূত্র। তিনি সামাজিক অসঙ্গতিকে তাঁর গল্পে বাস্তবতার বহির্ভূত মনে করেন নি বলে নির্দ্বিধায় এর রূপায়ণ করেছেন। ভারতীয়, বিশেষ করে বাঙালিদের যাপিত জীবনের বিভিন্ন সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস বনফুলের ছোটগল্পের একটি বিষয়-বিশেষ। তিনি সমাজসচেতন ছিলেন বলেই জীবনের সাথে অঙ্গিভূত এই বিশ্বাস ও সংস্কার রূপায়ণে ছিলেন সচেতন। সমাজের নিষ্ঠুরতম বাস্তবচিত্র একই সঙ্গে তিনি তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। এখানে ক্রূরতা আছে, শঠতা আছে, আছে হৃদয়হীনতার উদাহরণ। সাহিত্য যে শুধুই নন্দনকাননের পারিজাত নয়, সমাজদীঘির কুবলয়ও বনফুলের ছোটগল্পে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ কারণে সমাজের পাপাচার, পরিবেশ ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে নিষ্ঠা এমন কি সম্ভ্রম পর্যন্ত বিসর্জন দেয়ার ঘটনা তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। এই সূত্রেই বাঙালি নারীসমাজের বাস্তবতা অম্ল-মধুরতায় তাঁর ছোটগল্পে পাওয়া যায়।

বনফুল তাঁর কাহিনীকে ভাবাবেগ সম্পৃক্ত ও আকর্ষক করে তোলার জন্য অতিমাত্রায় আবেগ বিস্তার করেন নি বা অতিকথনের মাধ্যমে ভাষার জাল বিস্তার করেন নি। তাঁর গল্প আকারে ছোট কিন্তু কাহিনী ও পাত্র-পাত্রী সামাজিক বিধিব্যবস্থার সংঘাত ও সমস্যার মধ্যে আবর্তিত। বনফুলের ছোটগল্পে সমাজসত্য উঠে এসেছে মানববিকতার প্রেক্ষাপটে। তাঁর সমাজবোধ মনুষ্যত্ব ও সর্বজনীনতার আলোকে উদ্ভাসিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ‖ এক

আকর গ্রন্থাবলি

১। বনফুলের গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ড, ১৩৯৮, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২য় প্রকাশ

২। বনফুলের গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪০২, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ৪র্থ প্রকাশ

৩। বনফুলের গল্পসমগ্র তৃতীয় খণ্ড, ১৪০৫, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম প্রকাশ পুনর্মুদ্রণ

৪। বনফুলের গল্পসমগ্র চতুর্থ খণ্ড, ১৩৯৩, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম প্রকাশ

	গ্রন্থ	প্রকাশকাল	প্রকাশক
১।	বনফুলের গল্প	১৯৩৬	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা
২।	বনফুলের আরো গল্প	১৯৩৮	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা
৩।	বাহুল্য	১৯৪৩	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা
৪।	বিন্দু বিসর্গ	১৯৪৪	রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা
৫।	অদৃশ্যলোকে	১৯৪৬	মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা
৬।	আরো কয়েকটি	১৯৪৭	বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা
৭।	তন্বী	১৯৪৯/৫২	ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা
৮।	নবমঞ্জরী	১৯৫৪	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা
৯।	ঊর্মিমালা	১৯৫৫/৫৬	শান্তি লাইব্রেরি, কলকাতা
১০।	রঙ্গনা	১৯৫৬	ইন্ডিয়ান এসো: পাবলিশার্স, কলকাতা
১১।	অনুগামিনী	১৯৫৮	বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা
১২।	করবী	১৯৫৮	ইন্ডিয়ান এসো: পাবলিশার্স, কলকাতা
১৩।	সপ্তমী	১৯৬০	লিও লিট, কলকাতা
১৪।	দূরবীণ	১৯৬১	বাক্‌সাহিত্য, কলকাতা
১৫।	মণিহারী	১৯৬৩	গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা
১৬।	ছিটমহল	১৯৬৫	গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা
১৭।	এক ঝাঁক খঞ্জন	১৯৬৭	বাক্‌সাহিত্য, কলকাতা
১৮।	বহুবর্ণ	১৯৭৬	প্রকাশ ভবন, কলকাতা
১৯।	বনফুলের নতুন গল্প	১৯৭৬	বাণীশিল্প, কলকাতা
২০।	বনফুলের শেষ লেখা	১৯৭৯	বাণীশিল্প, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ॥ দুই

বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোচিত গল্পসমূহ

(পাশে উল্লেখিত খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,
কলকাতা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে)

গল্পের নাম	মূল গল্পগ্রন্থ	গল্প সমগ্রর খণ্ড/পৃষ্ঠা
অঙ্কুর ও বৃক্ষ	ঊর্মিমালা	৩ খণ্ড/পৃ. ২৮৪
অঙ্কের বাইরে	মণিহারী	৪খ/পৃ. ৩৬১
অজান্তে	বনফুলের গল্প	১খ/পৃ. ৯
অদ্বিতীয়া	বনফুলের গল্প	১খ/পৃ. ১৫
অদ্ভুত কাণ্ড	এক ঝাঁক খঞ্জন	২খ/পৃ. ২৬
অভিজ্ঞতা	আরও কয়েকটি	১খ/পৃ. ৪৬৬
আজব লাল	মণিহারী	৪খ/পৃ. ৪৪০
আটকে গেল	বনফুলের নূতন গল্প	২খ/পৃ. ১৫০
আত্মপর	বনফুলের গল্প	১খ/পৃ. ৭
আর এক দিক	সপ্তমী	৪খ/পৃ. ১৫১
আর একটা কথা	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৩৬৬
উচিত অনুচিত	অনুগামিনী	৩খ/পৃ. ৩১০
ঋণ শোধ	ঊর্মিমালা	৩খ/পৃ. ২৬৯
একই ব্যক্তি	অদৃশ্যলোকে	১খ/পৃ. ৫১৬
কাকের কাণ্ড	বিন্দু-বিসর্গ	১খ/পৃ. ৩০৪
ক্যানভাসার	বনফুলের আরও গল্প	১খ/পৃ. ১৬৪
কুতুব মিনার	মণিহারী	৪খ/পৃ. ৩১৫
কুমারসম্ভব	মণিহারী	৪খ/পৃ. ২৮৮
কেন এমন	দূরবীণ	৪খ/পৃ. ২৬৩
কৃতজ্ঞতা	সপ্তমী	৪খ/পৃ. ১২১
খগার মা	দূরবীণ	৪খ/পৃ. ২১৬
খোকনের পৃথক ছবি	বনফুলের শেষ লেখা	৩খ/পৃ. ৬
খোশামোদ	বাহুল্য	১খ/পৃ. ২২৯
গণেশ জননী	আরও কয়েকটি	১খ/পৃ. ৩২৭
গল্প নয়	বনফুলের শেষ লেখা	৩খ/পৃ. ৮
গীতার ভাষ্য	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৪৩১
চঞ্চল	নবমঞ্জরী	৩খ/পৃ. ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

গল্পের নাম	মূল গল্পগ্রন্থ	গল্প সমগ্রর খণ্ড/পৃষ্ঠা
চম্পা	অনুগামিনী	৩খ/পৃ. ৩২২
চান্দ্রায়ণ	বিন্দু-বিসর্গ	১খ/পৃ. ৩৪৪
চুনোপুঁটি	ঊর্মিমালা	৩খ/পৃ. ২৬৪
চৌধুরী	বনফুলের আরও গল্প	১খ/পৃ. ২০৬
ছবি	অনুগামিনী	৩খ/পৃ. ৩৫১
ছায়া ও বাস্তব	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৪২০
ছোটলোক	বিন্দু-বিসর্গ	১খ/পৃ. ৩২৫
জনবুল	রঙ্গনা	৪খ/পৃ. ৪
জবর দখল	দূরবীণ	৪খ/পৃ. ২২৫
জাগ্রত দেবতা	বাহুল্য	১খ/পৃ. ৩৯৮
টিয়া চন্দনা	রঙ্গনা	৪খ/পৃ. ৩৬
ঢেউ	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৪০৩
তিমির সেতু	সপ্তমী	৪খ/পৃ. ১৩৪
তিলোত্তমা	বিন্দু-বিসর্গ	১খ/পৃ. ৩৩৯
দামোদর	বাহুল্য	১খ/পৃ. ২৪৮
দিবা-দ্বিপ্রহরে	বাহুল্য	১খ/পৃ. ৩৬৮
দুই নারী	নবমঞ্জরী	৩খ/পৃ. ১১৯
ধনী-দরিদ্র	অনুগামিনী	৩খ/পৃ. ৩১৮
নদী	দূরবীণ	৪খ/পৃ. ২২১
নব জীবন স্রোত	অনুগামিনী	৩খ/পৃ. ৩৪৬
নারীর মন	ঊর্মিমালা	৩খ/পৃ. ২৭৬
নিত্য চৌধুরী	মণিহারী	৪খ/পৃ. ৩২৪
নিমগাছ	অদৃশ্যলোকে	১খ/পৃ. ৫২৩
পতানু পাগলা	মণিহারী	৪খ/পৃ. ৩৫৮
পরিবর্তন	বাহুল্য	১খ/পৃ. ৩৭০
পরিস্থিতি	এক ঝাঁক খঞ্জন	২খ/পৃ. ৬৭
পক্ষী বদল	নবমঞ্জরী	৩খ/পৃ. ১৩৬
পাঠকের মৃত্যু	বনফুলের আরও গল্প	১খ/পৃ. ১৫১
পালানো যায় না	দূরবীণ	৪খ/পৃ. ২০৪
পালোয়ান	ঊর্মিমালা	৩খ/পৃ. ২৪৭
পাশাপাশি	বনফুলের আরও গল্প	১খ/পৃ. ১৪৬
পুনর্মিলন	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৩৭৯
পোকা	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

গল্পের নাম	মূল গল্পগ্রন্থ	গল্প সমগ্রর খণ্ড/পৃষ্ঠা
পোস্টকার্ডের গল্প	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৩৭৩
পৌরাণিক আধুনিক	অনুগামিনী	৩খ/পৃ. ৩৪৩
প্রজাপতি	অদৃশ্যলোকে	১খ/পৃ. ৫১৫
প্রয়োজন	বনফুলের শেষ লেখা	৩খ/পৃ. ৩
প্রাণকান্ত	বাহুল্য	১খ/পৃ. ২৪১
প্রারব্ধ	ঊর্মিমালা	৩খ/পৃ. ২৬১
প্রেমের গল্প, ১৯৬৪	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৪১৮
ফরেন মানি	বনফুলের শেষ লেখা	৩খ/পৃ. ৭
ফুল ও মানুষ	বহুবর্ণ	২খ/পৃ. ৩৬১
ফ্লু	মণিহারী	৪খ/পৃ. ৩৪০
বল মা তারা	সপ্তমী	৪খ/পৃ. ১৪১
বন্দে মাতরম	ঊর্মিমালা	৩খ/পৃ. ২৮৩
বাঘা	বাহুল্য	১খ/পৃ. ৩৫১
বাজে খরচ	বাহুল্য	১খ/পৃ. ২২৫
বাড়তি মাশুল	বনফুলের গল্প	১খ/পৃ. ৩
বাল্মীকি	নবমঞ্জরী	৩খ/পৃ. ১৩৮
বিদ্যাসাগর	বনফুলের আরও গল্প	১খ/পৃ. ১৪৯
বিনোদ ডাক্তার	অনুগামিনী	৩খ/পৃ. ৩৭৭
বিলাস প্রসঙ্গ	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৪১৪
বিশু আর ননী	বনফুলের নূতন গল্প	২খ/পৃ. ১৭৮
বুড়ীটা	সপ্তমী	৪খ/পৃ. ১৩১
বেহুলা	সপ্তমী	৪খ/পৃ. ১৫৮
ভিখারিটা	মণিহারী	৪খ/পৃ. ৩২৩
ভিতর বাহির	বনফুলের গল্প	১খ/পৃ. ৫৬
ভূতের প্রেম	নবমঞ্জরী	৩খ/পৃ. ১২৬
ভেক	ঊর্মিমালা	৩খ/পৃ. ২৭৩
ভোটার সাবিত্রী বালা	বহুবর্ণ	২খ/পৃ. ২৫২
ভ্রাতৃপ্রেম	ঊর্মিমালা	৩খ/পৃ. ২২৯
মতিভ্রম	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৪৪৩
মন্মথ	নবমঞ্জরী	৩খ/পৃ. ১৩০
মনু	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৩৬৭
মহামানব কেনারাম ওক	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৪১১
মানুষ	বনফুলের গল্প	১খ/পৃ. ২১১

Dhaka University Institutional Repository

গল্পের নাম	মূল গল্পগ্রন্থ	গল্প সমগ্রর খণ্ড/পৃষ্ঠা
মানুষের মন	বনফুলের গল্প	১খ/পৃ. ৬৪
মালাবদল	অদৃশ্যলোকে	১খ/পৃ. ৫০৯
মিনির চিঠি	বনফুলের নূতন গল্প	২খ/পৃ. ২০০
মুহূর্তের মহিমা	বনফুলের আরও গল্প	১খ/পৃ. ১৭৬
যদু	করবী	৪খ/পৃ. ৭৬
যা হয়	সপ্তমী	৪খ/পৃ. ১০২
যেমন আছে থাক	মণিহারী	৪খ/পৃ. ২৮৫
রঙের খেলা	মণিহারী	৪খ/পৃ. ৩৩২
রবারের হাতী	বনফুলের নূতন গল্প	২খ/পৃ. ১৮০
রামসেবক	বনফুলের নূতন গল্প	২খ/পৃ. ১৮৬
রামু ঠাকুর	মণিহারী	৪খ/পৃ. ৩০৫
লক্ষভ্রষ্ট	করবী	৪খ/পৃ. ৬৭
শেষ কিস্তি	অদৃশ্যলোকে	১খ/পৃ. ৫০৭
শেষ ছবি	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৪০৬
শিশু	বিন্দু-বিসর্গ	১খ/পৃ. ২৪৫
শ্রীপতি সামন্ত	বনফুলের নূতন গল্প	১খ/পৃ. ১৭৯
শ্রীনাথ পণ্ডিত	মণিহারী	৪খ/পৃ. ২৯৩
সতী	সপ্তমী	৪খ/পৃ. ১১১
সমাধান	বনফুলের গল্প	১খ/পৃ. ১১
সাঁতারের পোষাক	ঊর্মিমালা	৩খ/পৃ. ২৭৮
সুনন্দা	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৪৪০
সুরমা	বনফুলের নূতন গল্প	২খ/পৃ. ১৭২
স্বরূপ	সপ্তমী	৪খ/পৃ. ১২৪
স্থূল-সূক্ষ্ম	বিন্দু-বিসর্গ	১খ/পৃ. ২৩৫
হর্ষ ডাক্তার	মণিহারী	৪খ/পৃ. ৩১৮
হাসির গল্প	বাহুল্য	১খ/পৃ. ৩৭৫
হাবি আর নবু	বনফুলের নূতন গল্প	২খ/পৃ. ১৫২
ক্ষতের গভীরতা	ছিটমহল	৪খ/পৃ. ৪৩৮
ক্ষীর	দূরবীণ	৪খ/পৃ. ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ॥ তিন

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী:

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা (কলকাতা, ১৯৯৯)

২। অশ্রুকুমার শিকদার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস (কলকাতা, ১৯৮৮)

৩। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ (কলকাতা, ১৩৯৫)

৪। অলোক রায় : বনফুলের 'জঙ্গম' : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বনফুল সংখ্যা (কলকাতা, ১৯৯৯)

৫। অরবিন্দ পোদ্দার : রেনেসাঁস ও সমাজ মানস (কলকাতা, উচ্চারণ ১৯৮৩)

৬। আকরাম হোসেন, সৈয়দ : বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (ঢাকা, ১৯৮৫)

৭। আনোয়ারা পাশা : রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা (ঢাকা, ১৩৭৫)

৮। আফসার উদ্দীন, মুহম্মদ (সম্পাদক) : সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞান; এ. কে. নাজমূল করিম স্মারকগ্রন্থ (ঢাকা, ১৯৮৪)

৯। আজিজুল হক, সৈয়দ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ (ঢাকা, ১৯৯৮)

১০। আঁদ্রে মোরোয়া, লেখকের শিল্প কৌশল, অনুবাদ : আবু জাফর শামসুদ্দীন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৮

১১। ঊর্মি নন্দী, ডক্টর : বনফুল : জীবন মন ও সাহিত্য (কলকাতা, ১৯৯৭)

১২। Christopher Caudwell : Illusion and Reality (Bombay : People's publishing House, 1947)

১৩। ক্ষেত্র গুপ্ত : রবীন্দ্র গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ (কলকাতা, ১৯৮৪)

১৪। ক্ষেত্র গুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ– ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব (কলকাতা, ১৯৮৬)

১৫। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : বিভূতিভূষণ মন ও শিল্প (কলকাতা, ১৯৮৯)

১৬। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, (কলকাতা, ১৯৮৬)

১৭। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : বাস্তব ও কল্পমায়া বিচূর্ণ সীমা : বনফুলের উপন্যাস : বনফুল: শতবর্ষের আলোয় (কলকাতা, ১৯৯৯)

১৮। জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প (কলকাতা, ১৯৯৯)

১৯। জগদীশ ভট্টাচার্য : উন্মেষ পর্বের বনফুল : স্রষ্টা ও সৃষ্টি : বনফুল শতবর্ষের আলোয় (কলকাতা, ১৯৯৯)

২০। জীবেন্দ্র সিংহরায় : কল্লোলের কাল (কলকাতা, ১৯৮৭)

২১। জ্যোতিপ্রসাদ বসু (সম্পাদক) : গল্প লেখার গল্প (কলকাতা, ১৩৫০)

২২। থিওরি অব রিলেটিভ : বনফুলের গল্প সমগ্র, ১ম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৯৮)

২৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প (কলকাতা, ১৩৬৩)

২৪। নিশীথ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর : বনফুলের কবিতা : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বনফুল সংখ্যা (কলকাতা, ১৯৯৯)

২৫। নিশীথ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর : বনফুলের জীবন ও সাহিত্য (কলকাতা, ১৯৯৮)

২৬। নীরদচন্দ্র চৌধুরী : বাঙালী জীবনে রমণী (কলকাতা, ১৯৮৮)

২৭। Neelima Ibrahim : "Society Reflected in 19th Century Bengali Literature", Pierre Bessaignet (ed). Social Research in East Pakistan (Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1964)

২৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড

২৯। প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প (কলকাতা, ১৩১৮)

Dhaka University Institutional Repository

৩০। প্রমথনাথ বিশী : বাংলার লেখক (প্রবন্ধ; ত্রৈলোক্যনাথ)
৩১। প্রমথনাথ বিশী : বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা : বনফুল শতবর্ষের আলোয় (কলকাতা, ১৯৯৯)
৩২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় : বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড
৩৩। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-স্মৃতি
৩৪। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় : পশ্চাৎপট : বনফুল রচনাবলী : ষোড়শ খণ্ড (কলকাতা ১৩৮৯)
৩৫। বিনয় ঘোষ : শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ (কলকাতা, ১৯৮০)
৩৬। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : বনফুলের ছোটগল্পে সমাজভাবনা; সাহিত্য পত্রিকা (কলকাতা ১৯৯৯)
৩৭। বিশ্বজিৎ ঘোষ : একুশের প্রবন্ধ ১৯৯৯ (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯)
৩৮। বীতশোক ভট্টাচার্য : বনফুলের একটি গল্প; কথনরীতির বিশ্লেষণ; কোরক সাহিত্য পত্রিকা (কলকাতা, ১৯৯৯)
৩৯। বুদ্ধদেব বসু : বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ; তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৯৮২)
৪০। ভবেশ দাশ : 'ভালো' গল্পের বনফুল; কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বনফুল সংখ্যা, (কলকাতা, ১৯৯৯)
৪১। ভীষ্মদেব চৌধুরী : জগদীশ গুপ্তের গল্প (ঢাকা, ১৯৮৮)
৪২। ভূদেব চৌধুরী, শ্রী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার (কলকাতা, ১৯৮৯)
৪৩। ভূদেব চৌধুরী, শ্রী : বনফুলের 'লেখা'র শিল্প : 'লেখক' বনফুল; বনফুল শতবর্ষের আলোয়, সম্পাদক, পবিত্র সরকার (কলকাতা, ১৯৯৯)
৪৪। মুহম্মদ মজির উদ্দীন : রবীন্দ্র ছোটগল্পে সমাজ ও স্বদেশচেতনা (ঢাকা, ১৯৭৮)
৪৫। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদক) : বুড্ডিস্ট মিস্টিক সঙ্গস্, (ঢাকা, ১৯৬৬)
৪৬। Marx-Engels, On literature and Art (Moscow : Progress Publishers 1976)
৪৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বর্ষাযাপন : রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯০৮)
৪৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠিপত্র, নবম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৭৭)
৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, 'গ্রন্থ পরিচয়' (১৪শ খণ্ড)
৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সম্পাদক) : প্রমথ চৌধুরীর গল্প সংকলন (কলকাতা, ১৯৪১)
৫১। রবীন্দ্রনাথ রায় : ছোটগল্পের কথা (সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৮৮)
৫২। রবীন্দ্র গুপ্ত : উপন্যাসে বাস্তবতা : রবীন্দ্রনাথ, (কলকাতা, ১৯৮৭)
৫৩। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শরৎ রচনাসমগ্র (২য় খণ্ড; সম্পাদনা : উবেশ রায়; কলকাতা ১৯৮৮)
৫৪। শিশিরকুমার দাশ : বাংলা ছোটগল্প (কলকাতা, ১৯৮৩)
৫৫। শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (কলকাতা, ১৯৬৫)
৫৬। শেখর সমাদ্দার : বনফুলের নাটক; কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বনফুল সংখ্যা, (কলকাতা, ১৯৯৯)
৫৭। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর (কলকাতা, ১৯৭৬)
৫৮। সরোজমোহন মিত্র, ডক্টর : বনফুল : সাহিত্য ও জীবন (কলকাতা, ১৯৯৯)
৫৯। সুজিত ঘোষ : বনফুলের প্রবন্ধ : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বনফুল সংখ্যা (কলকাতা, ১৯৯৯)
৬০। সুনীলকুমার দত্ত : বনফুলের প্রবন্ধ : বনফুল শতবর্ষের আলোয় (কলকাতা, ১৯৯৯)
৬১। সুভদ্রকুমার সেন : বনফুল সাহিত্যে অতিপ্রাকৃত; বনফুল শতবর্ষের আলোয় (কলকাতা, ১৯৯৯)
৬২। সৌমিত্র শেখর, ডক্টর : গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ (কলকাতা, ১৯৯৫)
৬৩। সৌমিত্র শেখর, ডক্টর : যাদুবাস্তববাদ, মায়া-প্রপঞ্চ এবং বাংলা সাহিত্যে ইচ্ছে পূরণ; ('নিসর্গ' বর্ষ ১৮, সংখ্যা ১ বগুড়া, ২০০৩)